স্টিফেন হকিং

ভাষান্তর শাকতিং দাশগুপ্ত

ব্ল্যাকহোল এবং শিশুবিশ্ব

ও অন্যান্য রচনা

কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব
ও
অন্যান্য রচনা

স্টিফেন ডব্লু হকিং

ভাষান্তর ঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

বাউলমন প্রকাশন
৩৪ সেন্ট্রাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩২

KRISHNAGAHVAR EBONG SISHU MAHAVISWA O ANYANYA RACHANA (BLACK HOLES AND BABY UNIVERSES AND OTHER ESSAYS) BY STEPHEN W HAWKING. TRANSLATED IN BENGALI BY SATRUJIT DASGUPTA.

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুযাবী, ১৯৯৮
তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০২
চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারী, ২০০৮
পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

প্রকাশক : শর্মিষ্ঠা রায়
বাউলমন প্রকাশন, ৩৪ সেণ্ট্রাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর, কলকাতা — ৩২
অক্ষরবিন্যাস : দি লেজার রাইটার্স, ১১/৪১, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা — ২৯
মুদ্রণ : গিরি প্রিণ্ট সার্ভিস, ৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা — ৯
প্রচ্ছদ : আশিস সেনগুপ্ত
ISBN : 81-86552-69-3
বিনিময় : আশি টাকা মাত্র

জ বা ব দি হি

বাংলাভাষায় ধ্রুপদী বিজ্ঞানের অনুবাদ প্রকাশ করার লক্ষ্য নিয়ে যখন আমরা উদ্যোগী হই ১৯৮৬ সালে, সেটা ছিল আমাদের সাহসী পদক্ষেপ। পাঠক সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবেন—এই ছিল সংশয়। মূল লক্ষ্যের পথে আমরা অনেকটাই এগোতে পেরেছি।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্টিফেন ডব্লু. হকিং-এর 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রকাশিত হয় দু'বছর আগে। অধ্যাপক হকিং সম্পূর্ণ রয়ালটি ছেড়ে দেওয়াতে বইটির দাম হয় ৪৫ টাকা। দ্বিতীয় বই 'কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা' আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে। বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য তাঁর অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখা হলে মূল ইংরিজি বইয়ের প্রকাশক আমেরিকার ব্যান্টাম বুকস্, ভারতীয় মুদ্রায় ১৫,০০০ টাকা রয়ালটি দাবী করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে হয়ত এই টাকা খুবই সামান্য কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের জন্য সামান্য নয়।

মূল ইংরিজি বইটি কলকাতায় বিক্রি হয় ৭৩০ টাকায়। সেই হিসাবে বাংলা অনুবাদ খুব সুলভ মনে হতে পারে। কিন্তু বাঙালী পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতা বিচার করলে যুক্তিটা অযৌক্তিক মনে হয়। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করেছি বইটার দাম কম রাখতে। কিন্তু আমাদের সাফল্য আশানুরূপ হয়নি।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বাংলা অনুবাদটির দাম হয়েছিল ১০০ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শুভানুধ্যায়ী কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়াতে দাম ২০ টাকা কম করতে পেরেছি। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোনও শুভার্থী যদি সাহায্য করেন তবে ভবিষ্যতে দাম আরও কমাতে পারব।

এই বইটিতে আমরা মূল বইটির অঙ্গসজ্জা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি যদিও বিদেশি কাগজের উচ্চমান রাখতে পারিনি। সংবেদনশীল পাঠক এর মর্যাদা দিলে আমরা ধন্য হব।

বাউলমন প্রকাশন

সূচীপত্র

✡ অনুবাদকের কথা — অ

✡ ভূমিকা — এ

১ শৈশব — ১

২ অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ — ১৩

৩ আমার এ. এল. এস-এর অভিজ্ঞতা — ২০

৪ বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি — ২৭

৫ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — ৩২

৬ আমার অবস্থান — ৩৯

৭ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্ত কি আমাদের দৃষ্টিপথে? — ৪৬

৮ আইনস্টাইনের স্বপ্ন — ৬৫

৯ মহাবিশ্বের উৎপত্তি — ৮০

১০ কৃষ্ণগহ্বরের কণাবাদী বলবিদ্যা — ৯৪

১১ কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব — ১০৬

১২ সবই কি পূর্বনির্ধারিত? — ১১৭

১৩ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ — ১২৯

১৪ মরুদ্বীপের রেকর্ড : একটি সাক্ষাৎকার — ১৪৩

✡ বর্ণানুক্রমিক সূচী

❖ অনুবাদকের কথা

'কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব এবং অন্যান্য রচনা' বাংলা ভাষায় অধ্যাপক স্টিফেন হকিং-এর দ্বিতীয় বই। প্রথম বই 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' মহাবিশ্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন আলোচনা।

মহাবিশ্বতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র। কিন্তু একটি মাত্র শাখা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে অধ্যাপক হকিং প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় অর্থাৎ অনেক শাখা নিয়েই আলোচনা করেছেন। অবশ্য এর ভিতর পদার্থবিদ্যাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব এবং অন্যান্য রচনা' বইটি একটি বিষয় নিয়ে অবিচ্ছিন্ন আলোচনা নয়, এ বইটি অধ্যাপক হকিং-এর চোদ্দটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য লেখা। এর ভিতরে আছে লেখকের আত্মপরিচয় এবং আত্মজীবনীমূলক লেখা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা।

তবে অধ্যাপক হকিং-এর নিজের বিষয় মহবিশ্বতত্ত্বই এই বইয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া রয়েছে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে একাধিক আলোচনা।

অধ্যাপক হকিং-এর বিজ্ঞানের দর্শন কিংবা দার্শনিকদের সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি নিজের জীবন দর্শন সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু জানিয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকে দর্শনের মূল প্রশ্ন তিনটি–মানুষ কোথায় ছিল, কোথায় এল আর কোথায় যাবে। এই প্রশ্ন তিনটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত আর দুটি মতবাদ–সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বদর্শী ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্ন আর নিয়তিবাদ।

ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' অনেকটাই আছে। এই বইটিও ব্যতিক্রম নয়। মাঝে মাঝেই ঈশ্বর সম্পর্কীয় আলোচনা রয়েছে। তবে নিয়তিবাদ সম্পর্কে আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে অনুবাদকের মনে হয়েছে ভাগ্যগণনা, তাবিজ, মাদুলী আর মণিমুক্তা ধারণের এই সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে যে কোনও শিক্ষিত মানুষের এই প্রবন্ধের বহুল প্রচারের চেষ্টা করা উচিত।

এই বইটি সাধারণ পাঠকের ভাল লাগবে বলেই মনে হয়। তবে যেহেতু প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখা সেইজন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সমস্ত পাঠকের কাছে সমান সুখপাঠ্য মনে না হতে পারে।

যাঁরা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য পড়তে অভ্যস্ত নন তাঁদের কাছে দু'একটি প্রবন্ধ একটু দুরূহ মনে হতে পারে। তবে কোনও প্রবন্ধই 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে দুরূহ নয়। তাছাড়া এ বইতেও লেখক গণিত ব্যবহার করেননি।

❖ ❖ ❖ ❖

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখা হওয়ার ফলে অনেক সময় মনে হয়েছে লেখক নিজেই নিজের মতের বিরুদ্ধতা করছেন।

একটি উদাহরণ :

একটি প্রবন্ধে লেখক আশা করছেন ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার হলে মানুষ মহাবিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে।

অপরের উপর প্রভুত্ব করতে মানুষ ভালবাসে। এমনকি ভবিষ্যতে প্রভুত্ব করার সম্ভাবনা কিংবা অতীতে প্রভুত্ব করার স্মৃতিও মানুষকে আনন্দ দান করে। কিন্তু কোনও জাতি কিংবা গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব শুরু হয় আগ্রাসন দিয়ে। দিনের পর দিন সেই প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলেও প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন আগ্রাসন।

অন্য জায়গায় লেখক একাধিকবার বলেছেন, মানুষের আগ্রাসন প্রবৃত্তি প্রোথিত রয়েছে মানুষের জিনে (gene) অর্থাৎ বংশগতিতে এবং এই আগ্রাসন প্রবৃত্তির অস্তিত্বের ফলেই মনুষ্যজাতির অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আগ্রাসন ইত্যাদির বিরুদ্ধে অধ্যাপক হকিং বারবার মতপ্রকাশ করেছেন।

তাহলে এই স্ববিরোধের কারণ কি?

শ্বেতাঙ্গরা দু-তিন শতাব্দী পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করেছে। এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এর আগে দু-তিন শতাব্দী পৃথিবীতে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা চালিয়েছে। নরহত্যা না বলে বোধ হয় গণহত্যা শব্দটাই অনেক বেশি উপযোগী হবে, থুড়ি, সেটাও হল না। ওদের হত্যা করতে হয়েছিল উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, কৃষ্ণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার জনগণকে। তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের কি নামকরণ করা যায়? মহাহত্যা? মহামহাহত্যা? না অষ্টোত্তর শত মহাহত্যা? কোনওটাই আমার পছন্দ হল না, এই হত্যাকারীদের সামনে তৈমুর লং আর চেঙ্গিজ খাঁ নেহাতই শিশু।

আসলে এ হত্যাকাণ্ড প্রকাশ করার ভাষা নেই। বোধ হয় সংস্কৃতে নেই, ইংরিজিতেও নেই।

এই ব্যাপারে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের ভিতরে ইংরেজ জাতিই

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এবং তাদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য ইংরেজ উচ্চশ্রেণী।

অধ্যাপক হকিং-এর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে দেখা যায়, তাঁর জন্ম ইংরেজ উচ্চশ্রেণীতে এবং ঐ শ্রেণীতেই তিনি লালিত। তাঁর কথায় আমরা জানতে পারি, তাঁর ছেলেবেলায় ইংরেজরা স্বতন্ত্র বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব মানতে চাইতেন না। সেইজন্যই তাঁর শ্রেণীকে আমরা উচ্চশ্রেণী বলেই উল্লেখ করলাম।

শ্বেতাঙ্গ উচ্চশ্রেণীর মানুষদের মতো প্রভুত্বের এই আকাঙ্ক্ষা কি অধ্যাপক হকিং-এর রক্তেও জন্মসূত্রে প্রোথিত?

হয়ত শ্রেণীগত অভ্যাসের জন্যই হকিং-এর এই ত্রুটি, কারণ এই বইয়েতেই মানুষের আগ্রাসনী প্রবৃত্তির ভয়াবহ ফল সম্পর্কে তিনি একাধিক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হকিং-এর ছেলেবেলার বন্ধুদের ভিতর সবাই ছিল বুদ্ধিজীবী পরিবারের। ব্যতিক্রম ছিল হাওয়ার্ড। সে ছেলেটির বাড়ি ছিল ওদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে একটা বাড়িতে। যুদ্ধের সময় ওদের রাস্তায় একটা V রকেট পড়েছিল। সেই রকেটের গর্তে ওরা দু'বন্ধু খেলা করত। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর হকিং যেন নতুন একটা জগতের সন্ধান পেলেন। হকিং পড়তেন বায়রন হাউস নামে উচ্চশ্রেণীর একটা স্কুলে, হাওয়ার্ড পড়ত সরকারী স্কুলে, হাওয়ার্ড ফুটবল আর বক্সিং সম্পর্কে জানত কিন্তু হকিং-এর বাবা-মা ঐ ধরনের খেলায় যোগদান করার কথা ভাবতেও পারতেন না।

এই কাহিনী থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই ইংল্যাণ্ডের উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণীর ভিতর বিচ্ছিন্নতা কতটা।

অধ্যাপক হকিং বিশ্ব সম্পর্কে লিখেছেন, মহাবিশ্ব সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁর লেখার বেশির ভাগই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

মজার ব্যাপার হল এই লেখাতেই তিনি সোজাসুজি মানুষের আগ্রাসনী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর অনেক লেখাতেই মনে হয় মানুষের পরস্পর হানাহানি এবং আগ্রাসনী প্রবৃত্তিকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেন।

তাঁর বক্তব্য এই আগ্রাসনী প্রবৃত্তি রয়েছে মানুষের জিনে (gene) অর্থাৎ বংশগতিতে।

তাঁর ধারণা এ প্রবৃত্তি প্রোথিত রয়েছে জিনের গঠনে, এই আগ্রাসনী প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে।

এই জিনে যদি কোনও জীবনমুখী পরিবর্তন হয় তাহলেও তার জন্য

একাধিক নিযুত বৎসর লাগতে পারে। অথচ মানুষের হাতে এখনই ব্যাপক ধ্বংস করতে পারে এরকম অস্ত্র যে পরিমাণ আছে—তার সাহায্যে মানব সভ্যতাই নয়, জীবনের সবরকম লক্ষণই পৃথিবী থেকে বহুবার মুছে দেওয়া যেতে পারে। তথাকথিত ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়াতে পরিস্থিতির বিশেষ কোনও উন্নতি হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না।

এই গ্রহে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষিত হওয়ার মতো দুটো পরিস্থিতি তিনি কল্পনা করেছেন :

১) যদি এই দু-পেয়ে জন্তুরা অন্য কোনও গ্রহে কিংবা তারকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে তাহলে তাদের বংশধরদের সাহায্যে এই পার্থিব মনুষ্যজাতির বংশ রক্ষা করার একটা সম্ভাবনা থাকবে।

এই পর্যন্ত পড়ে মনে হয় পৃথিবী নামক গ্রহে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সামান্যই আশা আছে, আর.....

২) মানুষের শুভবুদ্ধি যদি তার আগ্রাসনী প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে।

পড়ে মনে হয় মানুষের শুভবুদ্ধির উপরই তিনি বেশি নির্ভর করতে চান।

প্রবন্ধটা পড়ে অনুবাদকের মনে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা কিন্তু কমেনি, বরং বেড়েছে। করুণার অবতার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, প্রেমের অবতার যীশু, স্বার্থহীন রাধাপ্রেমে উন্মাদ চৈতন্য যে শুভবুদ্ধিকে জাগাতে পারেননি, জয়ী করতে পারেননি, আধুনিক মানুষ, ব্যক্তিস্বার্থে দীক্ষিত আধুনিক মানুষ কি সে কাজ পারবে?

আর অস্ত্র প্রতিযোগিতা?

যে বছর তথাকথিত ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হল অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয় ছিল ২৯০.৪ বিলিয়ন ডলার আর ঠাণ্ডা যুদ্ধের চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে সামরিক খাতে ব্যয় ছিল ৩৮৯.৩ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং মানবজাতি আর মানবসভ্যতার শত্রুদের অস্ত্রসম্ভার বাড়ছে।

এক্ষেত্রে শুভবুদ্ধির উপর আমরা কতটা নির্ভর করতে পারব?

অধ্যাপক হকিং-এর লেখা পড়ে অনেক সময় মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের উপর তাঁর আস্থাটা একটু বেশি।

আমাদের মতো অনগ্রসর শোষিত দেশের মানুষের মনে এ সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন আসে— বিজ্ঞান সৃষ্টি করেন বৈজ্ঞানিকরা। বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, পার্থক্য থাকতে পারে বৈজ্ঞানিকে বৈজ্ঞানিকে। কোনও বৈজ্ঞানিক কাজ করেন সমগ্র মনুষ্যসমাজের স্বার্থে, সমগ্র জীবজগতের স্বার্থে আবার কোনও বৈজ্ঞানিক কাজ করেন সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে। বৈজ্ঞানিকদের ভিতরে যেমন আমরা আইনস্টাইনকে দেখতে পাই তেমনি

দেখতে পাই নিউটনকেও।

তাছাড়া আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রীমাত্র। যন্ত্রের মালিক বিত্তবান ধনিক শ্রেণী। তাঁরা যা চাইবেন বৈজ্ঞানিকদের তাই করতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে ফল কি সবসময় শুভ হয়?

আমরা মহাভারতে পড়ি ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য এঁদের দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থনের কারণ দুর্যোধন ছিলেন তাঁদের অন্নদাতা।

এর ফলে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল।

আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদদের অন্নদাতারা নিশ্চয়ই সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে নন।

এঁদের উপর আমরা কতটা নির্ভর করতে পারি সেটাই প্রশ্ন।

মানববংশ কি ধ্বংস হবে?

❖ ❖ ❖ ❖

সাধারণ মানুষের জন্য লেখা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বই বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিবারই পাঠকদের কাছ থেকে নানারকম প্রশ্ন আসে। বেশির ভাগই আসে ডাকে, তবে কিছু কিছু প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয় এবং অনেক সময় উত্তরটাও মুখোমুখি দিতে হয়।

কতগুলি প্রশ্নে যেমন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি তেমনি কতগুলি উত্তরও আমাদের নিজেদের কাছে অভ্যস্ত উত্তরই মনে হয়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন পরিভাষা নিয়ে। কারও প্রশ্ন বাংলা পরিভাষা করার কি কোনও প্রয়োজন আছে? ইংরিজি শব্দগুলি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে (বন্ধনী) অর্থটা দিয়ে দিলেই তো হয়।

আমরা উত্তর দিই–বাংলা শব্দ, বিশেষ করে তৎসম, তদ্ভব শব্দ বাঙালীর মনে যেরকম সহজে প্রবেশ করে, অন্য শব্দ বাঙালীর মনে অত সহজে প্রবেশ করে না।

তবে সব সময় নয়, ব্যতিক্রম রয়েছে।

উদাহরণ : নরম শব্দের ব্যুৎপত্তি ফারসী হলেও শব্দটা ষোল আনা বাংলাই হয়ে গিয়েছে।

কেউ হয়ত নালিশ করেন–তদ্ভব, তৎসম পরিভাষা হলেও শব্দগুলি বড় শক্ত।

উদাহরণ : (continuum) শব্দের বাংলা পরিভাষা সাংতত্যক বড্ড কঠিন মনে হয়।

আমরা উত্তর দিই—সুপ্রতিষ্ঠিত পারিভাষিক শব্দ বদলানো সম্ভব নয়। তবুও হয়ত উনি বলেন : সাংতত্যক শব্দটা বড় শক্ত।

তখন আমাদের বাধ্য হয়েই বলতে হয়—নতুন বিষয় পড়তে হলে নতুন শব্দ শিখতে হবে, অনেক সময় নতুন ভাষাও খানিকটা শিখতে হবে।

অপ্রিয় সত্য বলতে নেই—তবুও মাঝে মাঝে বলতেই হয়।

❖ ❖ ❖ ❖

বইমেলাতে মাঝে মাঝে বই-এর দোকানে বসে থাকতে ভালই লাগে, অনেক পাঠকের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়, তাঁদের মতামত জানতে পারি, ফলে নিজের ভুল সংশোধনেরও সুযোগ মেলে।

সেবার একটা বিখ্যাত ইংরিজি বই-এর অনুবাদ বেরিয়েছে। দোকানটাতে বেশ ভিড়। অনেক স্কুল-কলেজের ছেলে ঢুকছে, নিজেদের ভিতরে আলোচনা করছে। কেউ বই কিনছে, কেউ বা একটু ঘুরে-ফিরে বইপত্র দেখে চলে যাচ্ছে, আর আমি বসে আছি একটা ধুলোর মুখোস পরে। নানা কথা শুনি--ভাল, মন্দ, মাঝারি। কথা বললে প্রিয়বাক্যই বলি। কথার দু'একটা নমুনা : 'দ্যাখ, এই বইটার বাংলা বেরিয়েছে।'

'পড়ে বুঝতে পারব তো?'

'কেন পারবি না? তুই তো বাংলায় স্ট্রং, আমি বড্ড উইক, ইংরিজিটাই কিনব।'

ওরা এগিয়ে যায়। আমি মুখোস পরে কথা শুনি।

'এই বইটা দেখেছিস?'

'ইংরিজিটা দেখেছি, এরা আবার বাংলা করেছে বুঝি?'

'এ বইটা ইংরিজি পাওয়া যায় না?'

দোকানদার বলে— 'যায়।'

'আছে আপনাদের কাছে?'

'না'—

ছেলে দুটো বেরিয়ে যায়।

আমি মুখোস পরে বসে থাকি। নতুন বর্ষার জলের স্রোতের মতো লোক দোকানে ঢোকে। দোকান থেকে বেরোয়। নানা বই নিয়ে নানা মন্তব্য করে।

'বইটা দেখলি?'

'হ্যাঁ দেখলাম — ইংরিজিটা আমার আছে।'

'আমার নেই' ছেলেটা দোকানদারের দিকে মুখ ফেরায়।

'আপনাদের আছে ইংরিজি টা?'

দোকানদার ঘাড় নেড়ে বলে 'নেই।'

'যেটা রাখলে কাজ হ'ত সে বইটাই ওদের নেই। বাংলা দিয়ে কি হবে? ক'জন পড়বে?'

'বেশির ভাগ লোকই তো বাংলা পড়ে...'

'পড়লেও বা-যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা বেশির ভাগ তো আর বাংলা পড়ে না, তারা ইংরিজিই পড়ে। ইংরিজি ছাড়া বিজ্ঞান পড়বে কি করে? কিছু লোক পণ্ডশ্রম করতে ভালওবাসে।'

দু'বন্ধু কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।

আমি মুখোস পরে বসে থাকি।

❖ ❖ ❖ ❖

এ দেশ জাতিভেদের দেশ। ভাষাতেও জাতিভেদ। বড়লোকের ভাষা ইংরিজি। সাধারণ মানুষেরা বলেন বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি নানা প্রাকৃত জনের ভাষা।

মুসলমান আমলে বড়লোকের ভাষা ছিল ফারসী আর প্রাকৃত জনের ভাষা ছিল বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি।

হিন্দু আমলে রাজারাজড়ারা ব্যবহার করতেন সংস্কৃত আর প্রজারা ব্যবহার করতেন নানা প্রাকৃত ভাষা। তাতেও ছিল জাতিভেদ।

রাণী বলতেন শৌরসেনী, দাসী বলতেন মাগধী।

অনুবাদক মুখোস পরে ভাবে।

সত্যিই কি পণ্ডশ্রম? সবই কি অলীক স্বপ্ন?

মুখে ধুলোর মুখোস। মনের ভাব কিছুই বোঝা যায় না।

তিন চারটি ছেলে হঠাৎ সার দিয়ে এসে প্রণাম করে। অনুবাদক চমকে সোজা হয়ে বসে।

'স্যার, এই কাজটা তো আপনারই করা?'

'হ্যাঁ'

'খুব ভাল হয়েছে। আর করবেন না? আমরা সবাই একখানা করে কিনেছি। আমাদের বইগুলিতে সই করে দেবেন?'

'অটোগ্রাফ?'

'হ্যাঁ'

'তোমরা বাংলা পড়?'

'পড়ি বইকি! ইংরিজিও পড়ি। তবে বাংলাটাই পড়তে সুবিধা হয়।'

আমি বইগুলিতে নিজের নাম লিখি। ওরা সার দিয়ে প্রণাম করে আবার

আর বেরিয়ে যায় সার বেঁধে।

অনুবাদক ধুলোর মুখোস পরে বসে থাকে।

লেখকদের ভাগ্যে পুরস্কার আর তিরস্কার দুই-ই মেলে। তবে পুরস্কারটাও কম নয়।

অনুবাদক ভাষা আর বিষয় দু-দিক থেকেই অর্বাচীন।

তা সত্ত্বেও পাঠকরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমার লেখা পড়েছেন। শুধু তাই নয়, সমালোচনা করার মতো কষ্টও স্বীকার করেছেন। এই আসকারার ভরসাতে পাঠকদের কাছে অনুরোধ করি তাঁরা যেন অনুবাদককে ভবিষ্যতেও তাঁদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না করেন। এই অর্বাচীন অনুবাদক তাঁদের সমালোচনায় অতীতে উপকৃত হয়েছে, তার আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে যেন উপকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

ভূমিকা

এই বইটি ১৯৭৬ থেকে ১৯৯২ এর ভিতরে লেখা আমার কয়েকটি রচনার সংগ্রহ। বইটির বিস্তার রয়েছে আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ থেকে বিজ্ঞানের দর্শন অবধি, আর রয়েছে বিজ্ঞান ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমি যে উত্তেজনা বোধ করি সেটা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। এই বইয়ের শেষে রয়েছে ডেজার্ট আইল্যাণ্ড ডিস্‌ক্‌ [Desert Island-Discs] এর অনুলিখন। সে অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। অনুষ্ঠানটি ব্রিটিশ রীতির একটি বৈশিষ্ট্য। এ অনুষ্ঠানে অতিথিকে কল্পনা করতে বলা হয় যেন তাঁকে একটি মরুদ্বীপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সময় কাটাবার জন্য আটখানা রেকর্ড বেছে নিতে বলা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সভ্যজগতে ফিরে আসার জন্য আমাকে খুব বেশি দেরি করতে হয়নি।

এই রচনাগুলি ১৬ বছর ধরে লেখা। সেইজন্য এগুলিতে আমার তদানীন্তন

জ্ঞানের প্রতিফলন রয়েছে। আশা করি, কালে কালে আমার জ্ঞানটা একটু বেড়েছে। সেজন্য আমি প্রতিটি রচনার কাল এবং উপলক্ষ লিখে দিয়েছি। প্রতিটি লেখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। সেজন্য কিছু কিছু পুনরুক্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তা একটু হয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি সেটা কমাতে। তবুও কিছু কিছু রয়ে গিয়েছে।

এই বইয়ের কয়েকটি লেখা ছিল বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি। আমার কণ্ঠস্বর তখন এমন অস্পষ্ট ছিল যে বক্তৃতা কিংবা বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভায় আমার কথা বলতে হ'ত অন্য কারও মাধ্যমে। সাধারণত তাঁরা ছিলেন আমার কোনও গবেষক ছাত্র। তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারতেন কিংবা আমার রচনা পাঠ করতেন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে আমার একটা অপারেশান হয়, তার ফলে আমার কথা বলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। কিছু কাল পর্যন্ত আমার যোগাযোগ রক্ষা করার সমস্ত উপায়ই লুপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আমি একটি কম্প্যুটার সিস্টেম পাই, আর পাই খুব ভাল একটি বাক্য সংশ্লেষক (স্পীচ সিনথেসাইজার—speech synthesizer)। আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমি সাধারণ মানুষের জন্য একজন সার্থক বক্তা আর বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে ভাল বক্তৃতা করতে পারি। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার ভাল লাগে। আমি নিশ্চিত যে কাজটা আমাকে আরও ভাল করে শিখতে হবে। কিন্তু আশা করি আমার উন্নতি হচ্ছে। এই বইটি পড়ে আপনি বিচার করতে পারবেন সত্যি আমার উন্নতি হচ্ছে কিনা।

মহাবিশ্ব একটি রহস্য—এ সম্পর্কে স্বজ্ঞা (intuition) থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ কিংবা বোধ সম্ভব নয়: এই দৃষ্টিভঙ্গি আমি বিশ্বাস করি না। যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব গ্যালিলিও চারশ' বছর আগে শুরু করেছিলেন এবং নিউটন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন : আমার মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি তার উপর সুবিচার করে না। তাঁরা দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের অন্তত কয়েকটি অঞ্চল যাদৃচ্ছিক (arbitrary) আচরণ করে না। বরং তারা যথাযথ গাণিতিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারপর কালে কালে আমরা গ্যালিলিও-নিউটনের গবেষণাকে মহাবিশ্বের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে বিস্তৃত করেছি। আমরা সাধারণত যা অনুভব করি, তার সবগুলি নিয়ন্ত্রিত করার মতো গাণিতিক বিধি আমাদের রয়েছে। আমাদের সাফল্যের একটি মাপকাঠি হল এখন আমরা শত শত কোটি ডলার এমন কতগুলি যন্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যয় করি, যে যন্ত্র কণিকাগুলিকে এমন উচ্চশক্তিতে ত্বরিত(accilerated) করে যে, তাদের ভিতরে সংঘর্ষ হলে কি হবে আমরা

আজও জানি না। এই অতি উচ্চ কণিকাশক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীতে থাকে না। সেই জন্য মনে হতে পারে গবেষণার জন্য এই বিরাট অর্থব্যয় অপ্রয়োজনীয় এবং নেহাৎই কেতাবি-বিদ্যা আহরণ। কিন্তু আদিম মহাবিশ্বে এর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং আমরা নিজেদের মহাবিশ্বের আরম্ভ যদি জানতে চাই তাহলে এই শক্তিতে কি ঘটে সেটা জানা দরকার।

এখনও মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের অজানা। কিন্তু বিশেষ করে গত ১০০ বছরে যে লক্ষণীয় প্রগতি হয়েছে, তা থেকে উৎসাহিত হয়ে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণ বোঝা হয়তো আমাদের ক্ষমতার অতীত নয়। হতে পারে, আমাদের চিরকাল অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না। আমরা হয়তো মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারব। সেক্ষেত্রে আমরা হব মহাবিশ্বের অধিপতি।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে এই বিশ্বাসে যে, মহাবিশ্ব এমন একটি নিয়মে বাঁধা, যে নিয়ম আমরা এখন অংশত বুঝতে পারি এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারব। হতে পারে এ আশা নেহাৎই মরীচিকা। চরম তত্ত্ব হয়তো কিছুই নেই : থাকলে হয়তো সেটা আমরা খুঁজে পাব না। কিন্তু মানুষের মন সম্পর্কে হতাশ হওয়ার চাইতে সম্পূর্ণ বোঝার চেষ্টা করা অনেক ভাল।

স্টিফেন হকিং
৩১ শে মার্চ, ১৯৯৩

এক

শৈশব*

আমার জন্ম ১৯৪২ সালের ৮ ই জানুয়ারী। তারিখটা গ্যালিলিওর মৃত্যুর ঠিক তিনশ' বছর পরবর্তী। তবে আমার অনুমান, সেদিন আরও প্রায় দু'লক্ষ শিশু জন্মেছিল। আমি জানি না তাদের ভিতরে আর কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা। আমার বাবা-মা যদিও লণ্ডনে থাকতেন, তবুও আমার জন্ম হয়েছিল অক্সফোর্ডে। তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জন্মানোর পক্ষে অক্সফোর্ড জায়গাটা ভাল ছিল। জার্মানদের সঙ্গে একটা চুক্তি ছিল : তারা অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজে বোমা বর্ষণ করবে না, তার বদলে

*এই রচনা এবং এর পরবর্তী রচনার ভিত্তি হল ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জুরিখে আন্তর্জাতিক মোটর নিউরন সমিতি (Motor Neurone Disease Society) তে প্রদত্ত বক্তৃতা। এছাড়া ১৯৯১ সালের লেখা প্রবন্ধে দেওয়া তথ্যের সঙ্গে বক্তৃতার তথ্যগুলি যুক্ত হয়েছে।

ব্রিটিশরাও হাইডেলবার্গ (Heidelberg) এবং গটিংগেন (Gottingen) -এ বোমা বর্ষণ করবে না। খুব দুঃখের কথা, অনেকটা সুসভ্য এই ব্যবস্থা অন্যান্য শহরগুলিতে বিস্তৃত করা যায়নি।

আমার বাবা ছিলেন ইয়র্কশায়ারের (Yorkshire) লোক। তাঁর পিতামহ অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ ছিলেন একজন সম্পন্ন কৃষিজীবী। তিনি অনেকগুলি ক্ষেত খামার কিনেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ফসলের বাজারে যে সঙ্কট উপস্থিত হয় তার ফলে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। এই জন্য আমার বাবার বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। তবুও তাঁরা বাবাকে শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে পাঠান। বাবা সেখানে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নেন। তারপর তিনি ট্রপিক্যাল ডিজিজে (tropical disease --গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধি) গবেষণা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পূর্ব আফ্রিকায় যান। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্থলপথে আফ্রিকা পেরিয়ে একটা জাহাজ ধরে ইংলণ্ডে পৌঁছান। সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় সামরিক কর্মে যোগ দিতে চান। কিন্তু তাঁকে বলা হল তাঁর চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণা আরও বেশি মূল্যবান।

আমার মা ছিলেন একজন পারিবারিক চিকিৎসকের সাতটি সন্তানের ভিতরে দ্বিতীয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো (Glasgow) শহরে। তাঁর যখন বারো বছর বয়স তখন তাঁদের পরিবার দক্ষিণে ডেভন (Devon)-এ চলে আসেন। আমার বাবার পরিবারের মতো তাঁদের পরিবার সম্পন্ন ছিল না, তবুও তাঁরা আমার মা -কে শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি অনেকরকম কাজ করেছেন। তার ভিতরে একটি ছিল ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের (Tax Inspector) চাকরি। কাজটা তাঁর অপছন্দ ছিল। সে চাকরি ছেড়ে উনি সেক্রেটারির কাজ নেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার বাবার দেখা হয়।

আমরা থাকতাম উত্তর লণ্ডনের হাইগেট (Highgate) -এ। আমার বোন মেরীর জন্ম হয় আমার জন্মের আঠারো মাস পর। আমি শুনেছি, আমার বোনের জন্ম আমার পছন্দ হয়নি। আমাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য ছিল খুব অল্প, সেজন্য সমস্ত শৈশব জুড়ে আমাদের দু'জনের ভিতর দ্বন্দ্ব ছিল। বড় হওয়ার পর কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চলে যায়। তার কারণ আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছি। বোন ডাক্তার হল, ফলে আমার বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। আমার ছোট বোন ফিলিপ্পা (Philippa) -র যখন জন্ম হয়, তখন আমার বয়স প্রায় পাঁচ। ব্যাপারটা কি ঘটছে সেটা তখন বুঝতে পারতাম। আমার মনে

পড়ে আমি তার আগমনের প্রতীক্ষা করেছি। ভেবেছি, আমরা তিনজন একসঙ্গে খেলতে পারব। সে ছিল খুব ভাবপ্রবণ আর অনুভূতিপ্রবণ, আমি সবসময়ই তার বিচারবুদ্ধি এবং মতামতের মূল্য দিয়েছি। আমার ভাই এডওয়ার্ডের জন্ম হয়েছে অনেক পরে। সুতরাং আমার শৈশবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুবই কম। পরিবারের অন্য তিন শিশুর সঙ্গে তার বেশ পার্থক্য ছিল। বৌদ্ধিক (intellectual) এবং শিক্ষাজগতের সঙ্গে (academic) তার সম্পর্ক একেবারেই ছিল না। হয়তো এটা আমাদের পক্ষে ভালই হয়েছে। শিশু হিসাবে ওকে সামলানো ছিল বেশ কঠিন। কিন্তু ওকে ভাল না বেসে পারা যেত না।

প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে আছে সেটা হল হাইগেটের বায়রন হাউসে (Byron House) নার্সারিতে দাঁড়িয়ে কেঁদে বুক ফাটিয়ে দেওয়া। আমার চারদিকে বাচ্চারা খেলা করছিল। আমার মনে হয়েছিল খেলনাগুলি বেশ সুন্দর। আমারও খেলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আমার বয়স ছিল মোটে আড়াই বছর। আর এই প্রথম আমাকে অচেনা লোকেদের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় বাবা-মা আমার ব্যাপার দেখে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলেন। আমি ছিলাম তাঁদের প্রথম সন্তান। তাঁরা শিশুদের বিকাশ সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন, সেইসব বইয়ে লেখা ছিল দু'বছর বয়স থেকেই শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। কিন্তু সেই ভয়াবহ সকালের পর থেকে ওঁরা আমার স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। আবার আমাকে বায়রন হাউসে পাঠিয়েছিলেন দেড় বছর পর।

সেই সময় অর্থাৎ যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের ঠিক পরপর হাইগেট অঞ্চলে বিজ্ঞানজগৎ এবং শিক্ষাজগতের অনেকেই থাকতেন। অন্য কোনও দেশ হলে তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা হ'ত। কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের ভিতরে বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব কখনও স্বীকার করেনি। এখানকার সমস্ত বাবা-মা-ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের বায়রন হাউসে পাঠাতেন। সেই সময়কার মান অনুসারে স্কুলটা ছিল খুবই প্রগতিশীল। আমার মনে পড়ে বাবা-মা-র কাছে আমি নালিশ করতাম স্কুলে আমাকে কিছু শেখায় না। তখনকার প্রচলিত পদ্ধতি ছিল জোর করে ছাত্রদের শেখানো। এ পদ্ধতিতে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তার বদলে আশা করা হ'ত, ছাত্ররা বুঝতে পারবে না যে তারা শিখছে কিন্তু তারা পড়তে শিখে যাবে অজান্তে। শেষ পর্যন্ত আমি পড়া শিখেছিলাম কিন্তু আট বছর বয়সে। বয়সটা একটু বেশিই হয়েছিল। আমার বোন ফিলিপ্পা-কে শেখানো হয়েছিল প্রচলিত পদ্ধতিতে। সে চার বছর বয়সেই পড়তে পারত। নিঃসন্দেহে

তার বুদ্ধি ছিল আমার চাইতে বেশি।

উচু, সরু একটা ভিক্টোরীয় যুগের বাড়িতে আমরা থাকতাম। বাবা যুদ্ধের সময় বাড়িটা খুব সস্তায় কিনেছিলেন। তখন সবাই ভেবেছে লণ্ডনকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এমনকি একটা V-2 রকেট আমাদের বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে পড়েছিল। আমি তখন আমার মা ও বোনের সঙ্গে বাইরে ছিলাম কিন্তু বাবা বাড়িতে ছিলেন। কপালগুণে তাঁর কোনও চোট লাগেনি, বাড়িটারও বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু রাস্তায় একটু দূরে কয়েক বছর ধরে বোমা পড়া জায়গাটা ছিল। সেখানে আমি আর আমার বন্ধু হাওয়ার্ড খেলা করতাম। সে থাকত রাস্তার অন্যদিকে তিনখানা বাড়ি পরে। হাওয়ার্ড যেন আমার কাছে রহস্য উন্মোচন করেছিল। আমার চেনা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের মতো হাওয়ার্ডের বাবা-মা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। ও বায়রন হাউস স্কুলে যেত না—যেত সরকারী স্কুলে (Council School) । সে ফুটবল আর বক্সিং খেলা জানত। আমার বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ঐ ধরনের খেলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

জীবনের প্রথমদিকের আর একটা স্মৃতি—আমার প্রথম খেলনা রেলগাড়ির সেট পাওয়ার। যুদ্ধের সময় খেলনা তৈরি হ'ত না—অন্তত দেশের জন্য তো নয়ই! কিন্তু খেলনা রেলগাড়িতে আমার আকর্ষণ ছিল বিরাট। বাবা আমাকে একটা কাঠের রেলগাড়ি বানিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে খুশি হইনি। আমি এমন গাড়ি চেয়েছিলাম যেটা চলে। তাইতে বাবা একটা পুরানো স্প্রিং-য়ের রেলগাড়ি (clockwork train) কিনে লোহা দিয়ে ঝালাই করে আমাকে বড়দিনে দিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স প্রায় তিন। সে রেলগাড়িটাও ভাল হয়নি। যুদ্ধের পরপরই বাবা আমেরিকা গিয়েছিলেন, 'কুইন মেরী' জাহাজে ফেরার সময় মায়ের জন্য কিছু নাইলন কিনে এনেছিলেন। তখন ব্রিটেনে নাইলন পাওয়া যেত না। বোনের জন্য কিনে এনেছিলেন একটা পুতুল। সেটাকে শুইয়ে দিলে চোখ বন্ধ করত। আর আমার জন্য তিনি এনেছিলেন একটা আমেরিকান রেলগাড়ি। সেটাতে গরু ধরবার ফাঁদ ছিল, এমনকি বাংলা চারের আকারে রেললাইনও ছিল। বাক্সটা খুলে আমার যে উত্তেজনা হয়েছিল সেটা এখনও মনে পড়ে।

স্প্রিং-এর রেলগাড়িগুলি ভালই ছিল কিন্তু আসলে আমি চেয়েছিলাম ইলেকট্রিক ট্রেন। হাইগেটের কাছে ক্রাউচ এণ্ড (Crouch End)-এ একটা রেলওয়ে ক্লাবের প্রতিরূপে ইলেকট্রিক ট্রেনের নক্সা দেখতে দেখতে আমি

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। শেষ পর্যন্ত যখন বাবা-মা দুজনেই কোথায় যেন গিয়েছিলেন তখন আমি পোস্ট অফিসের ব্যাঙ্কে সামান্য যে ক'টা টাকা ছিল তাই তুলে নিয়ে একটা ইলেকট্রিক ট্রেনের সেট কিনে ফেললাম। টাকাগুলি আমি উপহার পেয়েছিলাম ক্রিস্‌নিং (christening)-এর মতো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিনে। কিন্তু তাতেও হতাশ হলাম, গাড়িটা ভাল হয়নি। আজকাল আমরা ক্রেতাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। আমার উচিত ছিল দোকানদার কিংবা যারা বানিয়েছে তাদের কাছে গিয়ে ঐ সেটটা ফেরৎ দিয়ে তার বদলে নতুন সেট দাবি করা। কিন্তু তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিছু কেনা, মানে একটা সুবিধা পাওয়া। সেটার যদি দোষ থাকে তাহলে আপনার কপালটা খারাপ। সুতরাং ইঞ্জিনের ইলেকট্রিক মোটরটা মেরামত করবার জন্য আমি টাকা দিলাম কিন্তু সেটা কখনওই ভাল কাজ করেনি। পরে বয়স যখন তেরো থেকে উনিশের মধ্যে তখন আমি এরোপ্লেন আর জাহাজের প্রতিরূপ (model) বানিয়েছি। হাতের কাজে আমি কোনওদিনই ভাল ছিলাম না তবে কাজটা আমি করেছিলাম আমার স্কুলের বন্ধু জন ম্যাক্লেনাহান (John Macclenahan) -এর সঙ্গে। ও কাজটা অনেক ভাল করত। বাড়িতে তার বাবার একটা কারখানা ছিল। আমি সবসময়ই চাইতাম এমন একটা প্রতিরূপ (model) গড়তে যেটা কাজ করে এবং আমি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সেটা দেখতে কিরকম তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। আমার মনে হয় এই উদ্দেশ্যে আমি আর আমার স্কুলের আর এক বন্ধু রজার ফার্নেহাউ (Roger Ferneyhough) দু'জনে মিলে অনেকগুলি জটিল খেলা আবিষ্কার করেছিলাম। একটা খেলা ছিল কারখানার উৎপাদন নিয়ে। সেটাতে ফ্যাক্টরি ছিল। সে ফ্যাক্টরিতে নানা রঙের একক (unit) ছিল, রাস্তা ছিল, রেললাইন ছিল। সেই রাস্তার রেললাইনে মাল যাতায়াত করত, এমনকি একটা শেয়ার মার্কেটও ছিল। যুদ্ধের খেলা ছিল। সে খেলার বোর্ডটাতে চার হাজার চৌকোণা খুপরি (square) ছিল। একটা সামন্ততান্ত্রিক খেলা ছিল—সে খেলায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের একটা বংশ থাকত আর থাকত সম্পূর্ণ একটা বংশপঞ্জী। আমার মনে হয় এই সমস্ত খেলা এবং রেলগাড়ি, জাহাজ আর এরোপ্লেনের খেলার উৎস ছিল একটাই। সে উৎস ছিল এগুলির কর্মপদ্ধতি জানা আর সেগুলিকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা জানা। পি. এইচ. ডি. (Ph.D.) শুরু করার পর এই প্রয়োজন মিটিয়েছে আমার মহাবিশ্বতত্ত্বসম্পর্কীয় গবেষণা। মহাবিশ্বের কর্মপদ্ধতি যদি আপনার জানা থাকে তাহলে এক অর্থে সেটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন।

১৯৫০ সালে আমার বাবার কর্মস্থল হাইগেটের কাছে হ্যাম্পস্টেড (Hampstead) থেকে লণ্ডনের উত্তর পার্শ্বে মিল হিলে (Mill Hill) নবনির্মিত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এ (National Institute for Medical Research – চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান) স্থানান্তরিত হয়। তাঁর মনে হয়েছিল হাইগেট থেকে বাইরে যাতায়াত করার চাইতে লণ্ডনের বাইরে থেকে শহরে যাতায়াত বুদ্ধিমানের কাজ। সেইজন্য আমার বাবা-মা সেণ্ট অ্যালবান্স- এর ক্যাথেড্রল টাউনে (Cathedral City of St. Albans) একটা বাড়ি কেনেন। জায়গাটা ছিল লণ্ডনের কুড়ি মাইল উত্তরে আর মিল হিল থেকে দশ মাইল উত্তরে। সেটা ছিল বেশ বড় ভিক্টোরীয় স্টাইলের জমকালো আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাড়ি। বাড়িটা কেনার সময় বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। বাসযোগ্য করতে হলে বাড়িটাতে অনেক কাজ করাবার ছিল। তারপর আমার বাবা আর টাকা খরচ করতে রাজি হলেন না। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইয়র্কশায়ারের অন্যান্য লোকেরই মতো। তার বদলে তিনি বাড়িটাকে চালু রাখতে চেষ্টা করতেন আর রঙ করতেন। কিন্তু বাড়িটা ছিল বেশ বড় আর বাবাও এসমস্ত কাজে খুব ওস্তাদ ছিলেন না। তবে পাকাপোক্ত গঠন ছিল বাড়িটার সুতরাং এ অযত্নে তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। ১৯৮৫ সালে বাবা খুব অসুস্থ হন (তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮৬ সালে)। বাবা-মা ১৯৮৫ সালেই বাড়িটা বিক্রি করেছেন। বাড়িটা আমি কিছুদিন আগে দেখেছি। মনে হয়নি বাড়িটাতে আর বেশি কিছু কাজ করা হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হল বাড়িটা একরকমই আছে।

গৃহকর্মী রাখে এরকম একটা পরিবারের জন্য বাড়িটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ভাঁড়ারঘরে একটা নির্দেশক ফলক ছিল— সেটা নির্দেশ করত কোন্ ঘর থেকে ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে। আমাদের কোনও গৃহকর্মী অবশ্য ছিল না কিন্তু আমার প্রথম শোবার ঘরটা ছিল ইংরাজী L গঠনের একটা ছোট ঘর। ঐ ঘরটা আমি চেয়েছিলাম আমার মাসতুতো বোন সারা (Sarah)-র কথায়। সে আমার চাইতে একটু বড়। সারা সম্পর্কে আমার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। সে বলেছিল আমরা ঐ ঘরে খুব মজা করতে পারব। ও ঘরটার একটা আকর্ষণ ছিল, ঐ ঘরের জানালা থেকে মাইকেলের ঘরের ছাদে উঠে জমিতে নেমে যাওয়া যেত।

সারা ছিল আমার মায়ের সবচেয়ে বড় বোন জ্যানেট (Janet) - এর মেয়ে। তিনি ডাক্তারি পড়েছিলেন আর তাঁর বিয়ে হয়েছিল একজন

সাইকোঅ্যানালিস্ট-এর সঙ্গে। তাঁরা পাঁচ মাইল উত্তরে হার্পেণ্ডেন (Harpenden) গ্রামে একইরকম একটা বাড়িতে থাকতেন। আমাদের সেণ্ট অ্যালবান্স (St. Albans)-এ বাস করতে যাওয়ার সেটা ছিল একটা কারণ। সারার কাছে থাকা আমার কাছে ছিল একটা বিরাট লাভের ব্যাপার। আমি প্রায়ই বাসে করে হার্পেণ্ডেন যেতাম। সেণ্ট অ্যালবান্স ছিল প্রাচীন রোমান শহর ভেরুলামিয়ামের (Verulamiam) পর। ভেরুলামিয়াম ছিল লণ্ডনের পরেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রোমান জনপদ। মধ্যযুগে ব্রিটেনের সবচাইতে বিত্তশালী মঠ ছিল ওখানে। এটা তৈরি হয়েছিল সেণ্ট অ্যালবান-এর মন্দিরের চারপাশে। তিনি ছিলেন প্রথম রোমান শতায়ু যাঁকে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মঠের অবশিষ্ট ছিল শুধুমাত্র একটা বিরাট এবং কুশ্রী গির্জা আর প্রাচীন মঠের প্রবেশদ্বারের দালানটি। সেটা তখন ছিল সেণ্ট অ্যালবান্স স্কুলের অংশ। পরে আমি সেই স্কুলেই পড়েছিলাম।

হাইগেট কিংবা হার্পেণ্ডেনের তুলনায় সেণ্ট অ্যালবান্স ছিল একটু গোঁড়া আর ভারিক্কি জায়গা। আমার বাবা-মায়ের সেখানে কোনও বন্ধু হয়নি। অংশত সেটা ছিল তাঁদের নিজেদের দোষ। কারণ তাঁদের স্বভাব ছিল একটু একা থাকা, বিশেষ করে এরকম স্বভাব ছিল আমার বাবার। কিন্তু ওখানকার জনসাধারণের শ্রেণীগত পার্থক্যেরও এটা প্রকাশ ছিল। আমার সেণ্ট অ্যালবান্স-এর স্কুলের বন্ধুদের কারওরই বাবা-মাকে বুদ্ধিজীবী বলা যেত না।

হাইগেটে আমাদের পরিবারটা মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু মনে হয় সেণ্ট অ্যালবান্স-এ আমাদের নিশ্চয়ই একটু ছিটগ্রস্ত (eccentric) বলে ভাবা হ'ত। আমার বাবার আচার-ব্যবহারে লোকের এইকরম মনে হ'ত। টাকা বাঁচানো সম্ভব হলে তিনি নিজের চেহারা কেমন হল তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। অল্পবয়সে তাঁদের পরিবার ছিল খুবই গরীব। তাঁর মনে সে দারিদ্র একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। নিজের আরামের জন্য পয়সা খরচ করা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এমনকি শেষ বয়সে যখন পয়সা খরচ করবার মতো অবস্থা হয়েছিল তখনও না। তিনি ঠাণ্ডায় খুবই কষ্ট পেতেন। কিন্তু বাড়িতে সেন্ট্রাল হিটিং লাগাতে রাজী হননি। তার বদলে তিনি নিজের স্বাভাবিক পোশাকের উপর কয়েকটা সোয়েটার আর ড্রেসিংগাউন পরে বসে থাকতেন। কিন্তু পরের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করতেন।

১৯৫০ সালে তিনি ভাবলেন নতুন গাড়ি কেনার মতো পয়সা তাঁর নেই,

সুতরাং তিনি যুদ্ধের আগেকার পুরানো একটা লণ্ডন ট্যাক্সি কিনলেন। আমি আর বাবা দু'জনে মিলে একটা নিসেন হাট* তৈরি করেছিলাম। সেটা ছিল গাড়ির গ্যারেজ। আমাদের পড়শীরা খুব রেগে গিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারেননি। সব ছেলেদের মতোই আমি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতাম। আমার বাবা-মায়ের কাজকর্মে একটু লজ্জাও পেতাম, কিন্তু ওঁরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

আমরা সেণ্ট অ্যালবান্স-এ যখন প্রথম গেলাম তখন আমাকে মেয়েদের হাইস্কুলে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। স্কুলের নামটা ওরকম হলেও দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা ঐ স্কুলে পড়তে পারত। সেই স্কুলে এক টার্ম (বৎসরের একটা অংশ) পড়বার পরে কিন্তু আমার বাবা আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তিনি প্রতিবছরই যেতেন তবে সে বছর তিনি একটু বেশিদিনের জন্য গিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় চার মাসের জন্য। বাবাকে ছেড়ে অতদিন থাকা আমার মায়ের পছন্দ হয়নি। সুতরাং তিনি আমাকে ও আমার দুই বোনকে নিয়ে তাঁর স্কুলের বন্ধু বেরিল (Beryl)-এর কাছে চলে গেলেন। বেরিল-এর বিয়ে হয়েছিল রবার্ট গ্রেভ্‌স (Robert Graves) - এর সঙ্গে। তিনি থাকতেন স্পেনের মেজরকা (Mejorca) দ্বীপের দেয়া (Deya) গ্রামে। ব্যাপারটা ঘটেছিল যুদ্ধের মাত্র পাঁচ বছর পর। হিটলার-মুসোলিনীর বন্ধু স্পেনের ডিক্টেটর তখনও ক্ষমতায় আসীন। (আসলে তিনি তারপরেও কুড়ি বছর ক্ষমতায় আসীন ছিলেন)। যুদ্ধের আগে আমার মা ইয়াং কম্যুনিস্ট লীগের সদস্যা ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তিনটি তরুণ শিশুকে নিয়ে মেজরকা গেলেন। আমরা দেয়া-তে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। সেখানে আমাদের দিনও কেটেছে আনন্দে। আমার এবং রবার্টের ছেলে উইলিয়ামের একই মাস্টার ছিলেন। এই মাস্টারমশাই ছিলেন রবার্টেরই একজন চেলা (Protege)। আমাদের পড়ানোর চাইতে তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল এডিনবরা উৎসবের জন্য একটা নাটক লেখা। সুতরাং তিনি আমাদের প্রতিদিন বাইবেলের এক অধ্যায় করে পড়ে সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখতে বললেন। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ইংরাজী ভাষার সৌন্দর্য শেখানো। ওখান থেকে চলে আসবার আগে আমরা বাইবেলের জেনেসিস (Genesis)

---

* Nissen hut — A barrel shaped pre-fabricated hut of corrogated iron with cement floor — করোগেটেড টিনের তৈরি পিপের মতো চেহারার আগে থাকতে তৈরি করা একটা বাড়ি, এর মেঝেটা সিমেন্টের।

এবং এক্সোডাস (Exodus) অধ্যায়ের একটা অংশ শেষ করি। প্রধান যে ক'টা জিনিস আমি শিখেছিলাম তার ভিতর একটা ছিল 'And' দিয়ে কোনও বাক্য শুরু না করা। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম বাইবেলের প্রায় প্রতিটি বাক্যই 'And' দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাকে বলা হল রাজা জেমস্ (King James) -এর পরে ইংরাজী ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি বললাম, তাহলে আমাদের বাইবেল পড়ালেন কেন? কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সেই সময় রবার্ট গ্রেভস্-এর বাইবেলের ভিতরকার অতীন্দ্রিয়বাদ ও প্রতীকীবাদ (mysticism & symbolism) -এ ছিল খুব উৎসাহ।

মেজরকা থেকে ফেরার পর আমাকে এক বছরের জন্য অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। তারপর আমি তথাকথিত ইলেভেন প্লাস পরীক্ষা দিলাম। এটা ছিল একটা বুদ্ধির পরীক্ষা। যারা সরকারী শিক্ষা চাইত তাদের এ পরীক্ষা দিতে হ'ত। এ পরীক্ষা এখন উঠে গিয়েছে। তার প্রধান কারণ অনেক মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েরা এ পরীক্ষায় ফেল করত এবং তাদের এমন স্কুলে পাঠানো হ'ত যেখানে খুব তাত্ত্বিক শিক্ষা হ'ত না (non-academic school)। আমি স্কুলের ক্লাসের পড়ায় যত নম্বর পেতাম তার চাইতে অনেক বেশি নম্বর পেতাম পরীক্ষায়। সুতরাং আমি ইলেভেন প্লাসের পরীক্ষায় পাশ করে সেণ্ট অ্যালবান্স স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেলাম।

আমার যখন ১৩ বছর বয়স তখন আমার বাবা চাইলেন আমি ওয়েস্ট মিনস্টার (West Minster) স্কুলে ভর্ত্তি হই। সেটা ছিল একটা প্রধান পাবলিক স্কুল অর্থাৎ আসলে প্রাইভেট স্কুল। তখনকার দিনে শ্রেণীর ভিত্তিতে শিক্ষার একটা কঠিন বিভাজন ছিল। আমার বাবার ধারণা ছিল তাঁর যোগাযোগ কম এবং গুরুত্বও কম। সেইজন্য তাঁর চাইতে অনেক কম দক্ষ লোকেরা তাঁকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তার কারণ তাদের সামাজিক অবস্থান অনেক উঁচুতে। আমার বাবা- মায়ের অবস্থা ভাল ছিল না। সেইজন্য আমার প্রয়োজন ছিল স্কলারশিপ পাওয়া। স্কলারশিপ পরীক্ষার সময় কিন্তু আমি অসুস্থ ছিলাম। সেইজন্য পরীক্ষাটা আমার দেওয়া হয়নি। তার বদলে আমি সেণ্ট অ্যালবান্স স্কুলেই রয়ে গেলাম। সেখানে আমি যা শিক্ষা পেয়েছিলাম সে শিক্ষা ওয়েস্ট মিনস্টার স্কুলে আমি যে শিক্ষা পেতাম তার মতো নিশ্চয়ই, হয়ত বা তার চাইতেও ভাল। আমার কখনও মনে হয়নি উঁচুতলার সমাজের আদব-কায়দা জানা না থাকায় আমার বিশেষ কোনও বাধা হয়েছে।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই শ্রেণীভিত্তিক। শুধু

স্কুলগুলিকেই উচ্চশিক্ষার (academic) জন্য এবং উচ্চশিক্ষার জন্য নয় (non-academic) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল তাই নয়, উচ্চশিক্ষার জন্য যে স্কুলগুলি, সেগুলিকেও ভাগ করা হয়েছিল A, B এবং C এই তিনটি স্রোতে (stream)। যারা A স্ট্রীম -এ ছিল তাদের পক্ষে ব্যাপারটা ভালই হ'ত। কিন্তু যারা B স্ট্রীম-এ থাকত তাদের পক্ষে ব্যাপারটা অত ভাল হ'ত না। আর যারা C স্ট্রীম-এ থাকত তাদের পক্ষে ব্যাপারটা খারাপই হ'ত। ফলে তারা নিরুৎসাহ হ'ত। এগারো প্লাসের পরীক্ষার ভিত্তিতে আমাকে A স্ট্রীম-এ রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বছরের পর যাদের স্থান কুড়ি জনের নীচে হ'ত তাদের B স্ট্রীম -এ নামিয়ে দেওয়া হ'ত। এটা ছিল তাদের আত্মসম্মানের পক্ষে একটা বিরাট আঘাত। ফলে অনেকেই সে আঘাত সামলে উঠতে পারত না। সেণ্ট অ্যালবান্স-এ প্রথম দুই টার্ম-এ আমি চব্বিশ আর তেইশতম স্থান পেয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয় টার্ম-এ আমার স্থান হয়েছিল অষ্টাদশ। সুতরাং আমি কোনওরকমে কান ঘেঁসে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কখনওই ক্লাসে মাঝামাঝির উপরে উঠতে পারিনি (ক্লাসটা ছিল খুবই মেধাবী আর সম্ভাবনাময়)। আমার ক্লাসের কাজকর্ম ছিল খুবই অপরিচ্ছন্ন আর আমার হাতের লেখা ছিল মাস্টারমশাইদের হতাশার কারণ। কিন্তু আমার ক্লাসের বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিল আইনস্টাইন। সেইজন্য মনে হয় আমার ভিতরে তারা ভাল কোনও লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। আমার যখন বারো বছর বয়স তখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আর এক বন্ধুর এক ব্যাগ মিষ্টির বাজী হয়েছিল। বাজীর বিষয় ছিল আমি জীবনে কখনওই কিছু করতে পারব না। জানি না এই বাজীর হিসাব কখনও মেটানো হয়েছিল কি না। আর মেটানো হয়ে থাকলেও কে জিতেছিল সেটা জানা নেই।

আমার ছ' সাত জন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাদের অধিকাংশের সঙ্গে আমার এখনও যোগাযোগ আছে। আমরা খুব দীর্ঘ আলোচনায় মগ্ন থাকতাম। আর সব বিষয়েই আমাদের তর্ক হ'ত। যেমন, বেতার-নিয়ন্ত্রিত মডেল (প্রতিরূপ) থেকে ধর্ম পর্যন্ত আবার প্যারাসাইকোলজি (Parapsychology)* থেকে পদার্থবিদ্যা পর্যন্ত। যেসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম তার ভিতরে

---

* সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া বহির্ভূত ব্যাপার বা অবস্থাদি (যেমন, ইন্দ্রিয়াতীত প্রক্রিয়ায় মন-জানাজানি, পূর্বাহ্নে লব্ধ জ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষকরণ) সংক্রান্ত বিদ্যা ও বিজ্ঞান।

একটা ছিল মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য এবং মহাবিশ্ব চালু করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল কিনা। আমি শুনেছিলাম সুদূর নীহারিকা থেকে আলো বর্ণালীর লালের দিকে বিচ্যুত হয় এবং এইজন্য মনে করা হয় মহাবিশ্ব বিস্তারমান (নীলের দিকে বিচ্যুত হলে তার অর্থ হ'ত মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হচ্ছে)। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম লালের দিকের এই বিচ্যুতির অন্য কোনও কারণ রয়েছে। হয়তো আলোক ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং আমাদের কাছে আসবার পথে লাল হয়ে যেত। মূলগতভাবে অপরিবর্তনশীল এবং চিরস্থায়ী মহাবিশ্বকে মনে হ'ত স্বাভাবিক। পি.এইচ.ডি-র জন্য দু'বছর গবেষণার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার ভুল হয়েছিল।

স্কুলের শেষ দু'বছরে আমি চেয়েছিলাম গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে। মিঃ তাহ্‌তা (Mr. Tahta) বলে একজন গণিতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন গণিতে অনুপ্রাণিত। স্কুলে একটা নতুন গণিতের ঘর তৈরি করা হয়েছিল। গণিতের লোকেরা সেখানে নিজেদের ক্লাসঘর বানিয়ে নিলেন। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তাঁর ধারণা ছিল মাস্টারি ছাড়া গণিতবিদদের অন্য কোনও চাকরি ভবিষ্যতে থাকবে না। আসলে আমি ডাক্তার হলেই তিনি খুশি হতেন। কিন্তু জীববিদ্যায় আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। আমার মনে হ'ত জীববিদ্যা অতিরিক্ত বিবরণসর্বস্ব এবং যথেষ্ট মূলগত নয়। তাছাড়া স্কুলে জীববিদ্যার স্থানও ছিল নীচে। সবচাইতে মেধাবী ছেলেরা গণিত এবং পদার্থবিদ্যা পড়ত। তার চাইতে যারা কম মেধাবী তারা পড়ত জীববিদ্যা। বাবা জানতেন আমি জীববিদ্যা পড়ব না। কিন্তু তিনি আমাকে জোর করে রসায়ন পড়িয়েছিলেন আর সামান্য কিছু গণিতও করিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এর ফলে বিজ্ঞানের যে কোনও শাখা নির্বাচনের পথ উন্মুক্ত থাকবে। আমি এখন গণিতের অধ্যাপক। কিন্তু ১৭ বছর বয়সে সেণ্ট অ্যালবান্স স্কুল ছাড়ার পর থেকে গণিতশাস্ত্রে কোনও প্রথাগত শিক্ষা আমার হয়নি। আমার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গণিত শিখে নিতে হয়েছে অর্থাৎ আমি যতটা গণিত জানি ততটা শিখতে হয়েছে কেম্‌ব্রিজে। আমাকে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের দেখাশোনা করতে হ'ত এবং তাদের শিক্ষাক্রমে তাদের চাইতে এক সপ্তাহ এগিয়ে থাকতে হ'ত।

বাবা ট্রপিক্যাল ডিজিজ্ নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি মিল হিল-এ আমাকে তাঁর সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে নিয়ে যেতেন। ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লাগত, বিশেষ করে ভাল লাগত অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখা। তিনি আমাকে

কীটপতঙ্গের (insects) ঘরেও নিয়ে যেতেন। সে ঘরে তিনি ট্রপিক্যাল ডিজিজ্ সংক্রমিত মশা রাখতেন। আমার দুশ্চিন্তা হ'ত। কারণ মনে হ'ত কিছু মশা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি খুবই পরিশ্রমী ছিলেন এবং গবেষণাকর্মে ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তাঁর একটু বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞার ভাব ছিল। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যারা অতটা ভাল নয় অথচ যাদের বংশপরিচয় উত্তম এবং যোগাযোগ ও সম্পর্কও ভাল, তারা তাঁর চাইতে এগিয়ে গিয়েছে। তিনি এইসব লোক সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিতেন। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তারির সঙ্গে পদার্থবিদ্যার একটু পার্থক্য রয়েছে। তুমি কোন স্কুলে পড়েছ কিংবা কার সঙ্গে তুমি সম্পর্কিত তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি কি করছ এটাই আসল।

আমার সবসময়ই জিনিসগুলি কি করে চলে সেটা জানার খুব আগ্রহ ছিল। আমি সেগুলি কি করে কাজ করে দেখার জন্য জিনিসগুলি খুলে ফেলতাম। কিন্তু সেগুলি আবার জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত ভাল ছিলাম না। আমার ব্যবহারিক ক্ষমতা কখনওই আমার তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসার সমকক্ষ ছিল না। আমার বাবা আমার বিজ্ঞানে আকর্ষণকে সবসময়ই উৎসাহ দিতেন। এমনকি তিনি আমাকে গণিতও পড়িয়েছেন। তবে আমার বিদ্যা যতদিন না তাঁর বিদ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে ততদিন পর্যন্ত। আমার এই পশ্চাৎপট আর বাবার কর্মক্ষেত্র এরকম থাকার ফলে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করব। অল্প বয়সে আমি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ভিতরে কোনও পার্থক্য করিনি। কিন্তু তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি জানতাম, আমি পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করতে চাই। কারণ, পদার্থবিদ্যাই ছিল মূলগত বিজ্ঞান। পদার্থবিদ্যা স্কুলের সবচাইতে একঘেয়ে বিষয় ছিল। তার কারণ, এটা ছিল এত সহজ ও স্বতঃপ্রতীয়মান কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পদার্থবিদ্যাই পছন্দ ছিল। রসায়নশাস্ত্রে মজা ছিল অনেক বেশি। কারণ, বিস্ফোরণের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা হামেশাই ঘটত। কিন্তু পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের আশা দিত, আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কেন আমরা এখানে এসেছি সেটা বুঝবার। আমি মহাবিশ্বের গভীরতা মাপতে চেয়েছিলাম। হয়ত আমি খানিকটা সফলও হয়েছি। কিন্তু এখনও আমার জিজ্ঞাসা প্রচুর।

দুই

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ

বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমি অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজে পড়ি। তিনি নিজেও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়েছেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন আমারও সেখানে ভর্ত্তির চেষ্টা করা উচিত, কারণ, আমার সেখানে ভর্ত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। সেইসময় ইউনিভার্সিটি কলেজে গণিতশাস্ত্রের কোনও ফেলো (fellow) ছিল না। আমাকে রসায়নশাস্ত্র পড়তে বলার সেটাও একটা কারণ ছিল। গণিতশাস্ত্রে চেষ্টা না করে আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানে (natural science) স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করতে পারতাম।

পরিবারের আর সবাই একবছরের জন্য ভারতে চলে গেলেন। কিন্তু আমি রয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং A লেভেল (A level) পরীক্ষার জন্য। আমার হেডমাস্টারমশাইয়ের মতে অক্সফোর্ডে চেষ্টা করার পক্ষে আমার বয়স খুবই কম ছিল। কিন্তু আমি ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের স্কুলে আমার উপরের ক্লাসের দুটি ছেলের সঙ্গে স্কলারশিপ পরীক্ষা

দিতে গেলাম। আমার বিশ্বাস ছিল আমার পরীক্ষা খুবই খারাপ হয়েছে। প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারাররা অন্য সবার সঙ্গে কথা বলতে এলেন কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বললেন না। তারপর অক্সফোর্ড থেকে ফেরার ক'দিন পরে টেলিগ্রাম পেলাম আমি একটা স্কলারশিপ পেয়েছি।

আমার বয়স তখন ১৭ বছর। অন্য সব ছাত্রই সামরিক বাহিনীতে কাজ করার পর ভর্ত্তি হয়েছিল। তারা বয়সে ছিল আমার চাইতে অনেক বড়। আমার সেখানে খুব একা লাগত। শুধুমাত্র তৃতীয় বছরে সেখানে আমার ভাল লেগেছে। তখনকার দিনে অক্সফোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত কর্মবিরোধী। সবাই চাইত, আপনি খুব মেধাবী (brilliant) হবেন কিন্তু খাটবেন না কিংবা আপনি নিজের ক্ষমতার সীমা মেনে নিয়ে একটা চতুর্থ শ্রেণীর ডিগ্রী নিয়ে বেরোবেন। ভাল ডিগ্রীর জন্য কঠিন পরিশ্রম করাকে মনে করা হ'ত রূপালি মানুষের (বৃদ্ধ) লক্ষণ। অক্সফোর্ডের শব্দভাণ্ডারে এটাই ছিল সবচাইতে খারাপ বিশেষণ।

সেইসময় অক্সফোর্ডের পদার্থবিদ্যার পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে খাটুনি না করা ছিল অত্যন্ত সহজ। উপরে উঠবার আগে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর তিন বছর আমি অক্সফোর্ডে পড়েছি এবং তারপর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। একবার হিসাব করে দেখেছিলাম ওখানে যে তিন বছর ছিলাম সেই তিন বছরে আমি কাজ করেছিলাম প্রায় এক হাজার ঘণ্টা। অর্থাৎ গড়ে দিনে এক ঘণ্টা। এই কর্মহীনতায় আমার কোনও গর্ব নেই। আমি শুধুমাত্র তখনকার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি। আমার সহপাঠী ছাত্রদের অনেকেরই এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ একঘেয়েমির (boredom) আর খাটুনি করার মতো কোনও কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার করার। আমার অসুস্থতার একটা ফল হয়েছিল এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আপনি যদি আশু মৃত্যুর মুখোমুখি হন তাহলে উপলব্ধি করবেন বেঁচে থাকার একটা মূল্য আছে এবং আপনার অনেক কিছু করবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

আমার কর্মহীনতার জন্য আমি ঠিক করেছিলাম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সমস্যা নিয়ে কাজ করে ফাইনাল পরীক্ষা দেব এবং যে সমস্ত প্রশ্নে ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান (factual knowledge) দরকার সে প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাব। পরীক্ষার আগের রাত্রিতে উৎকণ্ঠার জন্য আমি ভাল ঘুমোতে পারিনি। সেজন্য আমি খুব ভাল করিনি। আমি ছিলাম প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রীর মাঝামাঝি এবং পরীক্ষকদের আমি কোন শ্রেণী পাব সেটা ঠিক করার জন্য আমাকে ইন্টারভিউ (interview) করতে হয়েছিল। পরীক্ষার সময় ওঁরা

আমাকে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সব জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁরা আমাকে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীই দিয়েছিলেন।

মনে হয়েছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় আমার গবেষণা করার মতো দুটি মূলগত বিষয় আছে। একটা হল মহাবিশ্ব তত্ত্ব (cosmology) অর্থাৎ অতি বৃহৎ নিয়ে গবেষণা আর একটা ছিল মৌলকণা (elementary particles) অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র নিয়ে গবেষণা। আমি ভাবলাম মৌলকণাগুলির আকর্ষণ কম। কারণ যদিও নতুন নতুন অনেক মৌলকণা আবিষ্কৃত হচ্ছে তবুও উপযুক্ত কোনও তত্ত্ব সে সময় ছিল না। বৈজ্ঞানিকরা শুধুমাত্র কণাগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সাজাতে পারতেন, যেমন করা হয় উদ্ভিদবিদ্যায় (botany) । অন্যদিকে মহাবিশ্ব তত্ত্বে ছিল একটা সুসংজ্ঞিত তত্ত্ব—আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ।

অক্সফোর্ডে তখন মহাবিশ্ব তত্ত্ব নিয়ে কেউ গবেষণা করতেন না। কিন্তু কেম্‌ব্রিজে ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) ছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার দিনে ব্রিটেনের সবচাইতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সুতরাং আমি ফ্রেড হয়েলের কাছে গবেষণার জন্য দরখাস্ত করলাম। কেম্‌ব্রিজে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হল কিন্তু শর্ত ছিল আমাকে প্রথম শ্রেণী পেতে হবে। কিন্তু যখন দেখলাম ডেনিস স্কিয়ামা (Denis Sciama) নামে এক ভদ্রলোকের কাছে আমাকে গবেষণা করতে হবে, তিনি হয়েল নন, আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। ডেনিস স্কিয়ামা-র কথা আমি তখনও শুনিনি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এটাই সবচাইতে ভাল হয়ে দাঁড়াল। হয়েল খুব বেশি বাইরে থাকতেন এবং তাঁর কাছ থেকে খুব বেশি সময় পাওয়া যেত না। অন্য দিকে স্কিয়ামা সেখানেই থাকতেন, সবসময় উদ্দীপনা দান করতেন। অবশ্য আমি তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সবসময় একমত হইনি।

স্কুলে কিংবা অক্সফোর্ডে গণিতের চর্চা খুব বেশি করিনি। সেজন্য প্রথমে ব্যাপক অপেক্ষবাদ খুবই কঠিন মনে হ'ত এবং আমি খুব এগোতে পারিনি। তাছাড়া অক্সফোর্ডের শেষ বছরে আমি লক্ষ্য করলাম আমার চলাফেরা কিরকম জবড়জং হয়ে পড়ছে। কেম্‌ব্রিজ পৌঁছানোর কিছুদিন পর আমার রোগনির্ণয় করা হল। ইংলণ্ডে আমার রোগটার নাম এ. এল. এস. (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS) কিংবা মোটর নিউরন ডিজিজ্ (Motor Neurone Disease), আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে একে লু গেরিগের ব্যাধি (Lou Gehrig's Disease) ও বলে। ডাক্তাররা এ রোগের নিরাময়ের কোনও উপায় বাতলাতে পারেননি, এমনকি এ রোগ যে আর খারাপ হবে না এ সম্পর্কেও কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।

অসুখটা প্রথমে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে বলে মনে হয়েছিল। গবেষণার জন্য খুব পরিশ্রম করে কোনও লাভ আছে বলে মনে হয়নি। তার কারণ পি. এইচ. ডি. করার মতো অতদিন বাঁচব বলে আশা করিনি। কিন্তু সময় যত যেতে লাগল রোগও তত ধীরগতি হতে লাগল। আমি ব্যাপক অপেক্ষবাদও বুঝতে শুরু করলাম আর আমার কাজও এগোতে লাগল। কিন্তু পার্থক্যের আসল কারণ ছিল জেন ওয়াইল্ড (Jane Wilde) নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হওয়া। যখন আমার এ. এল. এস. রোগ হয়েছে বলে জানা যায় মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয় প্রায় সেই সময়। বিবাহ স্থির হওয়ার ফলে আমি বাঁচার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম।

বিয়ে করতে হলে একটা চাকরি দরকার আর চাকরি পেতে হলে পি. এইচ. ডি. টা শেষ করা দরকার। সুতরাং জীবনে এই প্রথম আমি কাজ শুরু করলাম। অবাক হয়ে আমি দেখলাম কাজটা আমার ভাল লাগে। একে কাজ করা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। একজন বলেছিলেন : বৈজ্ঞানিক আর বারাঙ্গনারা যে কাজ করে আনন্দ পায়, সেই কাজের জন্য তারা পয়সা পায়।

আমি গনভিল (Gonville) এবং কীজ (Caius) কলেজে রিসার্চ ফেলো হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। আমার আশা ছিল দরখাস্তটা টাইপ করবে জেন। কিন্তু সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তখন তার হাতটা ভাঙা আর প্লাস্টার করা। আমার মানতেই হবে যতটা সহানুভূতি থাকা উচিত ছিল ততটা সহানুভূতি আমার ছিল না। ওর বাঁ হাতটা ভেঙেছিল সুতরাং ও ডানহাতে আমার কথামতো দরখাস্ত লিখতে পেরেছিল। টাইপ করে দিয়েছিলেন অন্য একজন।

আমার দরখাস্তে এমন দু'জনের নাম দেওয়ার দরকার ছিল যাঁরা আমার গবেষণা সম্পর্কে বলতে পারেন। গবেষণায় আমার অবেক্ষণকারী (supervisor) বলেছিলেন হারম্যান বণ্ডি (Hermann Bondi)-কে অনুরোধ করতে এমন একজন হওয়ার জন্য। বণ্ডি তখন লণ্ডনে কিংস্ কলেজের গণিতের অধ্যাপক এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদে একজন বিশেষজ্ঞ। ওঁর সঙ্গে আমার বার দুয়েক দেখা হয়েছিল। প্রসিডিংস্ অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি (Proceedings of the Royal Society) নামক একটি পত্রিকায় আমার লেখা একটা প্রবন্ধ তিনি জমা দিয়েছিলেন। কেম্‌ব্রিজে উনি একটা বক্তৃতা দেওয়ার পর আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম। উনি আমার দিকে একটা অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, উনি রাজি। স্পষ্টতই ওঁর আমাকে মনে ছিল না, কারণ কলেজ

থেকে যখন ওঁকে আমার সম্পর্কে জানবার জন্য চিঠি পাঠাল তখন উনি উত্তর দিলেন - আমার সম্পর্কে উনি কিছু শোনেনওনি। আজকাল আবার কলেজে এত লোক রিসার্চ ফেলোশিপ-এর জন্য দরখাস্ত করে যে, কোনও রেফারী যদি বলেন যে তিনি প্রার্থীকে চেনেন না, তাহলে তার আর কোনও আশা থাকে না। কিন্তু তখন দিনকাল ভাল ছিল, কলেজ চিঠি লিখে আমাকে এই রকম উত্তরের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। আমার অবেক্ষণকারী (supervisor) বণ্ডিকে ধরে তাঁর স্মৃতিটা ঝালিয়ে দিয়েছিলেন। বণ্ডি তারপর আমার সম্পর্কে এমন ভাল লিখলেন, যার হয়ত আমি উপযুক্তই নই। আমি ফেলোশিপটা পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে আজ অবধি আমি কীজ কলেজের ফেলোই রয়ে গিয়েছি।

ফেলোশিপের অর্থ হল—আমি তখন বিয়ে করতে পারি। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে আমরা বিয়ে করি। আমরা সাফোক (Sulfolk)-এ হনিমুন করি এক সপ্তাহের জন্য। আমার আর্থিক অবস্থা তখন ওর চাইতে ভাল ছিল না। তারপর আমরা নিউ ইয়র্কের ভিতর দিকে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অপেক্ষবাদের উপর একটা সামার স্কুলে (summer school) যোগদান করি। ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল বহুলোকের সঙ্গে একটা বড় হল ঘরে। সেখানে অনেক জোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, তাদের ছিল অনেক বাচ্চা। তারা বেজায় গোলমাল করত। ফলে আমাদের বিয়ের উপর বেশ চাপ পড়েছিল। অন্যদিক থেকে এই সামার স্কুলটা খুবই কাজে লেগেছে। ওখানে আমাদের কর্মক্ষেত্রের অনেক নেতৃস্থানীয় সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমার গবেষণা ছিল মহাবিশ্ব (cosmology) নিয়ে অর্থাৎ বৃহৎ মানে মহাবিশ্ব নিয়ে। এই সময় আমার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল অনন্যতা (singularities) নিয়ে। দূরতর নীহারিকাগুলি নির্দেশ করে--তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসরণ করছে : মহাবিশ্বের বিস্তার বেড়ে চলেছে। এর নিহিতার্থ হল অতীতে এই নীহারিকাগুলি নিকটতর ছিল। তারপরে প্রশ্ন ওঠে : এমনকি কোনও সময় ছিল যখন নীহারিকাগুলি পরস্পরের উপর চাপানো ছিল এবং মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম? নাকি অতীতে আর একটি সঙ্কোচন দশা (contracting phase) ছিল যখন নীহারিকারা পরস্পরকে আঘাত করা এড়াতে পেরেছিল? হয়ত তারা পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে আবার পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ শুরু করেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে নতুন গাণিতিক সাধনীর প্রয়োজন ছিল। এগুলি বিকাশ লাভ করে ১৯৬৫ থেকে

১৯৭০ সালের ভিতরে। এ কাজ করেছিলাম প্রধানত আমি আর রজার পেনরোজ। পেনরোজ তখন ছিলেন লণ্ডনের বার্কবেক (Birkbeck) কলেজে, এখন তিনি আছেন অক্সফোর্ডে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ সত্য হলে অতীতে নিশ্চয়ই একটা অসীম ঘনত্বের অবস্থা ছিল : এ তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য ঐ গাণিতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলাম।

অসীম ঘনত্বের অবস্থাকে বলা হয় বৃহৎ বিস্ফোরণ অনন্যতা। এর অর্থ হল : ব্যাপক অপেক্ষবাদ যদি নির্ভুল হয় তাহলে মহাবিশ্ব কি করে শুরু হল বিজ্ঞান সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আমার আরও আধুনিক গবেষণা নির্দেশ করে কণাবাদী বলবিদ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করলে মহাবিশ্বের আরম্ভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

ব্যাপক অপেক্ষবাদের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল : পারমাণবিক জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে বৃহৎ ভরসম্পন্ন তারকাগুলি নিজেদের উপর চুপসে যাবে। আমার এবং পেনরোজের গবেষণায় দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অসীম ঘনত্বের অনন্যতায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ তারা চুপসে যেতেই থাকবে। এই অনন্যতা হবে কালের সমাপ্তি, অন্ততপক্ষে ঐ তারকা এবং তার উপরে অবস্থিত যে কোনও বস্তুসাপেক্ষ। অনন্যতার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে আলোক তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বেরোতে পারবে না, বরং সেই আলোককে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র পিছনে টেনে রাখবে। যে অঞ্চল থেকে নিষ্ক্রমণ সম্ভব নয় তার নাম কৃষ্ণগহ্বর (black holes) এবং তার সীমানাকে বলা হয় ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। যে কোনও বস্তু কিংবা ব্যক্তি ঘটনা দিগন্ত দিয়ে এই কৃষ্ণগহ্বরে পড়লে অনন্যতায় এসে সে কালের সমাপ্তিতে পৌঁছাবে।

১৯৭০ সালে আমার মেয়ে লুসির জন্মের কয়েকদিন পর এক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় কৃষ্ণগহ্বরের কথা ভাবছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি আর পেনরোজ অনন্যতা প্রমাণ করার জন্য যে প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছি সেগুলি কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে ঘটনা দিগন্তের এলাকা অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা কালে কালে হ্রাস পেতে পারে না এবং দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষের পর তারা সংযুক্ত হয়ে যদি একটি কৃষ্ণগহ্বর গঠন করে তাহলে অন্তিম গহ্বরের দিগন্ত প্রাথমিক কৃষ্ণগহ্বরগুলির দিগন্তের এলাকার (area) চাইতে বেশি হবে। সংঘর্ষে কতটা শক্তি বিচ্ছুরিত হবে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ সীমা এর ফলে তৈরি হল। আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, সে রাত্রে বিশেষ ঘুমোতে পারিনি।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমি কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা করেছি। কিন্তু ১৯৭৪ সালে বোধ হয় সবচাইতে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করেছিলাম। কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়—ক্ষুদ্র মানে পদার্থের আচরণ বিচার করলে দেখা যায় কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা এবং বিকিরণ বের হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বর তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো বিকিরণ উৎসর্জন (emit) করতে পারে।

১৯৭৪ সাল থেকে অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যার সমন্বয় করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব করার চেষ্টা করছি। সাণ্টা বারবারাতে (Santa Barbara) আমি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম হার্টল (Jim Hartle)-এর কাছে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম সেই প্রস্তাব এর ফল । প্রস্তাবটা হল, কাল এবং স্থান দুটিই সীমিত। কিন্তু এদের কোনও সীমানা কিংবা কিনারা নেই। তারা হবে অনেকটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো কিন্তু তাদের আরও দুটি মাত্রা (dimension) থাকবে। পৃথিবীপৃষ্ঠের এলাকা সীমিত। কিন্তু তার কোনও সীমানা নেই। আমার সমস্ত ভ্রমণেও কখনও আমি পৃথিবীর কিনারা থেকে পড়ে যেতে পারিনি। এ প্রস্তাব যদি সত্য হয় তাহলে কোনও অনন্যতা থাকবে না এবং বিজ্ঞানের বিধিগুলি সর্বত্রই প্রযোজ্য হবে, এমনকি, মহাবিশ্বের শুরুতেও। মহাবিশ্ব কি করে শুরু হবে সেটাও স্থির করবে বিজ্ঞানের বিধি। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মহাবিশ্ব *কি করে* শুরু হল সেটা আবিষ্কার করা। হয়ত সে প্রচেষ্টায় আমি সাফল্য লাভ করতাম কিন্তু আমি এখনও জানি না *কেন* পৃথিবী শুরু হল।

তিন

আমার এ. এল. এস-এর অভিজ্ঞতা *

আমাকে অনেক সময়ই জিজ্ঞাসা করা হয় : এ. এল. এস নিয়ে থাকতে আপনি কেমন বোধ করেন? আমার উত্তর : খুব বেশি কিছু নয়। আমি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চেষ্টা করি, আর চেষ্টা করি নিজের অবস্থা নিয়ে না ভাবতে কিংবা যে সব জিনিস করতে পারি না তার জন্য দুঃখ না করতে। সে কাজগুলি সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

আমার মোটর নিউরন ডিজিজ হয়েছে জানতে পেরে আমি মনে একটা জোর ধাক্কা খেয়েছিলাম। শৈশবে আমার দৈহিক সমন্বয় খুব ভাল ছিল না। আমি বল খেলায় খুব ভাল ছিলাম না, হয়ত সেইজন্য আমি খেলাধূলা কিংবা দৈহিক ক্রিয়াকর্ম গ্রাহ্য করিনি। মনে হয় অক্সফোর্ডে যাওয়ার পর ব্যাপারটা

* ১৯৮৭-র অক্টোবর মাসে বার্মিংহামে ব্রিটিশ মোটর নিউরন ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন-এর কনফারেন্সে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।

একটু বদলেছিল। আমি হাল ধরা আর নৌকা চালানো শুরু করেছিলাম। বোট রেসে* (Boat Race -নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা) যাওয়ার মতো ছিলাম না তবে ইণ্টারকলেজ প্রতিযোগিতায় নামবার মতো মান আমার ছিল।

অক্সফোর্ডে তৃতীয় বছরে কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চলাফেরায় আমি জবড়জং হয়ে যাচ্ছি। একবার, দু'বার বিনা কারণে পড়েও গেলাম। কিন্তু পরের বছর কেম্‌ব্রিজে যাওয়ার পরেই মা ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন এবং পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালেন। আমার একবিংশতি জন্মদিনের কয়েকদিন পরেই আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হলাম। হাসপাতালে ছিলাম দু'সপ্তাহ। সেই সময় নানারকম পরীক্ষা হল। ওঁরা আমার বাহু থেকে খানিকটা মাংসপেশী কেটে নিলেন, আমার গায়ে কতগুলি ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দিলেন, আমার শিরদাঁড়ার ভিতরে রঞ্জনরশ্মির কাছে অস্বচ্ছ এই রকম কিছু তরলপদার্থ ঢুকিয়ে দিলেন আর খাটটা নেড়েচেড়ে দেখলেন সেটা উপর-নীচে কিভাবে যাতায়াত করে। এতশত করেও কিন্তু বললেন না আমার কি হয়েছে। বললেন—রোগী হিসাবে আমি একটি ব্যতিক্রম (a typical)। আমি কিন্তু জানতে পারলাম যে তাঁদের আশঙ্কা—রোগটা ক্রমশই খারাপ হবে এবং ভিটামিন দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই। আমি বুঝতে পারছিলাম ওগুলিতে কোনও কাজ হবে বলে ওঁরা আশা করেননি। এর চাইতে বেশি কিছু জানতে আমার ইচ্ছে করেনি। কারণ, স্পষ্টতই খবরটা খারাপই।

আমি এমন একটা রোগে ভুগছি যেটা সারবে না এবং কয়েক বছরের ভিতরেই আমার মৃত্যু হবে—এই বোধ একটা মানসিক আঘাত সত্যিই আমাকে দিয়েছিল। আমার এ রোগ হল কি করে? কেন আমার জীবন এইভাবে শেষ হবে? কিন্তু আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমার উল্টোদিকের বিছানায় একটি ছেলে মারা গেল। আমি আব্‌ছা আব্‌ছা বুঝতে পেরেছিলাম রোগটা ছিল লিউকেমিয়া। দৃশ্যটা খুব সুন্দর মনে হয়নি। স্পষ্টতই এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের অবস্থা আমার চাইতেও খারাপ। আমার অন্ততপক্ষে নিজেকে রোগী মনে হয় না। যখন আমার নিজের জন্য দুঃখ করতে ইচ্ছা করে তখন আমি ঐ ছেলেটির কথা মনে করি।

আমার কি হবে জানতাম না। একটা অনিশ্চিত অবস্থায় আমি ছিলাম।

---

*অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা বিশ্ববিখ্যাত।

ডাক্তার আমাকে বললেন কেম্‌ব্রিজে ফিরে গিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে। আমি তখন 'ব্যাপক অপেক্ষবাদ' এবং 'মহাবিশ্ব' নিয়ে গবেষণা সবে শুরু করেছি। তবে বেশি এগোতে পারছিলাম না, কারণ আমার অঙ্কের ভিতটা ভাল ছিল না। আমি হয়ত পি. এইচ. ডি. শেষ করার মতো অতদিন বেঁচে নাও থাকতে পারি। নিজেকে একটা বিয়োগান্ত কাহিনীর চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল। আমি ওয়াগনার (Wagner) শুনতে শুরু করলাম। কিন্তু পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে যে বলা হয়েছে আমি খুব বেশি মদ খেতাম, সেটা একটু অতিশয়োক্তি। অসুবিধাটা হল, কোনও একটা প্রবন্ধে একথা লেখা হলেই অন্য প্রবন্ধে সেটা নকল করা হয়। তার কারণ, কাহিনীটা ভাল। বারবার ছাপার অক্ষরে যেটা বেরোয় সেটাই সত্যি।

সে সময় আমার স্বপ্নগুলিও গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল। রোগনির্ণয় হওয়ার আগে জীবনটাই আমার একঘেয়ে লাগছিল, করবার মতো কিছু আছে বলে মনে হ'ত না। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বার হওয়ার কয়েকদিন পরই স্বপ্ন দেখলাম আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল আমার মৃত্যুদণ্ড মকুব হলে আমি অনেক কাজের কাজ করতে পারি। আর একটা স্বপ্ন আমি কয়েকবার দেখেছি—সেটা হল--আমি পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করব। আমাকে যদি মরতেই হয় তাহলে এভাবে মরলে হয়তো ভাল কিছু হবে।

কিন্তু আমি মরিনি। আসলে যদিও আমার ভবিষ্যৎ ছিল কালো মেঘে ঢাকা তবুও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমি অতীতের চাইতে বর্তমানকে বেশি উপভোগ করছি। আমার গবেষণাও এগোতে লাগল। আমার বিয়ে ঠিক হল--বিয়ে করলামও। কেম্‌ব্রিজে কীজ কলেজে (Caius College) রিসার্চ ফেলোশিপ পেলাম।

কীজ কলেজের ফেলোশিপ আমার তাৎক্ষণিক বেকার সমস্যার সমাধান করল। আমি কপালগুণে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণার কাজ বেছে নিয়েছিলাম, কারণ, যে কয়েকটা ক্ষেত্রে আমার অবস্থা বিশেষ কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করত না, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা তার ভিতরে একটা। আমার ভাগ্য ভাল ছিল—কারণ আমার অক্ষমতা যেমন বেড়েছে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার খ্যাতিও তেমনি বেড়েছে। এর অর্থ হল, লোকে আমাকে পর পর এমন পদ দিতে রাজি ছিল, যে পদে আমার শুধুমাত্র গবেষণাই করতে হ'ত, বক্তৃতা দিতে হ'ত না।

বাসস্থানের ব্যাপারেও আমার ভাগ্য ভাল ছিল। জেন তখনও লণ্ডনের ওয়েস্টফিল্ড কলেজে (Westfield College) আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে (তখনও

বি.এ., বি.এস. সি-র মতো স্নাতক হয়নি)। সুতরাং সমস্ত সপ্তাহ তাকে লণ্ডন অবধি যেতে হ'ত। এর অর্থ ছিল আমাদের এমন কোনও জায়গা খুঁজে বার করতে হ'ত যেখানে আমি নিজের কাজ নিজেই করতে পারি এবং যে জায়গা কেন্দ্রে অবস্থিত। তার কারণ আমি বেশি দূর হাঁটতে পারতাম না। কলেজকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা কোনও সাহায্য করতে পারেন কিনা কিন্তু কলেজের তখনকার কোষাধ্যক্ষ আমাকে বললেন : ফেলোদের গৃহসমস্যায় কোনও সাহায্য না করাই কলেজের নীতি। বাজারের কাছে কতগুলি নতুন ফ্ল্যাট হচ্ছিল, অগত্যা আমরা সেখানেই ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার জন্য নাম লেখালাম। (কয়েকবছর পর আমি আবিষ্কার করেছিলাম ঐ ফ্ল্যাটগুলির মালিক ছিল কলেজ কিন্তু ওঁরা আমাকে সে কথা বলেননি)। গ্রীষ্মের পর আমেরিকা থেকে কেম্‌ব্রিজে ফিরে দেখলাম ফ্ল্যাটগুলি তখনও তৈরি হয়নি। কোষাধ্যক্ষ আমাকে বিরাট খাতির করে গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের হোস্টেলে আমাদের একটা ঘর দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'সাধারণত আমরা এক এক রাতের জন্য এই ঘরগুলির সাড়ে বারো শিলিং ভাড়া নিই, তবে আপনারা যেহেতু দু'জন সেইজন্য আপনাদের দিতে হবে পঁচিশ শিলিং।'

আমরা ওখানে মোটে তিন রাত থেকেছিলাম। তারপর আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার ডিপার্টমেন্টের কাছে একটা ছোট বাড়ি পেলাম। বাড়িটা ছিল অন্য একটা কলেজের। তারা বাড়িটা নিজেদের একজন ফেলোকে ভাড়া দিয়েছিল। কিছুদিন আগে তিনি শহরতলিতে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁদের লিজের (lease) আরও তিন মাস বাকী ছিল। সেই ক'দিনের জন্য বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিলেন। সেই তিন মাসের ভিতরে আমরা ঐ রাস্তার উপরেই একটা খালি বাড়ি পেলাম। বাড়ির মালকিন ডরসেটে (Dorset) থাকতেন। আমাদের একজন পড়শী ডরসেট (Dorset) থেকে মালকিনকে ডেকে এনে বললেন—'ছোকরারা বাড়ি খুঁজছে আর ঐ বাড়িটা খালি পড়ে আছে—এ এক কলঙ্ক!' সুতরাং মহিলা আমাদের বাড়ি ভাড়া দিলেন। ঐ বাড়িতে কয়েকবছর থাকবার পর মেরামত করে নিতে চাইলাম। আমরা কলেজের কাছে বাড়ি বন্ধক রেখে ধার চাইলাম। কলেজ বাড়িটা সার্ভে করিয়ে সিদ্ধান্তে এল —ওটা বন্ধক রাখার উপযুক্ত নয়। শেষে আমরা একটা বিল্ডিং সোসাইটির কাছে বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে বাড়ি কিনলাম আর বাবা-মায়ের কাছে টাকা নিয়ে বাড়িটা ঠিকঠাক করলাম।

ও বাড়িতে আমরা আরও চার বছর ছিলাম। ক্রমশ সিঁড়ি ভাঙা আমার

পক্ষে খুবই কঠিন হতে লাগল। এর ভিতরে কলেজে আমার একটু দাম বাড়ল আর নতুন একজন কোষাধ্যক্ষ এলেন। তাঁরা নিজেদের একটা বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটটা আমাদের দিতে চাইলেন। বাড়িটার ঘরগুলি ছিল বড় বড় আর দরজাগুলিও ছিল চওড়া। সুতরাং আমার পক্ষে বাড়িটা ভালই ছিল। আর অবস্থান ছিল শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি। ইলেক্‌ট্রিক হুইল চেয়ারে করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ডিপার্টমেণ্টে যেতে পারতাম। বাড়িটা ছিল বাগানঘেরা আর বাগানটা দেখাশোনা করত কলেজের মালীরা। তাইতে আমাদের তিনজন ছেলেমেয়েরও সুবিধা হল।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমি নিজে নিজে খেতে পারতাম, বিছানাতে উঠতে পারতাম আর বিছানা থেকে নামতেও পারতাম। জেন-ই আমাকে সাহায্য করতে পারত আর বাচ্চা দুটোকেও মানুষ করতে পারত। এর জন্য বাইরের কারও সাহায্য লাগত না। এরপর কিন্তু ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সেজন্য আমরা আমাদের সঙ্গে একজন গবেষক ছাত্রের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। বিনামূল্যে থাকবার ব্যবস্থা এবং আমার সযত্ন মনোযোগের বদলে ছাত্রটি আমাকে বিছানায় উঠতে নামতে সাহায্য করত। ১৯৮০ সালে আমি একজন কম্যুনিটি (community) নার্স এবং একজন প্রাইভেট নার্সের ব্যবস্থা করলাম। তারা সকালে বিকালে দু-এক ঘণ্টা করে আসতেন। ১৯৮৫ সালে আমার নিউমোনিয়া না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলছিল। তখন আমার ট্রাকিওস্টমি অপারেশন (Tracheostomy— শ্বাসনালীর একটা অপারেশন) হয়। সে সময় থেকে আমার চব্বিশ ঘণ্টাই নার্সের যত্নের প্রয়োজন হ'ত। এটা সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্যের ফলে।

অপারেশনের আগে আমার কথা ক্রমশই বেশি বেশি জড়িয়ে যাচ্ছিল। সেইজন্য যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ ছিল শুধুমাত্র তারাই আমার কথা বুঝতে পারত। তাহলেও আমি অন্ততপক্ষে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারতাম। আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলি আমি একজন সেক্রেটারিকে বলতাম—তিনি সেগুলি লিখে দিতেন। আমি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিতাম একজন দোভাষীর সাহায্যে। আমার কথাগুলি তিনি আরও স্পষ্ট উচ্চারণে বলে দিতেন। কিন্তু ট্রাকিওষ্টমি করার ফলে আমার কথা বলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ চলে গেল। কিছুদিন পর্যন্ত আমার ভাব প্রকাশ করার একমাত্র উপায় ছিল শব্দগুলি এক-একটি অক্ষরের সাহায্যে বানান করে বলা। যখন কেউ বানান লেখা কার্ডে সঠিক অক্ষরটা দেখাতেন তখন আমি ভুরু তুলে সম্মতি জানাতাম। বৈজ্ঞানিক

গবেষণাপত্র তো দূরের কথা, এইভাবে কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বলা বেশ শক্ত ছিল। তবে ওয়াল্ট ওলটোজ্ (Walt Woltosz) নামে ক্যালিফোর্ণিয়ার এক কম্প্যুটার বিশেষজ্ঞ আমার দুরবস্থার কথা শুনেছিলেন। তিনি ইকোয়ালাইজার (Equalizer) নামে একটা কম্প্যুটার প্রোগ্রাম লিখেছিলেন, সেটা তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন। এই যন্ত্রে আমার হাতের একটা সুইচ টিপলে পর্দায় অনেকগুলি শব্দের তালিকা ভেসে ওঠে। তা থেকে যে কোনও একটা শব্দ আমি বেছে নিতাম। যন্ত্রটা মাথা কিংবা চোখ নাড়িয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যেত। আমি কি বলতে চাইছি সেটা একবার ঠিক হলে সেটা বাক্য সংশ্লেষককে (speech synthesizer) পাঠাতে পারি।

প্রথমে আমি ইকোয় লাইজারটা চালাতাম একটা ডেস্ক টপ কম্প্যুটারের উপরে। পরে কেম্ব্রিজ অ্যাডাপ্টিভ কমিউনিকেশনস্-এর (Cambridge Adaptive Communications) ডেভিড মেসন (David Mason) আমার হুইল চেয়ারে একটা ব্যক্তিগত কম্প্যুটার (personal computer) এবং একটা বাক্য সংশ্লেষক (speech synthesizer) লাগিয়ে দিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি আগের চাইতে অনেক ভাল ভাবপ্রকাশ করতে পারি। মিনিটে প্রায় ১৫ টা শব্দ ব্যবহার করতে পারি। আমি যা দেখছি সেটা হয় বলতে পারি কিংবা ডিস্কে (কম্প্যুটারের চাকতি) জমিয়ে রাখতে পারি। তারপর আমি সেটাকে ছাপিয়ে নিতে পারি কিংবা সরল করে বাক্যের পর বাক্য বলতে পারি। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আমি দুটো বই লিখেছি আর কয়েকটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছি। আমি কয়েকটা বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা এবং সাধারণ মানুষের জন্য বক্তৃতাও দিয়েছি। সেগুলি শ্রোতাদের পছন্দ হয়েছে। আমার মনে হয় এর একটা প্রধান কারণ স্পীচ প্লাস (Speech Plus)-এর তৈরি স্পীচ সিনথেসাইজারের গুণগত মান। মানুষের কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব খুবই বেশি। আপনার কথা যদি জড়ানো হয় তাহলে লোকে ভাববে আপনি জড়বুদ্ধি। আমি যতগুলি শুনেছি তার ভিতরে এটাই বোধ হয় সবচাইতে ভাল। এ যন্ত্রে উচ্চারিত শব্দের পরিবর্তন হয়—ডালেকের মতো শোনায় না (Dalek—হিব্রুর চতুর্থ অক্ষর)। একমাত্র অসুবিধা হল আমার কথায় আমেরিকান টান এসে যায়। তবে এখন আমি নিজেকে ঐ স্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি। আমাকে ব্রিটিশের মতো কণ্ঠস্বর দিতে চাইলেও আমি আমার এখনকার স্বর বদলাতে রাজি হব না। তাহলে আমার মনে হবে আমি অন্য লোক হয়ে গেছি।

কার্যত আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই মোটর নিউরন ব্যাধিতে (Mo-

tor Neurone Disease) ভুগছি। কিন্তু সে রোগভোগ আমাকে আকর্ষণীয় পরিবার গঠন করতে এবং কর্মে সাফল্যলাভ করতে বাধা দিতে পারেনি। এটা সম্ভব হয়েছে আমার স্ত্রী, আমার সন্তান এবং অন্য অনেক লোকের এবং সংগঠনের সাহায্যের জন্য। আমার ভাগ্য ভাল, আমার অবস্থা ঐ অসুখের ক্ষেত্রে সাধারণত যত দ্রুত মন্দের দিকে যাওয়ার কথা তত দ্রুত মন্দ হয়নি। এ থেকে মনে হয় নিরাশ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

চার

বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি *

আমাদের ভাল লাগুক কি না লাগুক, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি গত একশ' বছরে তার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে—এবং আগামী একশ' বছরে তার আরও বেশি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে এ পরিবর্তন বন্ধ করে অতীতে ফিরে যেতে চান। তাঁদের দৃষ্টিতে অতীত যুগ ছিল শুদ্ধতর আর সরলতর। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই অতীতকাল এমন কিছু চমকপ্রদ ছিল না। সুবিধাভোগী একটা সংখ্যালঘু অংশের কাছে ব্যাপারটা অত মন্দ ছিল না। তবু তাঁরা আধুনিক চিকিৎসা পেতেন না—মেয়েদের সন্তান জন্ম ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। অথচ জনগণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের

* ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রিন্স অফ আস্টুরিয়াস হারমনি এবং কনকর্ড প্রাইজ (Prince of Asturias Harmony & Concord Prize) পাওয়ার পর অভিয়েডো (Oviedo)-তে প্রদত্ত বক্তৃতা। বক্তৃতাটির কালোপযোগী সংস্কার করা হয়েছে।

কাছে জীবনটা ছিল নোংরা, পশুসুলভ আর স্বল্পস্থায়ী।

তবে, কেউ চাইলেও কালকে অতীত যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা খুশিমতো ভুলে যাওয়া যায় না। কেউ ভবিষ্যতের দিকে বৃহত্তর অগ্রগতি বন্ধ করতে পারে না। যদি গবেষণার জন্য দেয় সমস্ত সরকারী অর্থদান বন্ধ করে দেওয়া হয় (আধুনিক সরকার এ কর্ম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে) তাহলেও প্রতিযোগিতার শক্তিই প্রযুক্তিবিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাছাড়া অনুসন্ধিৎসু মনকে কেউ মূলগত বৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে বিরত করতে পারে না। সে চিন্তার জন্য তাদের অর্থপ্রাপ্তি হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি বন্ধ করার একমাত্র উপায় বিশ্বজোড়া এমন একটি একনায়কতন্ত্রী সরকার গঠন, যে সরকার যে কোনও নতুন চিন্তা দমন করবে। তবে মানবিক উদ্যম এবং উদ্ভাবনী শক্তি এমনই যে এতেও কোনও সাফল্য হবে না। এর ফলে শুধুমাত্র পরিবর্তনের হার একটু কমতে পারে।

আমরা যদি মেনে নিই যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা আমাদের পৃথিবীর পরিবর্তন আমরা বন্ধ করতে পারি না, তাহলে অন্ততপক্ষে আমরা চেষ্টা করতে পারি পরিবর্তনের অভিমুখ সঠিক করতে। এর অর্থ হল একটা গণতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা মূলগত বোধ থাকা উচিত। তার ফলে তারা সঠিক সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, বিশেষজ্ঞের হাতে সবটা ছেড়ে দেবে না। বর্তমানে জনসাধারণের বিজ্ঞান সম্পর্কে দুটো বিপরীতধর্মী ধারণা রয়েছে। একদিকে তাঁরা চান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি জীবনধারণের মানের যে উন্নয়ন করে চলেছে সে উন্নয়নের হার অক্ষুণ্ণ থাকুক। আবার অন্যদিকে তাঁরা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করেন না—তার কারণ বিজ্ঞান তাঁরা বোঝেন না। উন্মাদ বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরী করার চেষ্টা করছে—এই রকম সব কার্টুনে সে অবিশ্বাস স্পষ্ট। গ্রীনপার্টিগুলির সমর্থনের পিছনে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু জনসাধারণের বিজ্ঞানে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বিরাট আকর্ষণ রয়েছে। এটা বোঝা যায় টেলিভিশনে কসমস কিংবা বৈজ্ঞানিক কল্পকথার (science fiction) দর্শকদের বিরাট সংখ্যা দেখে।

এই আকর্ষণকে কি করে কাজে লাগানো যায়? কি করে তাদের ভিতরে সত্য সংবাদের ভিত্তিতে অম্ল বৃষ্টি (acid rain), গ্রীনহাউস অভিক্রিয়া (green house effect), পারমাণবিক অস্ত্র (nuclear weapons), বংশগতি সম্পর্কীয়

প্রযুক্তিবিদ্যা (genetic engineering) ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপট সৃষ্টি করা যায়? স্পষ্টতই এর ভিত্তি হতে হবে স্কুলের শিক্ষা। কিন্তু স্কুলে বিজ্ঞানকে অনেক সময়ই নীরস আকর্ষণহীনরূপে উপস্থিত করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাশ করার জন্য মুখস্থ করে কিন্তু বিশ্বে তাদের চতুষ্পার্শে সে বিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা তারা বুঝতে পারে না। তাছাড়া বিজ্ঞান অনেক সময়ই সমীকরণের সাহায্যে শেখানো হয়। যদিও সমীকরণগুলি গাণিতিক চিন্তন বোঝানোর সবচাইতে নির্ভুল এবং সংক্ষিপ্ত উপায় তবুও অধিকাংশ লোকই সমীকরণ দেখলে ভয় পান। কিছুদিন আগে আমি সাধারণ মানুষের জন্য একটা বৈজ্ঞানিক বই লিখেছি। তখন আমাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল : বইটিতে সমীকরণ থাকলে প্রতিটি সমীকরণের জন্য বিক্রি অর্ধেক করে কমে যাবে। বইটাতে আমি একটাই সমীকরণ দিয়েছি—আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E= Mc^2$। হয়ত এই সমীকরণটা না থাকলে বই-এর বিক্রি দ্বিগুণ হ'ত।

বৈজ্ঞানিকরা আর ইঞ্জিনীয়াররা চেষ্টা করেন তাঁদের চিন্তাধারা সমীকরণের অবয়বে প্রকাশ করতে। তার কারণ তাঁদের প্রয়োজন পরিমাণগত মূল্যগুলি নির্ভুলভাবে জানা। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাগুলি সম্পর্কে গুণগত ধারণাগুলিই যথেষ্ট। এই ধারণাগুলি ভাষা এবং ছবির সাহায্যেই প্রকাশ করা যায়—সমীকরণ ব্যবহার প্রয়োজন হয় না।

স্কুলে যে বিজ্ঞান শেখানো হয় সেটা শুধু মূলগত কাঠামো। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির হার এখন এত দ্রুত যে, সবার ক্ষেত্রেই স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পর থেকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিকাশ হয়ে চলেছে। স্কুলে থাকতে আমি কখনওই আণবিক জীববিদ্যা (molecular biology) কিংবা ট্রানজিস্টার (transistors) সম্পর্কে কিছু শিখিনি। কিন্তু বংশগতির ইঞ্জিনীয়ারিং (genetic engineering) এবং কম্প্যুটার--এই দুটির বিকাশে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা পরিবর্তন করার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। সাধারণের জন্য লেখা বই এবং পত্র-পত্রিকায় লেখা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রবন্ধ বিজ্ঞানের নতুন বিকাশ প্রচার করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য লেখা সবচাইতে জনপ্রিয় বইয়ের পাঠকও জনসাধারণের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। শুধুমাত্র টেলিভিশনই জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়। টেলিভিশনে অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক ভাল প্রোগ্রাম (programme—কার্যক্রম) থাকে কিন্তু অন্য অনেক প্রোগ্রামে বৈজ্ঞানিক বিস্ময়কে যাদুর খেলার মতো দেখানো হয়। অথচ সেগুলি ব্যাখ্যা করা হয় না

কিংবা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কাঠামোর সঙ্গে তাদের কিরকম মিল সেটা দেখানো হয় না। যাঁরা টেলিভিশনের জন্য বিজ্ঞানের প্রোগ্রাম তৈরি করেন তাঁদের বোঝা উচিত জনসাধারণকে শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়াই তাঁদের কর্তব্য নয়--জনতাকে শিক্ষাদানও তাঁদের কর্তব্যের অঙ্গ।

নিকট ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ে জনসাধারণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে? সবচাইতে জরুরী বিষয় হল পারমাণবিক অস্ত্র। খাদ্য সরবরাহ কিংবা গ্রীনহাউস অভিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্যা ধীরগামী কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র কয়েকদিনের ভিতরেই পৃথিবী থেকে সমস্ত মনুষ্য জীবন ধ্বংস করতে পারে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে পূর্ব-পশ্চিমের ভিতরকার উত্তেজনা অনেকটাই কমেছে। এর অর্থ হল পারমাণবিক অস্ত্রের ভীতি গণচেতনার পিছনের সারিতে স্থান নিয়েছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হত্যা করার মতো অস্ত্র রয়েছে ততদিন পর্যন্ত বিপদও রয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলিতে পারমাণবিক অস্ত্রগুলিকে উত্তর গোলার্ধের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে প্রয়োজন শুধু কম্প্যুটারের একটা ভুল কিংবা অস্ত্রগুলি চালনা করার দায়িত্ব যাদের রয়েছে তাদের কয়েকজনের বিদ্রোহ। আর দুশ্চিন্তার বিষয় হল তুলনামূলকভাবে স্বল্প সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিও পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করছে। বৃহৎ শক্তিরা মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ আচরণ করে এসেছে কিন্তু লিবিয়া কিংবা ইরাক, পাকিস্তান, এমন কি আজারবাইজানের মতো রাষ্ট্র সম্পর্কে সে রকম বিশ্বাস থাকা সম্ভব নয়। কয়েকটা পারমাণবিক অস্ত্র অদূর ভবিষ্যতে তাদের দখলে আসতে পারে। বিপদটা সেখানে নয়। কারণ তাদের অস্ত্রগুলি হয়ত বেশ পুরানো ধরনের। হয়ত তারা কয়েক মিলিয়ন নরহত্যাও করতে পারবে। আসলে বিপদটা হল দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তির ভিতর যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিদের যুদ্ধে নামাতে পারে—সে শক্তিদের অস্ত্রসম্ভার বিরাট।

জনসাধারণের এটা বুঝতে পারা এবং অস্ত্রখাতে ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়ার গুরুত্ব প্রচুর। পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ দূর করা হয়ত কার্যক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কিন্তু অস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস করে আমরা বিপদটা কমাতে পারি।

আমরা পারমাণবিক যুদ্ধ যদি এড়াতে পারি তবুও এমন অনেক বিপদ আছে যা আমাদের সবাইকে ধ্বংস করতে পারে। একটা বদ রসিকতা আছে : অন্য গ্রহের কোনও সভ্যতা যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি তার

কারণ আমাদের স্তরে পৌঁছে তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। কিন্তু জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। হয়ত এই বদ রসিকতা আমরা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারব।

পাঁচ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস *

আমার লেখা বই 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' যে অভ্যর্থনা পেয়েছে তাতে আজও আমি বিস্মিত। *'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্'*-এর সর্বাধিক বিক্রীত পুস্তকের তালিকায় বইটি ছিল সাঁইত্রিশ সপ্তাহ আর লণ্ডনের *সানডে টাইম্‌স্* -এর তালিকায় ছিল আঠাশ সপ্তাহ(বইটা ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর)। এটা অনূদিত হচ্ছে কুড়িটি ভাষায়। (আমেরিকান ভাষাকে যদি ইংরাজী থেকে পৃথক ভাবা যায় তাহলে একুশটি

*এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দি ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকায়। 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এর সর্বাধিক বিক্রীত পুস্তকের তালিকায় ছিল তিপ্পান্ন সপ্তাহ। ব্রিটেনে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ -এ লণ্ডনের 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকায় দেখা যায় বইটি সর্বাধিক বিক্রীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ^205 সপ্তাহ ধরে। (১৮৪ সপ্তাহে এই তালিকায় সবচাইতে বেশি বার উল্লিখিত হওয়ার জন্য বইটি গিনেস বুক অফ রেকর্ডস - এ নথিভুক্ত হয়।) বিভিন্ন ভাষায় বইটার অনুবাদ করা সংস্করণের সংখ্যা এখন তেত্রিশ।

ভাষায়)। ১৯৮২ সালে প্রথম যখন আমি সাধারণ মানুষের জন্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা বই লেখার কথা ভাবছিলাম তখন যা আশা করেছিলাম এ প্রাপ্তি তার চাইতে অনেক বেশি। অংশত আমার উদ্দেশ্য ছিল মেয়ের স্কুলের মাইনে দেওয়ার জন্য টাকা সংগ্রহ করা(আসলে বইটা যখন সত্যিই ছাপা হয়ে বেরোল আমার মেয়ে তখন স্কুলের শেষ বছরে)। তবে মূল কারণ ছিল মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোধ কতদূর এগিয়েছে সে সম্পর্কে আমার নিজের বোধকে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা। অর্থাৎ আমরা কিভাবে মহাবিশ্ব এবং তার সর্বস্ব সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার মতো একটা সম্পূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কারের নিকটতর হতে পারি।

আমি চেয়েছিলাম, বই লেখার জন্য যদি সময় ব্যয় করতে হয়, আর পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে যত বেশি সম্ভব পাঠক পেতে। এর আগে লেখা আমার বৈজ্ঞানিক বইগুলি প্রকাশ করেছিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। কাজটা ওঁরা ভালই করেছিলেন কিন্তু যেরকম সাধারণ মানুষের বাজারে আমি প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম সে বাজারে ঢোকার মতো ব্যবস্থা তাঁদের ছিল বলে আমার মনে হয়নি। সুতরাং আমি যোগাযোগ করলাম একজন সাহিত্যপ্রতিনিধির (Literary Agent) সঙ্গে। তাঁর নাম আল জুকারম্যান (Al Zuckerman)। এক সহকর্মীর মাধ্যমে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সহকর্মীটি বলেছিলেন উনি ভদ্রলোকের ব্রাদার-ইন-ল (শালা, ভগ্নীপতি, ভায়রা—এইরকম সম্পর্ক)। আমি ওঁকে প্রথম অধ্যায়ের একটা খসড়া দিয়ে বলেছিলাম — আমি এমন বই করতে চাই যেটা বিমানবন্দরের বই-এর স্টলে বিক্রি হবে। তিনি বললেন এর কোনও সম্ভাবনা নেই। বইটা ছাত্র কিংবা পণ্ডিতমহলে ভালই বিক্রি হতে পারে কিন্তু ঐ রকম একটা বই জেফ্রি আর্চারের (Jeffrey Archer) কাছে যেতে পারবে না।

বইয়ের প্রথম খসড়া আমি জুকারম্যানকে দিয়েছিলাম ১৯৮৪ সালে। বইটা উনি কয়েকজন প্রকাশককে পাঠিয়েছিলেন। পরে আমাকে সুপারিশ করলেন—নর্টন (Norton) কোম্পানীর মত গ্রহণ করতে। কোম্পানীটা একটা উঠতি ভাল আমেরিকান পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তার বদলে আমি গ্রহণ করলাম ব্যান্টাম বুক্স (Bantam Books)-এর প্রস্তাব। যদিও ব্যান্টাম বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশ করায় বিশেষজ্ঞ হয়নি তবুও তাদের বই বহু বিমানবন্দরের বইয়ের দোকানে পাওয়া যেত। আমাদের বইটা তাদের গ্রহণ করার কারণ বোধহয় ছিল পিটার গুজার্ডি (Peter Guzzardi) নামে তাদের একজন

সম্পাদকের আমার বইটার প্রতি আকর্ষণ। কাজটা তিনি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতো যাঁরা অবৈজ্ঞানিক তাঁরা যাতে পড়ে বুঝতে পারেন, সেইরকম করার জন্য তিনি আমাকে দিয়ে বইটি দ্বিতীয়বার লিখিয়েছিলেন। আমি যতবারই কোনও অধ্যায় আবার নতুন করে লিখে ওঁর কাছে পাঠিয়েছি ততবারই তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তাঁর আপত্তির এক বিরাট তালিকাও পাঠিয়েছেন। আর পাঠিয়েছেন এমন কিছু প্রশ্ন যার উত্তর উনি আমার কাছ থেকেই চাইতেন। এক এক সময় মনে হয়েছে এ পদ্ধতি আর কোনওদিন শেষ হবে না। কিন্তু কাজটা তিনি ঠিকই করেছিলেন : এর ফলে বইটা অনেক ভাল হয়েছে।

ব্যাণ্টামের প্রস্তাব গ্রহণ করার সামান্য কয়েকদিন পর আমার নিউমোনিয়া হয়। আমার ট্রাকিওস্টমি (Tracheostomy) অপারেশান হয়, ফলে কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর্যন্ত আমার মনের ভাব প্রকাশ করার একমাত্র উপায় ছিল —কেউ কার্ডে অক্ষর দেখালে ভ্রূটা উঁচু করা। সুতরাং বইটা শুরু করা সম্ভব হ'ত না, কিন্তু সম্ভব হয়েছিল যে কম্প্যুটার প্রোগ্রাম আমাকে করে দেওয়া হয়েছিল তার সাহায্যে। কাজ হ'ত একটু ধীরে কিন্তু তখন আমি চিন্তাও করি ধীরে। সুতরাং ব্যবস্থাটা আমার কাজের উপযুক্তই ছিল। গুজার্ডির তাড়ায় ওই যন্ত্রের সাহায্যে আমার প্রথম খসড়াটা প্রায় সম্পূর্ণই নতুন করে লিখলাম। নতুন করে এই লেখার কাজে আমি ব্রায়ান হুইট (Brian Whitt) নামে আমার এক ছাত্রের সাহায্য পেয়েছিলাম।

জেকব ব্রোনোওয়াস্কির (Jacob Bronowski) টি. ভি. সিরিজ — দি এ্যাসেণ্ট অফ ম্যান (The Ascent of Man—মানুষের উত্থান) খুবই ভাল লেগেছিল। (এইরকম একটা লিঙ্গ প্রাধান্যমূলক নাম আজকাল আর কেউ বরদাস্ত করবে না।) এ থেকে মাত্র পনেরো হাজার বছর আগেকার আদিম অবস্থা থেকে মানবজাতির আধুনিক অবস্থায় উত্তরণের কৃতিত্ব সম্পর্কে একটা ভাবানুভূতি লাভ করা যায়। মহাবিশ্বকে যে সমস্ত বিধি শাসন করে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করে জানার পথে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে ঐরকমই একটা ভাবানুভূতি আমি বহন করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। মহাবিশ্বের ক্রিয়াপ্রণালী সম্পর্কে প্রায় সবাই জানতে উৎসুক এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম কিন্তু বেশির ভাগ লোকই গাণিতিক সমীকরণ বুঝতে পারেন না — ব্যক্তিগতভাবে আমিও সমীকরণগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। অংশত এর কারণ আমার পক্ষে সমীকরণ লেখা শক্ত কিন্তু আসল কারণ হল সমীকরণ

সম্পর্কে আমার স্বজ্ঞাবোধ (intuitive feeling) ছিল না। তার বদলে আমি চিন্তা করি চিত্রের বাগ্বিধিতে এবং এই পুস্তকে আমার উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত মানসচিত্র কয়েকটি পরিচিত উপমা এবং চিত্রের সাহায্যে ভাষায় প্রকাশ করা। আমার আশা ছিল গত পঁচিশ বছরে পদার্থবিদ্যার যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে উত্তেজনা এবং কৃতিত্ববোধের অংশীদার সবাই হতে পারবে।

গণিতকে এড়িয়ে গেলেও, কিছু কিছু চিন্তাধারা অপরিচিত এবং ব্যাখ্যা করা কঠিন। এও একটা সমস্যা সৃষ্টি করল। এগুলি কি আমি ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ঝুঁকি নেব, না কি অসুবিধাগুলি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাব? আমি যে চিত্র অঙ্কন করতে চাই তার জন্য অপরিচিত কল্পন অপ্রয়োজনীয়। যেমন — বিভিন্ন গতিতে চলমান দু'জন পর্যবেক্ষকের পক্ষে দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকালের মাপন ভিন্ন হবে — এ তথ্য চিত্রটির জন্য অপরিহার্য নয়। সেইজন্য আমি ভেবেছিলাম বেশি গভীরে না গিয়ে এগুলি শুধুমাত্র উল্লেখ করতে পারি। আমি যা বোঝাতে চাই তার জন্য কতগুলি কঠিন কল্পন ছিল মূলগত। বিশেষ করে এরকম দুটি কল্পন ছিল যেগুলিকে আমি বইটিতে রাখা উচিত বলে ভেবেছিলাম। একটি ছিল তথাকথিত ইতিহাসগুলির যোগফল। এ চিন্তনটি হল : মহাবিশ্বের শুধুমাত্র একটা ইতিহাসই নেই, বরং রয়েছে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য সমস্ত ইতিহাসের সমাহার এবং এই সমস্ত ইতিহাসই সমভাবে বাস্তব (এর অর্থ যাই হোক না কেন)। ইতিহাসের যোগফল কথাটার গাণিতিক অর্থ করতে হলে আর একটা চিন্তন দরকার। সেটা হল 'কাল্পনিক কাল'। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এখন আমি বুঝতে পারছি, এই দুটি অত্যন্ত কঠিন কল্পন ব্যাখ্যা করার জন্য আমার আরও বেশি পরিশ্রম করা উচিত ছিল। একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য কাল্পনিক কাল সম্পর্কে। মনে হয় বইয়ের ভিতরের এই ব্যাপারটাই অধিকাংশ পাঠকের অসুবিধার কারণ হয়েছে। কাল্পনিক কাল নির্ভুলভাবে বুঝবার সত্যিই কোনও প্রয়োজন কিন্তু নেই। এই কাল, আমরা যাকে বাস্তব কাল বলি তার চাইতে পৃথক — এটা জানাই যথেষ্ট।

বইটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন একজন বৈজ্ঞানিক '*নেচার*' পত্রিকায় সমালোচনার জন্য আগাম পাঠানো এই বই একখানা পান। বইটি পড়ে তিনি আঁৎকে উঠলেন। বইটি ছিল ভুলে ভরা — তাছাড়া আলোকচিত্র এবং অন্য ছবিগুলির লেবেলেও (label) গোলমাল ছিল। তিনি ব্যাণ্টামের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরাও একই রকম আঁৎকে উঠলেন। তাঁরা সেদিনই সমস্ত ছাপা বই ফিরিয়ে এনে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা তিন সপ্তাহ অত্যন্ত পরিশ্রম

করে সম্পূর্ণ বইটা সংশোধন করলেন, তাছাড়া বারবার মিলিয়েও দেখলেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল এপ্রিল মাসে — প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক দিনেই। এর ভিতরে টাইম পত্রিকায় আমার সম্পর্কে একটা লেখা বের হল। তবুও বইটার চাহিদা দেখে সম্পাদকরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকাতে বইটির সপ্তদশ মুদ্রণ চলছে আর ব্রিটেনে চলছে দশম মুদ্রণ।*

এত লোক বইটি কিনলেন কেন? আমি যে বস্তুনিষ্ঠ সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। সেইজন্য আমার মনে হয়, অন্য লোকে যা বলেছিল সেই অনুসারে চলব। আমি দেখেছি অধিকাংশ সমালোচনাই আমার পক্ষে হলেও তারা বিশেষ কোনও আলোকপাত করেনি। তারা সবাই একটা ফর্মুলা মেনে চলতে চেয়েছে : স্টিফেন হকিং-এর লু গেরিগ-এর (Lou Gehrig) ব্যাধি আছে (আমেরিকার সমালোচনাগুলিতে) কিংবা মোটর নিউরন ডিজিজ আছে (ব্রিটিশ সমালোচনাগুলিতে)। তিনি একটা হুইল চেয়ারে আটকে থাকেন, কথা বলতে পারেন না এবং এক্স সংখ্যক আঙুল নাড়াতে পারেন (এক্ষেত্রে মনে হয় X-এর মান এক থেকে তিন-এর ভেতরে ঘোরাফেরা করে। সংখ্যাটা নির্ভর করে, সমালোচক আমার সম্পর্কে কোন ভুল প্রবন্ধটা পড়েছেন তার উপরে)। তবুও তিনি বৃহত্তম প্রশ্নের উপরে এই বইটি লিখেছেন : কোত্থেকে আমরা এসেছি আর কোথায় আমরা চলেছি? হকিং যে প্রস্তাব করেছেন সেটা হল মহাবিশ্ব কেউ সৃষ্টি করেনি এবং ধ্বংসও হয় না.: এটা শুধুমাত্র রয়েছে। হকিং কাল্পনিক কালের কল্পন উপস্থিত করেছেন। সেটা বুঝতে আমার (সমালোচক) বেশ কষ্ট হয়। তবুও হকিং-এর বক্তব্য যদি সঠিক হয় এবং আমরা যদি একটা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব খুঁজে পাই তাহলে আমরা সত্যিই ঈশ্বরের মনটা জানতে পারব (প্রুফ দেখার সময় আমি বই-এর শেষ বাক্যটি প্রায় কেটেই দিয়েছিলাম। সে বাক্যটি হল – আমি ঈশ্বরের মনটা জানতে পারব। এটা যদি করতাম তাহলে বিক্রিটা অর্ধেক হয়ে যেত)।

দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (The Independent) নামে লণ্ডনের একটা পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল সেটা (আমার মনে হয়েছিল) অনেক বেশি অনুভবগুণসম্পন্ন। এই প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের* মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বইও একটা ধর্মসম্প্রদায়ের পুস্তক হয়ে উঠতে

*১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকাতে বইটির চল্লিশতম বোর্ড বাঁধাই সংস্করণ চলছিল আর উনবিংশতিতম হাল্কা বাঁধাই সংস্করণ চলছিল এবং ব্রিটেনে চলছিল উনবিংশতিতম বোর্ড বাঁধাই সংস্করণ।

পারে। আমার স্ত্রী আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু *'জেন এবং মোটর সাইকেল রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়ার'* মতো একটা বই-এর সঙ্গে আমার বই-এর তুলনা হতে পারে এই ভেবে আমি খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। জেনের মতো আমারও আশা, বিরাট বৌদ্ধিক এবং দার্শনিক প্রশ্নগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনও প্রয়োজন যে মানুষের নেই, সেই বোধ যেন তাদের হয়।

নিঃসন্দেহে অথর্ব হওয়া সত্ত্বেও আমি কিভাবে একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হতে পেরেছি সেই মানবিক আকর্ষণোদ্দীপক কাহিনী সাহায্য করেছিল। কিন্তু যাঁরা মানবিক আকর্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বইটি কিনেছিলেন তাঁরা হয়ত হতাশ হয়েছেন। তার কারণ, আমার অবস্থা সম্পর্কে বইটিতে গোটা দুয়েক উল্লেখমাত্র আছে। বইটির উদ্দেশ্য ছিল মহাবিশ্বের ইতিহাস লেখা, আমার ইতিহাস নয়। তা সত্ত্বেও এই দোষারোপ এড়ানো যায়নি যে ব্যাণ্টাম নির্লজ্জভাবে আমার অসুস্থতাকে ব্যবহার করেছে এবং প্রচ্ছদপটে আমার ছবিটা ব্যবহার করতে দিয়ে আমিও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। আসলে চুক্তি অনুসারে প্রচ্ছদের উপরে আমার কোনও অধিকার ছিল না, তবে আমি ব্যাণ্টামকে বোঝাতে পেরেছিলাম আমেরিকান সংস্করণে বিশ্রী এবং আগেকার ফটো ব্যবহার না করে ব্রিটিশ সংস্করণের একটা ভাল ফটো ব্যবহার করা হোক। ব্যাণ্টাম আমেরিকান প্রচ্ছদ পরিবর্তন করবেন না। তার কারণ, আমেরিকান জনসাধারণ এখন বই-এর প্রচ্ছদটাকে আমার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে।

অনেকে একথাও বলেছেন যে, লোকে বইটি কেনেন তার কারণ তাঁরা বইটির সমালোচনা পড়েছেন কিংবা বইটির উল্লেখ সর্বাধিক বিক্রীত পুস্তকের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু বইটি তাঁরা পড়েননি। তাঁরা বইটি তাঁদের বুককেসে কিংবা কফির টেবিলে সাজিয়ে রাখেন। ফলে বইটি বুঝবার মতো পরিশ্রম না করে বইটির মালিকানার গৌরব অনুভব করেন। এরকম ঘটে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে বাইবেল কিংবা সেক্সপীয়রের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বই-এর যেরকম অবস্থা হয় তার চাইতে মন্দ কিছু হয় বলে আমি জানি না। অন্যদিকে আবার আমি জানি অন্তত কিছু লোক বইটি পড়েছে। তার কারণ রোজই আমি গাদা গাদা চিঠি পাই, তাতে অনেকে প্রশ্ন করেন, আবার অনেকে বিস্তৃত মন্তব্য করেন। তাতে বোঝা যায় সবটা না বুঝলেও বইটি তাঁরা পড়েছেন। অপরিচিত অনেকে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেন বইটি তাঁদের কত ভাল লেগেছে। অবশ্য অন্য লেখকদের তুলনায় আমাকে অনেক সহজে চেনা যায় আর আমার বিশেষত্বও বেশি, আমি বিখ্যাত হয়ত নই, কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে

আমি যত অভিনন্দন পাই (আমার ন'বছরের ছেলে তাতে খুব সঙ্কোচ বোধ করে) তা থেকে মনে হয় যাঁরা বইটি কেনেন তাঁদের ভিতর অন্তত কিছু সংখ্যক লোক বইটি পড়েনও।

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে এর পরে আমি কি করব? আমি বুঝতে পারি কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিণাম কি পরিণতি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটার নাম কি দেব? কালের দীর্ঘতর ইতিহাস? কালের সমাপ্তি পথ? কালের সন্তান? আমার এজেন্টরা বলছেন আমার জীবনীর উপরে একটা চলচ্চিত্র করার অনুমতি দিতে। কিন্তু আমি যদি অভিনেতাদের দিয়ে নিজের চরিত্র চিত্রণ করি তাহলে আমার কিংবা আমার পরিবারের কোনও আত্মসম্মান অবশিষ্ট থাকে না। স্বল্পতর হলেও কাউকে যদি আমার জীবনী লিখতে দিই তাহলেও ব্যাপারটা একরকম হবে। অবশ্য, কেউ যদি স্বাধীনভাবে আমার জীবনী লেখেন তাহলে আমি বাধা দিতে পারি না – অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপমানজনক কিছু না লিখছেন। কিন্তু আমি তাঁদের এই বলে বাধা দিই যে, আমি নিজের আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবছি। হয়ত আমি লিখবও কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বিজ্ঞানে আমার অনেক কাজ, প্রথমে আমি সে কাজ করতে চাই।

ছয়

আমার অবস্থান *

এই প্রবন্ধটি আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কি না সে বিষয়ে নয়। তার বদলে আমি আলোচনা করব মহাবিশ্বকে কি করে বোঝা যায়। সে বিষয়ে আমার অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি : মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের (grand unified theory) অর্থই বা কি, অবস্থানই বা কোথায়? মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বকে বলা যায় 'সর্ববিষয়ব্যাপী একটা তত্ত্ব'। এক্ষেত্রে একটা সত্যিকারের সমস্যা রয়েছে। এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা এবং তর্ক করা উচিত দার্শনিকদের। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার আধুনিক বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকার মতো যথেষ্ট গাণিতিক যোগ্যতা নেই। একটা উপজাতি আছে তার নাম বিজ্ঞানের দার্শনিক। তাঁদের শিক্ষার মান আর একটু ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু

*১৯৯২ সালের মে মাসে কীজ কলেজের (Caius College) শ্রোতাদের কাছে এই বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল।

তাঁদের ভিতরে অনেকেই বিফলকাম পদার্থবিদ। তাঁরা দেখলেন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তার বদলে তাঁরা পদার্থবিদ্যা আর দর্শন নিয়ে লেখা শুরু করলেন। অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যার মতো এ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি নিয়ে তাঁরা এখনও তর্ক করে চলেছেন। পদার্থবিদ্যার বর্তমান সীমান্তের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নেই।

হয়ত দার্শনিকদের সম্পর্কে আমি একটু রূঢ়। কিন্তু তাঁরাও আমার সঙ্গে খুব সহৃদয় ব্যবহার করেননি। আমার পদ্ধতিকে বলা হয়েছে অতি সরল (naive) এবং স্বল্পবুদ্ধিমনের প্রকাশ। আমার নানা বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—সংজ্ঞাবাদী (nominalist), যন্ত্রবাদী (instrumentalist), দৃষ্টবাদী (positivist), বাস্তববাদী (realist) এবং অন্য নানারকমবাদী। পদ্ধতিটা হল, কলঙ্ক আরোপ করে একটা মতকে খণ্ডন করা। যদি আমার মতবাদের উপরে একটা মার্কা (label) লাগিয়ে দিতে পারেন তাহলে ভুলটা কোথায় সেটা আর বলার প্রয়োজন হয় না। ঐ সমস্ত মতবাদের মারাত্মক ভুলগুলি নিশ্চিতভাবে সবারই জানা।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যাঁরা সত্যিকারের প্রগতিসাধন করেন, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকরা তাঁদের যে শ্রেণীতে ফেলেন, ঐ আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু সে সব শ্রেণীর কথা ভাবেন না। আমি নিশ্চিত আইনস্টাইন, হাইসেনবার্গ এবং ডিরাক এঁরা কখনওই নিজেরা বস্তুবাদী কিংবা যন্ত্রবাদী--তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁদের চিন্তার বিষয় ছিল—তখনকার তত্ত্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে যৌক্তিক সঙ্গতির অনুসন্ধান সবসময়ই পরীক্ষামূলক ফলের চাইতে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে অমিল হওয়ার জন্য অন্য দিক থেকে অতি সুন্দর, অতি চমৎকার অনেক তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষালব্ধফলের ভিত্তিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছে এরকম কোনও ঘটনা আমি জানি না। সবসময় তত্ত্বই এসেছে প্রথম। সে তত্ত্বের প্রস্তাবনার অর্থ ছিল সুন্দর এবং সঙ্গতিপূর্ণ একটা প্রতিরূপ তৈরি করা। তত্ত্ব তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পরীক্ষা করা যায়। পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে যদি ভবিষ্যদ্বাণীর ঐক্য হয় তাহলেও তত্ত্বটা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু তত্ত্বটি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বেঁচে থাকে। সে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও যাচাই করা হয় পর্যবেক্ষণফলের নিরিখে। পর্যবেক্ষণফল যদি ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে না মেলে তাহলে তত্ত্বটা পরিত্যাগ করা

হয়।

কিংবা বলা যায় ঐ রকমই হওয়ার কথা। যে তত্ত্বের পিছনে অনেক সময় এবং শ্রম ব্যয় করা হয়েছে কার্যক্ষেত্রে মানুষ সে তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে চায় না। পর্যবেক্ষণফলের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন করে তারা শুরু করে । তাতে না হলে তারা তত্ত্বের একটা সাময়িক পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটা হয়ে দাঁড়ায় একটা বিশ্রী নড়বড়ে প্রাসাদ। তারপর কেউ একটা নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। সে তত্ত্বে পর্যবেক্ষণফলের গোলমেলে ব্যাপারগুলি সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর একটা উদাহরণ ১৮৮৭ সালের মিচেলসন-মর্লি (Michelson- Morley) পরীক্ষা । এই পরীক্ষায় দেখা গেল আলোর উৎস কিংবা পর্যবেক্ষক যেভাবেই চলমান হোক না কেন আলোর দ্রুতি সবসময় একই থাকে। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়েছিল। কেউ যদি আলোকের উৎসের অভিমুখে গমন করতে থাকে তাহলে আলো যেদিকে চলমান সেদিকে যে চলছে তার তুলনায় প্রথম লোকটির মনে হবে আলোর দ্রুতি বেশি। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল দু'জন পর্যবেক্ষকই মাপনে দেখবেন আলোর গতি নির্ভুলভাবে অভিন্ন। তার পরের আঠারো বছর হেনরিক লোরেঞ্জ (Hendric Lorentz) এবং জর্জ ফিটজারাল্ড (George Fitzgerald) স্থান এবং কাল সম্পর্কে সবার গৃহীত ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষাফলকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কতগুলি তদর্থক (adhoc) স্বীকৃতি উপস্থিত করলেন। যেমন, তাঁরা প্রস্তাব করলেন বস্তুপিণ্ডগুলি যখন অধিক দ্রুতিতে চলমান হয় তখন তাদের দৈর্ঘ্য হ্রস্বতর হয়ে যায়—এই প্রস্তাব। পদার্থবিদ্যার কাঠামোটাই কুশ্রী এবং গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। তারপর আইনস্টাইন উপস্থিত করলেন অনেক বেশি আকর্ষণীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এতে বলা হল কাল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এবং বিচ্ছিন্ন নয়, তার বদলে তিনি স্থানের সমন্বয়কারী একটা চারমাত্রিক বস্তু তৈরি করেন, তার নাম দিলেন স্থান-কাল। আইনস্টাইন তত্ত্বের দুটি অংশের সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয়ে যতটা উৎসাহী ছিলেন, পরীক্ষার ফলগুলি তাঁকে এই চিন্তাধারার ব্যাপারে ততটা উৎসাহিত করেনি। দুটি অংশের একটা হল যে বিধিগুলি বৈদ্যুতিক এবং চুম্বকক্ষেত্রগুলি শাসন করে এবং আরেকটা হল যে, বিধিগুলি বিভিন্ন বস্তুগুলির গতি শাসন করে।

আমার মনে হয় না, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন কিংবা আর কেউ অপেক্ষবাদ অতটা সরল এবং সুন্দর—সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। এই তত্ত্ব স্থান-কাল সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ একটা বিপ্লব এনে দেয়।

বিজ্ঞানের দর্শনে বাস্তববাদী হওয়া কতটা কঠিন, অপেক্ষবাদ আবিষ্কার তার একটা উদাহরণ। কারণ আমরা যাকে বাস্তব বলি সেটা নির্ভর করে কোন্ তত্ত্ব আমরা সমর্থন করি তার উপর।

আমি নিশ্চিত যে, লোরেঞ্জ আর ফিটজারাল্ড নিজেদের বাস্তববাদী মনে করতেন। তাঁরা আলোকের দ্রুতি সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে নিউটনের পরম (absolute) কাল এবং পরম স্থানের বাগ্বিধিতে ব্যাখ্যা করেছেন। মনে হয়েছিল স্থান এবং কাল সম্পর্কে এই ধারণাগুলি সাধারণ বুদ্ধি এবং বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায়। তবুও আজকাল যাঁরা অপেক্ষবাদে বিশ্বাস করেন (যদিও তাঁরা জনতার অতি ক্ষুদ্র এবং সংখ্যালঘু অংশ হওয়ার ফলে আমি উদ্বিগ্ন হই) তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। স্থান এবং কাল সম্পর্কেও মূলগত ধারণা সম্বন্ধে আধুনিক বোধ আমাদের জনসাধারণকে জানানো উচিত।

আমরা যাকে বাস্তব বলি সেটা যদি নির্ভর করে আমরা যাকে তত্ত্ব বলি তার উপরে, তাহলে আমরা বাস্তবতাকে কি করে দর্শনের ভিত্তি করব? আমি বলব সামনে একটা মহাবিশ্ব রয়েছে এবং সেটা অপেক্ষা করছে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য এবং তাকে বোঝার জন্য—এই অর্থে আমি একজন বাস্তববাদী। আত্মজ্ঞানবাদীদের (Solipsist) মত সব বস্তুই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। আমার ধারণা এইরকম কল্পনে শুধুমাত্র সময় নষ্ট করাই হয়। এই ভিত্তিতে কেউই কাজ করে না। মহাবিশ্বের বাস্তবতা কি, তত্ত্ব ছাড়া সেটা আমরা বুঝতে পারি না। সেইজন্য আমার মত—পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব পর্যবেক্ষণফলের বর্ণনা দেওয়ার জন্য একটা গাণিতিক প্রতিরূপ মাত্র। অনেকে এ জন্য আমাকে স্বল্পবুদ্ধি কিংবা অর্বাচীন বলেন। একটা তত্ত্ব যদি গঠনে সুন্দর হয়, যদি বহু পর্যবেক্ষণফল ব্যাখ্যা করতে পারে এবং নতুন নতুন পর্যবেক্ষণফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তাহলে আমরা বলি তত্ত্বটা উত্তম। এর বাইরে তত্ত্বটা বাস্তবানুগ কিনা সে প্রশ্ন করার অর্থ হয় না। তার কারণ তত্ত্বনিরপেক্ষ বাস্তবতা কি আমরা জানি না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্পর্কীয় এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আমাকে যন্ত্রবাদী কিংবা দৃষ্টবাদী (positivist)বলা হতে পারে, একথা আমি আগে বলেছি। আমাকে দু'রকমই বলা হয়েছে। যিনি আমাকে দৃষ্টবাদী বলেছিলেন, তিনি তার সঙ্গে একথাও যোগ করেছিলেন যে, দৃষ্ট আজকাল অচল, একথা সবার জানা। কলঙ্ক আরোপ করে যুক্তি খণ্ডন করার এটা আরেকটা উদাহরণ। ব্যাপারটা সেকেলে হতে পারে, কারণ এটা ছিল অতীতের বৌদ্ধিক খেয়াল। কিন্তু যাঁরা মহাবিশ্বের বিবরণ দান করার জন্য নতুন পদ্ধতি খুঁজছেন তাঁদের

পক্ষে আমি দৃষ্টবাদের যে বিবরণ দিয়েছি সেটা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাস্তবতার নামে আপিল করে কোনও লাভ নেই, কারণ বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের কোনও অন্য নিরপেক্ষ প্রতিরূপ নেই।

আমার মতে একটা অন্য নিরপেক্ষ বাস্তবতা সম্পর্কে অব্যক্ত বিশ্বাসই বিজ্ঞানের দর্শনের পক্ষে কণাবাদী বলবিদ্যা এবং অনিশ্চয়তাবাদ নিয়ে অসুবিধার কারণ। শ্রয়েডিংগার-এর বেড়াল নামে একটা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিন্তন পরীক্ষার গল্প রয়েছে। একটা বন্ধ বাক্সে একটা বেড়ালকে পুরে দেওয়া হল। বেড়ালটার দিকে একটা বন্দুক তাক করা আছে। যদি কোনও তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক (radio active nucleus) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (decays) তাহলে বন্দুকটা থেকে গুলি বেরোবে। এরকম হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। (আজকালকার দিনে এরকম প্রস্তাব করতে কেউ সাহস করবেন না। এমন কি শুদ্ধ-চিন্তন পরীক্ষার উপরও নয়। কিন্তু শ্রয়েডিংগারের সময় জন্তুদের মুক্তির কথা কেউ শোনেননি।)

বাক্সটা কেউ খুললে বেড়ালটাকে হয় জীবিত নয় মৃত দেখবেন। কিন্তু এ বাক্সটি খুলবার আগে বেড়ালটার কণাবাদী অবস্থান হবে মৃত বেড়ালের অবস্থা এবং জীবিত বেড়ালের অবস্থার একটা মিশ্রণ। অনেক বিজ্ঞানের দার্শনিকের এ ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কষ্ট। তাদের বক্তব্য বেড়ালটা অর্ধেক গুলি খাওয়া এবং অর্ধেক গুলি না খাওয়া হতে পারে না। ঠিক যেমন একজন মহিলা অর্ধেক গর্ভবতী হতে পারেন না। তাঁদের অসুবিধা হল বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণার ভিতরে নিহিত রয়েছে চিরায়ত চিন্তাধারা। সেই চিন্তনে একটা বস্তুপিণ্ডের একটাই নির্দিষ্ট নিশ্চিত ইতিহাস রয়েছে। কণাবাদী বলবিদ্যার মূল বক্তব্যই হল বাস্তবতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি অন্যরকম। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটা বস্তুপিণ্ডের একটামাত্র ইতিহাসই নেই, আছে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ইতিহাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ একটামাত্র ইতিহাস থাকার সম্ভাবনা এবং সামান্য পৃথক আর একটা ইতিহাস থাকার সম্ভাবনা পরস্পরকে বাতিল করে দেবে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ইতিহাস থাকার সম্ভাবনা পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধি করে। একটা বস্তুপিণ্ডের ইতিহাসে আমরা পর্যবেক্ষণ করি শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে (reinforced) এইরকম আরেকটা ইতিহাস।

শ্রয়েডিংগারের বেড়ালের ক্ষেত্রে রয়েছে দুটি ইতিহাস—যাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটা ইতিহাসে বেড়ালটিকে গুলি করা হয়েছে, অন্যটিতে সে বেঁচে আছে। কণাবাদী বলবিদ্যায় দুটি সম্ভাবনার অস্তিত্ব একত্র থাকতে পারে কিন্তু কোনও কোনও দার্শনিক প্যাঁচে পড়ে যান, কারণ তাঁদের অন্তর্নিহিত

অনুমান হল বেড়ালের একটা ইতিহাসই থাকতে পারে।

আমাদের পদার্থবিদ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের কল্পন নির্ধারণ করার আর একটা উদাহরণ কালের ধর্ম। কালের প্রবাহ অন্য কোনও ঘটনা নিরপেক্ষ এবং চিরন্তন — এ তথ্যকে আগে ভাবা হ'ত স্বতঃপ্রতীয়মান। কিন্তু অপেক্ষবাদ স্থান এবং কালকে সংযুক্ত করে ঘোষণা করল মহাবিশ্বের পদার্থ এবং শক্তি, স্থান এবং কাল দুটিকেই বিকৃত করে দিতে পারে। কালের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি আগে ছিল এ ধর্ম মহাবিশ্ব নিরপেক্ষ কিন্তু সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন মনে করা হয় মহাবিশ্বই কালের ধর্মের রূপ দান করে। তখন এরকম চিন্তন সম্ভব হল যে, অতীতে একটা বিশেষ বিন্দুর পূর্বে কালের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। অতীতে গমন করলে এমন একটা অনতিক্রমনীয় বাধা অর্থাৎ অনন্যতার (singularity) মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। সে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই যদি হয় তাহলে বৃহৎ বিস্ফোরণ কি করে হল কিংবা সে বিস্ফোরণ কে ঘটাল সে প্রশ্ন করার কোনও অর্থ হয় না। সৃষ্টি কিংবা কারণ সম্পর্কে আলোচনায় এ অনুমান নিহিত থাকে যে, বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতার আগেও একটা কালের অস্তিত্ব ছিল। পঁচিশ বছর হল আমরা জানি আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে পনেরো হাজার কোটি বছর আগে একটা অনন্যতায় কাল শুরু হয়েছিল। কিন্তু দার্শনিকরা এখনও এই চিন্তনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেননি। এখনও তাঁদের চিন্তা কশাবাদী বলবিদ্যার ভিত্তি নিয়ে। সে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পঁয়ষট্টি বছর আগে। পদার্থবিদ্যার সীমান্ত যে এগিয়ে চলেছে এটা তাঁরা বোঝেন না।

আরও মন্দ হল কাল্পনিক কালের গাণিতিক কল্পন। এই কল্পনে আমি আর জিম হার্টল (Jim Hartle) প্রস্তাব করেছিলাম মহাবিশ্বের হয়ত কোনও শুরু কিংবা শেষ নেই। কাল্পনিক কাল সম্পর্কে বলার জন্য একজন বিজ্ঞানের দার্শনিক আমাকে বর্বরভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — কাল্পনিক কালের মতো একটা গাণিতিক চাতুরির বাস্তব মহাবিশ্বের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমার মনে হয় গাণিতিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত কথা—বাস্তব আর কাল্পনিকের সঙ্গে সাধারণ দৈনন্দিন ভাষায় ব্যবহৃত বাস্তব আর কাল্পনিক শব্দের অর্থের ওঁরা গোলমাল করে ফেলেছেন। আমার বক্তব্য বিষয়ের এটা একটা উদাহরণ। তত্ত্ব কিংবা ব্যাখ্যা করার মতো কোনও প্রতিরূপ (model) না থাকলে আমরা কি করে জানব কোন্‌টা বাস্তব?

মহাবিশ্বকে বুঝবার সমস্যা বোঝানোর চেষ্টায় আমি অপেক্ষবাদ এবং

কণাবাদী বলবিদ্যা থেকে উদাহরণ ব্যবহার করেছি। আপনি যদি অপেক্ষবাদ কিংবা কণাবাদী বলবিদ্যা না বুঝতে পারেন তাহলেও কিছু এসে যায় না। এমন কি তত্ত্বগুলি ভুল হলেও কিছু যায় আসে না। আশা করি আমি দেখাতে পেরেছি — তত্ত্বকে একটা প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহার করা যায় এরকম কোনও দৃষ্টবাদী (positivist) পদ্ধতি, অন্ততপক্ষে একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদের পক্ষে মহাবিশ্বকে বুঝবার একমাত্র উপায়। আমি আশা করি, মহাবিশ্বের সবকিছুর বিবরণ দেওয়া যায় এরকম একটা সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিরূপ আমরা আবিষ্কার করতে পারব। তা যদি আমরা করি তাহলে সেটা হবে মানবজাতির একটা সত্যিকারের জয়।

সাত

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্ত কি আমাদের দৃষ্টিপথে ? *

এই প্রবন্ধে আমি অদূর ভবিষ্যতে, ধরুন, শতাব্দীর শেষাশেষি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। এর অর্থ: সম্ভাব্য সবরকম পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করার মতো ভৌত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত এবং ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব হয়ত আমরা পেতে পারি। এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে অবশ্য খুবই সাবধান হওয়া উচিত। এর আগে অন্তত দু'বার আমরা ভেবেছি : অন্তিম সংশ্লেষণের (final synthesis) কিনারায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি। এ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বাস করা হ'ত বলবিদ্যা সাংতত্যকের (continuum mechanics) বাগ্বিধিতে সবই বোঝা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু বিশেষ

*১৯৮০ সালের ২৯ শে এপ্রিল আমাকে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকেসিয়ান অধ্যাপক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত করা হয়। আমার অভিষেকের এই প্রবন্ধ আমার তরফ থেকে আমার একজন ছাত্র পড়েছিলেন।

কয়েকটি গুণাঙ্কের স্থাপিতাঙ্ক মাপন (coefficients of elasticity)। যেমন – সান্দ্রতা গুণাঙ্ক (coefficients of viscosity), পরিবাহিতা গুণাঙ্ক (coefficients of conductivity) ইত্যাদি। পারমাণবিক গঠন এবং কণাবাদী বলবিদ্যা আবিষ্কারের ফলে সে আশা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। উনিশশ' কুড়ির দশকের শেষ দিকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গটিংগেন (Gottingen)-এ এসেছিলেন। তাঁদের ম্যাক্স বর্ণ বলেছিলেন 'যাকে আমরা পদার্থবিদ্যা বলি, ছ'মাসেই সেটি শেষ হয়ে যাবে।' এ ঘটনা ঘটেছিল লুকেসিয়ান চেয়ারের একজন পূর্বতন অধিকারী পল ডিরাকের (Paul Dirac) ডিরাক সমীকরণ আবিষ্কারের সামান্য কিছুদিন পর। এই সমীকরণ ইলেকট্রনের আচরণ শাসন করে। আশা করা গিয়েছিল প্রোটনের আচরণ শাসন করে এরকম আর একটা সমীকরণ আবিষ্কৃত হবে। সে সমীকরণ হবে ডিরাক সমীকরণের মতোই একটা কিছু। তখন ইলেকট্রন ছাড়া আর একটামাত্র অনুমিত মৌলকণা জানা ছিল। সেটা প্রোটন। কিন্তু নিউট্রন (Neutron) এবং কেন্দ্রকীয় বল আবিষ্কারের ফলে সে আশাও ভেস্তে গেল। এখন আমরা জানি প্রোটন কিংবা নিউট্রন কোনওটাই মৌলকণা নয়। বরং তারা ক্ষুদ্রতর কণা দিয়ে গঠিত। সে যাই হোক, ইদানীং আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়েছি এবং সাবধানে বলব, এখন আশা করা যায় এই প্রবন্ধের পাঠকদের অনেকেই তাঁদের জীবদ্দশায় এই তত্ত্ব দেখতে পাবেন।

আমরা যদি পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব অর্জনও করি তাহলেও একমাত্র সরলতম অবস্থান সম্পর্কে ছাড়া বিস্তারিত কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। উদাহরণ: দৈনন্দিন জীবনে যার সংস্পর্শে আমরা আসি তার সবগুলিরই ভৌত শাসন বিধি এখন জানি। ডিরাক বলেছেন তাঁর সমীকরণ 'পদার্থবিদ্যার অধিকাংশের এবং রসায়ন শাস্ত্রের সবটারই ভিত্তি'। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র সরলতম তন্ত্র (system) সম্পর্কেই সমীকরণটির সমাধান করতে পেরেছি। সেটা হল হাইড্রোজেন পরমাণু। তাতে রয়েছে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন। একাধিক কেন্দ্রক রয়েছে এরকম জটিল অণুর কথা ছেড়ে দিলেও একাধিক ইলেকট্রন রয়েছে এরকম পরমাণুর ক্ষেত্রেও আমাদের ভরসা করতে হয় আসন্নতা এবং স্বজ্ঞাভিত্তিক (approximations and intuitive guesses) অনুমানের উপর। সেগুলিরও সত্যতা সন্দেহজনক। $১০^{২৩}$ কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যক কণিকাবিশিষ্ট স্থূলসত্বক তন্ত্রগুলির (macroscopic) জন্য আমাদের পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় এবং সমীকরণগুলির নির্ভুল সমাধানের ভান ত্যাগ করতে হয়। যদিও নীতিগতভাবে সমগ্র জীববিদ্যাকে শাসন করে (govern) এরকম সমীকরণ

আমরা জানি। তবুও আমরা মানবিক আচরণকে ফলিত গণিতের একটা শাখায় পরিণত করতে পারি না।

পদ্যাথবিদ্যার পূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ একটা তত্ত্বের অর্থ আমাদের কাছে কি হবে? আমাদের ভৌত বাস্তবতার প্রতিরূপ গঠনের চেষ্টার সাধারণত দুটি অংশ থাকে :

(১) এক কেতা স্থানীয় বিধি। নানা ভৌতরাশি সেগুলি মেনে চলে। এগুলির অবয়ব সাধারণত অবকল সমীকরণের (differential equation) বাগ্বিধিতে গঠিত হয়।

(২) সীমান্ত অবস্থার একাধিক কেতা। তারা একটা বিশেষ কালে মহাবিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বলে এবং বলে পরবর্তীকালে মহাবিশ্বের অবশিষ্ট অঞ্চল থেকে কি অভিক্রিয়া (effects) তার ভিতরে বিস্তারিত হয়।

অনেকের দাবি বিজ্ঞানের ভূমিকা এগুলির প্রথমটিতেই সীমাবদ্ধ এবং আমরা সম্পূর্ণ একটা স্থানীয় ভৌতবিধির কেতা (set) প্রাপ্ত হওয়ার পরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে। তাঁদের বিচারে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার ব্যাপারটা অধিবিদ্যা কিংবা ধর্মের অংশভুক্ত। একদিক থেকে এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনেকটা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে যাঁরা অতীত শতাব্দীগুলিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহ করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্রাকৃতিক সমস্ত পরিঘটনাই ঐশ্বরিক কর্ম এবং তা নিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত নয়। আমার ধারণা মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তত্ত্বের জন্য স্থানীয় ভৌত বিধিগুলির মতোই উপযুক্ত। যতদিন পর্যন্ত না আমরা 'পদার্থগুলি যেরকম আছে তারা সেইরকম, তার কারণ তারা পূর্বেও সেইরকম ছিল' – এই যুক্তি অতিক্রম করতে পারব ততদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটা তত্ত্ব আমরা পাব না।

প্রাথমিক অবস্থাগুলির অনন্যতার সঙ্গে স্থানীয় ভৌতবিধিগুলির যাদৃচ্ছিকতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদি অনেকগুলি বিন্যাসযোগ্য স্বেচ্ছস্থিরাঙ্কে (parameters)-র মতো ভর কিংবা যুগ্মনযোগ্য অচর (coupling constant) থাকে, যার খুশিমতো মূল্যাঙ্ক দেওয়া চলে, তাহলে তাকে পূর্ণতত্ত্ব বলা যাবে না। আসলে মনে হয় প্রাথমিক অবস্থা কিংবা তত্ত্বের স্বেচ্ছস্থিরাঙ্ক কোনওটাই যাদৃচ্ছিক নয়। বরং সেগুলি কোনওভাবে খুব সযত্নে নির্বাচিত করা হয় কিংবা খুঁজে বার করা হয়। উদাহরণ, যদি প্রোটন, নিউট্রনের ভর ইলেকট্রনের প্রায় দ্বিগুণ না হ'ত তাহলে যারা মৌল পদার্থ গঠন করে এবং রসায়নশাস্ত্র ও জীববিদ্যার ভিত্তি গঠন

করে সেই প্রায় দুইশত সুস্থিত নিউক্লিয়াইড (nucleide –নির্দিষ্ট গঠনের কেন্দ্রবিশিষ্ট পরমাণুবর্গ) আমরা পেতাম না। একই ভাবে, বলা যায় প্রোটনের মহাকর্ষীয় ভর যদি উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হ'ত তাহলে আমরা এমন কোনও তারকা পেতাম না যেখানে এই নিউক্লিয়াইডগুলি গঠিত হতে পারত এবং যদি মহাবিশ্বের প্রাথমিক প্রসারণ সামান্য কম কি বেশি হ'ত তাহলে ঐ ধরনের তারকাগুলি বিবর্তিত হওয়ার আগেই মহাবিশ্ব চুপসে যেত কিংবা এত দ্রুত প্রসারিত হ'ত যে, মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের দ্বারা তারকাগুলি কখনওই গঠিত হ'ত না।

সত্যই কিছু লোক এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে প্রাথমিক অবস্থা এবং স্বেচ্ছ-স্থিরাঙ্কগুলিকে (parameters) একটা নীতির স্তরে উন্নীত করেছেন। সেটি নরত্বীয় নীতি। এর অর্থ হতে পারে 'পদার্থগুলি যেমন আছে তেমন থাকার কারণ আমাদের অস্তিত্ব'। এই নীতির একটা রূপ হল– বহুসংখ্যক বিভিন্ন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের ভৌত স্বেচ্ছস্থিরাঙ্কগুলির (প্যারামিটারগুলির) এবং প্রাথমিক অবস্থার বিভিন্ন মূল্যাঙ্ক রয়েছে। এই সমস্ত মহাবিশ্বগুলির অধিকাংশেরই জটিল গঠনবিশিষ্ট বুদ্ধিমান জীব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নেই। শুধুমাত্র খুব ক্ষুদ্রসংখ্যক মহাবিশ্বে আমাদের মহাবিশ্বের মতো অবস্থা এবং স্বেচ্ছস্থিরাঙ্ক সম্ভব। বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ সেইসমস্ত মহাবিশ্বেই সম্ভব। আর সম্ভব তাদের প্রশ্ন করা– 'আমরা যে রকম পর্যবেক্ষণ করছি মহাবিশ্বটি কেন সেরকম হল?' উত্তরটি অবশ্য এই : অন্যরকম হলে এ প্রশ্ন করার মতো কেউ থাকত না।

বিভিন্ন ভৌত স্বেচ্ছস্থিরাঙ্কগুলির (parameters) মূল্যাঙ্কের ভিতরে যে উল্লেখযোগ্য সাংখ্যিক সম্পর্ক দেখা যায় তার একটা ব্যাখ্যা নরত্বীয় নীতি থেকে পাওয়া যায়। এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এর অন্য কোনও গভীরতর ব্যাখ্যা আছে—এরকম মনে হতে পারে। তাছাড়া মহাবিশ্বের সব অঞ্চলের কারণ এটা হতে পারে না। উদাহরণ : আমাদের অস্তিত্বের জন্য সৌর জগৎ নিশ্চয়ই পূর্বাহ্নেই প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন নিকটস্থ পূর্ব প্রজন্মের তারকাগুলি। সেই তারকাগুলিতে, কেন্দ্রকীয় সংশ্লেষণের সাহায্যে ভারী মৌল পদার্থগুলি গঠিত হতে পারে। হতে পারে–প্রয়োজন ছিল আমাদের পুরো ছায়াপথেরই। যে মিলিয়ন মিলিয়ন ১০০০০০০০০০০০০ কিংবা ঐ রকম সংখ্যক নীহারিকা (ছায়াপথ) পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে আমরা মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত দেখতে পাই, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্য কোনও নীহারিকারও (galaxy) অস্তিত্বের প্রয়োজন ছিল না। বৃহৎ মানে এই সমসত্বতার ফলে একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে,

মহাবিশ্বের গঠন নির্ধারণ করে যথেষ্ট সাধারণ জাতিরূপের (fairly typical) সর্পিল নীহারিকার বাইরের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলের একটা অতি সাধারণ তারকার কক্ষে ঘূর্ণায়মান একটা অপ্রধান গ্রহে অবস্থিত কতগুলি জটিল আণবিক গঠনের মতো প্রান্তিক (peripheral) একটা কিছু।

আমরা যদি নরত্বীয় নীতির দ্বারস্থ না হই তাহলে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা এবং ভৌত স্বেচ্ছস্থিরাঙ্কগুলির (physical parameters) ব্যাখ্যার জন্য এমন একটা তত্ত্ব চাই যা এগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সব ব্যাপার সম্পর্কে একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব একবারেই পাওয়া মুশকিল। অনেকে কিন্তু এ কারণেও চুপ করে থাকে না : প্রতি সপ্তাহে ডাকযোগে আমি দু'তিনটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব পাই। তার বদলে আমরা একাধিক আংশিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। সে তত্ত্বগুলি এমন কয়েকটি পরিস্থিতির বিবরণ দান করে যে পরিস্থিতিতে কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করা যায় কিংবা সহজ পদ্ধতিতে আসন্নতায় (approximation) আনা যায়। প্রথমে আমরা মহাবিশ্বের বাস্তব আধেয়কে (material content) দু'ভাগে ভাগ করি : 'পদার্থকণিকা'– যেমন, কার্ক (quark) , ইলেক্ট্রন, মুয়ন (muons) ইত্যাদি এবং 'অন্যোন্যক্রিয়া' (interactions)–যেমন, মহাকর্ষ এবং বিদ্যুৎচুম্বকত্ব। পদার্থকণিকাগুলির বিবরণ দান করা হয় অর্ধেক পূর্ণ সংখ্যার চক্রণের (half-integer spin) ক্ষেত্রের দ্বারা । এরা পাউলির অপবর্জন তত্ত্ব (Pauli exclusion principle)মেনে চলে। এই নীতি যে কোনও একই অবস্থায় একাধিক কণিকার অবস্থানে বাধা দেয়। এইজন্য আমরা এমন ঘন বস্তু (solid bodies) পেতে পারি যেগুলি চুপসে বিন্দুতে পরিণত হয় না কিংবা বিকিরিত হয়ে অসীম অভিমুখে যায় না। পদার্থ তত্ত্ব (matter principles -মূল উপাদান) দু'গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়: হ্যাড্রন (hadron) - এগুলি কার্ক দিয়ে গঠিত, অবশিষ্ট গঠিত লেপটন (lepton) দিয়ে।

অন্যোন্যক্রিয়াকে পরিঘটনাতত্ত্বের (phenomenologically) ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করা হয়। শক্তি অনুসারে তারা : শক্তিশালী নিউক্লীয় বলসমূহ–তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া হয় শুধুমাত্র হ্যাড্রনের (hadron) সঙ্গে। বিদ্যুৎচুম্বকত্ব - তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া হয় আধানযুক্ত হ্যাড্রনের সঙ্গে। দুর্বল নিউক্লীয় বলসমূহ–তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া হয় সমস্ত হ্যাড্রন আর লেপটনের সঙ্গে। মহাকর্ষের প্রতিক্রিয়া হয় সবারই সঙ্গে। অন্যোন্যক্রিয়ার প্রতিরূপ পূর্ণসংখ্যা চক্রণ ক্ষেত্র (integer-spin field) দিয়ে। এরা পাউলির অপবর্জন তত্ত্ব মেনে চলে না। এর অর্থ একই অবস্থায় তাদের অনেক কণিকা থাকতে পারে। বিদ্যুৎচুম্বকত্ব এবং

মহাকর্ষের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া দীর্ঘপাল্লা (long-range) বিশিষ্টও বটে। তার অর্থ বহু পদার্থকণিকা দিয়ে গঠিত ক্ষেত্রগুলি পরস্পরযুক্ত হয়ে এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে যেটা স্থূলসত্বক মানে (macroscopic) শনাক্ত করা সম্ভব। এই সমস্ত কারণে তাদের জন্য প্রথম তত্ত্ব গঠিত হয় : সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব, উনবিংশ শতাব্দীতে গঠিত ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচুম্বকীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি কিন্তু মূলত সুসঙ্গত ছিল না কারণ সম্পূর্ণ তত্ত্বটির গতিবেগ যদি সমরূপ হয় তাহলে নিউটনীয় তত্ত্ব ছিল নিশ্চর। আবার ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব একটা বিশেষ পছন্দসই গতিবেগের সংজ্ঞা দিয়েছে—আলোকের গতিবেগ। শেষে দেখা গেল এটি নিউটনীয় মহাকর্ষতত্ত্বই বটে, তবে সেটিকে ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বের নিশ্চর ধর্মের সঙ্গে সুসঙ্গত করার জন্য পরিবর্তিত করতে হয়েছে। আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ এই কৃতিত্ব অর্জন করে। এ তত্ত্ব গঠিত হয়, ১৯১৫ সালে।

মহাকর্ষ সম্পর্কে ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎগতীয় তত্ত্ব—এগুলিকে বলা হয় চিরায়ত তত্ত্ব অর্থাৎ তারা এমন রাশি নিয়ে জড়িত যারা অবিচ্ছিন্ন চর (continuously variable) এবং অন্তত নীতিগতভাবে তাদের যাদৃচ্ছিক নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব। এই তত্ত্বগুলি যখন পরমাণুর প্রতিরূপ গঠনের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা হল তখন কিন্তু একটা সমস্যার সৃষ্টি হল। ক্ষুদ্র একটা পরা আধানযুক্ত কেন্দ্রক আর তার চারপাশে অপরা আধানযুক্ত একটা ইলেকট্রনের মেঘ—এই নিয়ে পরমাণুগুলি গঠিত—এ তথ্য আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্বাভাবিক অনুমান ছিল, পৃথিবী যেমন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ইলেকট্রনগুলিও তেমনি কেন্দ্রককে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চিরায়ত তত্ত্বের পূর্বাভাস ছিল ইলেকট্রনগুলি বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করবে। এই তরঙ্গগুলি দূরে শক্তি বহন করে নিয়ে যাবে। ফলে ইলেকট্রনগুলি সর্পিলচক্র (spiral) গতিতে কেন্দ্রকে পতিত হবে এবং পরমাণুটি চুপসে যাবে।

এই সমস্যার সমাধান হয় কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে। এ আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার বৃহত্তম কৃতিত্ব। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি এই তত্ত্বের মূলগত স্বীকার্য। এই নীতির বক্তব্য : একটা কণিকার অবস্থান এবং ভরবেগের (momentum) মতো কতগুলি সংখ্যার জোড় যুগপৎ যাদৃচ্ছিক নির্ভুলভাবে মাপা যায় না।

পরমাণুর ক্ষেত্রে এর অর্থ ছিল শক্তির নিম্নতম স্তরে ইলেকট্রন কেন্দ্রকের ভিতরে স্থিতিলাভ করতে পারে না কারণ তাহলে এর অবস্থান নির্ভুলভাবে সংজ্ঞিত হবে (কেন্দ্রকের ভিতরে) এবং এর বেগও নির্ভুলভাবে সংজ্ঞিত হবে (সেটি হবে শূন্য)। তার বদলে অবস্থান এবং বেগ দুটিকেই কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা বণ্টনের (probability distribution) সাহায্যে কেন্দ্রকের চারপাশে প্রলিপ্ত (smeared) হতে হবে। এই অবস্থায় ইলেকট্রনটি বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গরূপে শক্তি বিকিরণ করতে পারবে না। তার কারণ ইলেকট্রনটির নিম্নতর শক্তিস্তরে যাওয়ার মতো কোনও শক্তিস্তর থাকবে না।

1920 এবং 1930 সালে কণাবাদী বলবিদ্যা অণু এবং পরমাণুর মতো তন্ত্রে খুব সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এগুলির শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক মাত্রায় (degree) স্বাধীনতা রয়েছে। অসুবিধার সৃষ্টি হল যখন লোকে এই তত্ত্ব বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করল। এই ক্ষেত্রগুলির স্বাধীনতার মাত্রার (degree) সংখ্যা অসীম–মোটামুটি প্রতি মাত্রা (degree) স্থান-কালে দুটি করে। স্বাধীনতার এই মাত্রাগুলিকে স্পন্দক (oscillators) বলে ভাবা যেতে পারে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব অবস্থান এবং ভরবেগ (momentum) রয়েছে। স্পন্দকগুলির স্থিতি হতে পারে না কারণ তাহলে তাদের নির্ভুলভাবে সংজ্ঞিত অবস্থান এবং ভরবেগ থাকবে। তার বদলে প্রতিটি স্পন্দকের থাকে কিছু সর্বনিম্ন পরিমাণ তথাকথিত অনপেক্ষ শূন্যাঙ্কীয় হ্রাসবৃদ্ধি (zero-point fluctuation) এবং একটা অশূন্যাঙ্ক শক্তি (a non-zero energy)। সমস্ত অসীম সংখ্যক মাত্রার স্বাধীনতার শক্তি ইলেকট্রনটির আপাতদৃষ্ট ভর এবং আধানকে অসীমে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯৪০ সালে পুনঃপরিমিতি (renormalization) নামে একটা পদ্ধতি তৈরি হয়। এ পদ্ধতিটি ছিল – কিছু অসীম রাশিকে যাদৃচ্ছিকভাবে বিয়োগ করে সসীম অবশিষ্ট রাখা। তড়িৎগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল এই রকম দুটি অসীম বিয়োগ – একটা ইলেকট্রনের আধানের জন্য। এই পুনঃপরিমিতি পদ্ধতি কখনওই কল্পন কিংবা গণিতের খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে কাজ ভালই হয়েছে। এর বৃহত্তম সাফল্য ছিল পারমাণবিক হাইড্রোজেনের বর্ণালীর কয়েকটি রেখার সামান্য অপসরণ –ল্যাম্ব শিফ্‌ট (Lamb shift) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। তবে একটা সম্পূর্ণ তত্ত্ব গঠনের চেষ্টার দিক থেকে এ পদ্ধতি খুব সন্তোষজনক হয়নি, তার কারণ অসীম বিয়োগ করার পর অবশিষ্টের সসীমের মূল্যাঙ্ক সম্পর্কে

কোনও ভবিষ্যদ্বাণী এ পদ্ধতি করতে পারেনি। সুতরাং, ইলেকট্রনের ভর এবং আধান ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের আবার ঐ নরত্বীয় নীতির উপরই নির্ভর করতে হবে।

1950 এবং 1960–এর দশকে সাধারণত বিশ্বাস করা হ'ত দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল এবং শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বলের (weak and strong nuclear forces) পুনঃপরিমিতিকরণ (renormalization) সম্ভব নয়, কারণ তাদের সসীম করার জন্য প্রয়োজন হবে অসীম সংখ্যক অসীম বিয়োগ করা। অসীম সংখ্যক সসীম অবশিষ্ট থাকবে–যা তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। সেরকম তত্ত্বের কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকবে না, তার কারণ, অসীম সংখ্যক স্বেচ্ছস্থিরাঙ্ক (parameter) মাপা সম্ভব নয়। তবে 1971 সালে গেরার্ড'টি হুফ্‌ট (Gerard't Hooft) দেখালেন আবদুস্ সালাম (Abdus Salam) এবং স্টিভেন উইনবার্গ (Steven Weinberg)-এর পূর্বপ্রস্তাবিত তড়িৎচুম্বকীয় এবং দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়ার সংযুক্ত প্রতিরূপের পুনঃপরিমিতিকরণ (renormalization) শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক অসীম বিয়োগের দ্বারা সম্ভব। সালাম-উইনবার্গ তত্ত্বে ফোটন অর্থাৎ যে চক্রণ-১ কণিকা তড়িৎচুম্বকীয় পারস্পরিক ক্রিয়া বহন করে, তার সঙ্গে W^+, W^- এবং z^0 নামক আর তিনটি চক্রণ-1 অংশগ্রহণ করে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে অত্যন্ত উচ্চশক্তিতে এই চারটি কণিকার আচরণ একই হবে। ফোটন বিরামভর শূন্য অথচ W^+, W^- এবং z^0-এর ভর অত্যন্ত বেশি – এই তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য স্বতঃবৃত্ত প্রতিসমত্ব ভঙ্গ হওয়া (spontaneous symmetry breaking) নামক নিম্নশক্তিস্তরের একটা পরিঘটনা ব্যাবহার করা হয়। এই তত্ত্বের নিম্নশক্তিস্তরের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণফলের বিলক্ষণ মিল রয়েছে। এর ফলে ১৯৭৯ সালে সালাম-উইনবার্গ এবং শেলডন গ্ল্যাশোকে (Sheldon Glashow) সুইডিশ এ্যাকাডেমি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দান করেন। শেলডন গ্ল্যাশো একাধিক একইরকম ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব গঠন করেছিলেন। তবে গ্ল্যাশো নিজেই মন্তব্য করেছেন – নোবেল কমিটি নিজেরাই একটা জুয়া খেলেছিলেন। তার কারণ যে ভুক্তিতে (regime) ফোটনবাহিত তড়িৎচুম্বকীয় বলগুচ্ছ এবং W^+, W^- এবং Z^0 বাহিত দুর্বল বলগুচ্ছ সত্যিই ঐক্যবদ্ধ হয় সেই ভুক্তিতে তত্ত্বটি পরীক্ষা করার মতো যথেষ্ট উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকাত্বরণ যন্ত্র আমাদের নেই। যথেষ্ট শক্তিশালী ত্বরণযন্ত্র কয়েক বছরেই প্রস্তুত হবে। অধিকাংশ

পদার্থবিদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যন্ত্রে সালাম- উইনবার্গ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হবে।*

সালাম-উইনবার্গ তত্ত্বের সাফল্যের ফলে শুরু হয় সবল পারস্পরিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে একইরকম একটা পুনঃপরিমিতিযোগ্য (renormalizable) তত্ত্ব অনুসন্ধান। যথেষ্ট আগেই বোঝা গিয়েছিল প্রোটন এবং পি-মেসনের (Pi-meson) মতো অন্য হ্যাড্রনগুলি (hadron) সত্যিকারের মৌলকণা হতে পারে না। এরা নিশ্চয়ই কার্ক (quark) নামক অন্য কণিকাগুলির বদ্ধ অবস্থা। এদের একটা অদ্ভুত ধর্ম আছে। যদিও এরা হ্যাড্রনের ভিতরে যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলাচল করে তবুও মনে হয় স্বকীয়ভাবে একটা মাত্র কার্ক পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সবসময়ই তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তিনটি থাকে। (প্রোটন কিংবা নিউট্রনের মতো) কিংবা তারা থাকে কার্ক এবং এ্যান্টিকার্কের (বিপরীত কার্ক) জোড়ে (Pi-meson–পি মেসন)। এটা ব্যাখ্যা করার জন্য কার্কদের উপর একটা ধর্ম আরোপ করা হয়েছে– তার নাম রঙ (colour)। দৃঢ়ভাবে বলা উচিত এর সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক রঙের অনুভূতির কোনও সম্পর্ক নেই। কার্করা আকারে এত ছোট যে, দৃশ্যমান আলোকে সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। এটা সুবিধাজনক একটা নাম মাত্র। চিন্তনটি এইরকম : কার্কের তিনটি রঙ হয়, লাল, সবুজ আর নীল। কিন্তু হ্যাড্রনের মতো যে কোনও বিচ্ছিন্ন বদ্ধ অবস্থায় তাদের কোনও রঙ থাকে না— হয় প্রোটনের মতো লাল, সবুজ এবং নীলের সংযুক্তি নয়তো পি-মেসনের মতো লাল আর বিপরীত লাল, সবুজ আর বিপরীত সবুজ এবং নীল আর বিপরীত নীলের মিশ্রণ।

অনুমান করা হয় কার্কগুলির ভিতর শক্তিশালী পারস্পরিক ক্রিয়া বহন করে গ্লুয়ন (gluon) নামক চক্রন -1 কণিকা। অনেকটা যারা দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া বহন করে তাদের মতো। গ্লুয়নেরাও রঙ বহন করে। তারা এবং কার্কেরা পুনঃপরিমিতিযোগ্য (renormalizable) তত্ত্ব মেনে চলে। এ তত্ত্বের নাম কোয়াণ্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স্ (quantum chromodynamics) কিংবা সংক্ষেপে QCD। পুনঃপরিমিতি পদ্ধতির একটা ফল, তত্ত্বের কার্যকর যুগ্মন ধ্রুবক (effective coupling constant) নির্ভর করে–যে শক্তিতে মাপা হচ্ছে তার উপর এবং অতি উচ্চশক্তিতে এটি হ্রাস পেয়ে শূন্যে পরিণত হয়। এই পরিঘটনার

---

* আসলে ১৯৮৩ সালে জেনেভার CERN ল্যাবরেটরীতে W এবং Z কণিকা দেখা গিয়েছে। যে দল এই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের নেতা ছিলেন কার্লো রুবিয়া (Curlo Rubbia) এবং সাইমন ভ্যান ডার মীর (Siomon Van dar Meere)। ১৯৮৪ সালে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। একজন নোবেল পুরস্কার পেলেন না–তাঁর নাম গেরার্ড টি. হুফ্ট।

নাম অনন্তস্পর্শী স্বাধীনতা (asymptotic freedom)। এর অর্থ হল হ্যাড্রনের ভিতরকার কার্কগুলির আচরণ প্রায় উচ্চশক্তির সংঘর্ষে স্বাধীন কণিকাগুলির মতো। ফলে তাদের বিক্ষোভগুলি (perturbations) বিক্ষোভ তত্ত্বের সাহায্যে বিচার করা যায় (treated)। বিক্ষোভ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সঙ্গে পর্যবেক্ষণফলের গুণগত ঐক্য রয়েছে কিন্তু এখনও কেউ দাবী করতে পারেন না যে তত্ত্বটির সত্যতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। স্বল্পশক্তিতে কার্যকর যুগ্মন ধ্রুবক অতি বৃহৎ হয় এবং বিক্ষোভ তত্ত্ব ভেঙে পড়ে। আশা করা যায় এই 'অবলোহিতদাসত্ব (infrared slavery)' ব্যাখ্যা করবে কেন কার্করা সব সময় রঙহীন বদ্ধ অবস্থায় বদ্ধ থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারটা কেউই এমনভাবে দেখাতে পারেননি যা সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য।

শক্তিশালী পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে একটা পুনঃপরিমিতিযোগ্য তত্ত্ব এবং দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া এবং বিদ্যুৎচৌম্বক পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে আর একটা তত্ত্ব পাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই দুটি তত্ত্বকে সংযুক্ত করে এরকম একটা তত্ত্ব অন্বেষণ করা হয়েছে। একটু অত্যুক্তি করে এই জাতীয় তত্ত্বগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুচ্ছ (grand unified theories সংক্ষেপে GUTs)'। এই নামে একটু বোঝার ভুল হতে পারে কারণ তত্ত্বগুলি এমন কিছু মহান নয়, সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধও নয় এবং তারা পূর্ণ তত্ত্বও নয়। কারণ তাদের কতকগুলি অনির্ধারিত পুনঃপরিমিতি প্যারামিটার (স্বেচ্ছস্থিরাঙ্ক) রয়েছে, যেমন একাধিক যুগ্মন ধ্রুবক এবং ভর। তবুও সেগুলিকে একটা পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অভিমুখে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা চলে। মূলগত কল্পন (basic idea) হল শক্তিশালী পারস্পরিক ক্রিয়াগুলির কার্যকর যুগ্মন ধ্রুবকগুলি স্বল্পশক্তিতে বৃহৎ থাকে এবং শক্তি বৃদ্ধি পেলে ক্রমশ হ্রাস পায়। তার কারণ অনন্তস্পর্শী স্বাধীনতা (asymptotic freedom)। অন্যদিকে সালাম-উইনবার্গ তত্ত্বের কার্যকর যুগ্মন ধ্রুবক (effective coupling constant) স্বল্প শক্তিতে ক্ষুদ্র এবং উচ্চ শক্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় কারণ এই তত্ত্বের অনন্তস্পর্শী স্বাধীনতা নেই (not asymptotically free)। কেউ যদি যুগ্মন ধ্রুবকগুলির স্বল্প শক্তিতে বৃদ্ধির হার এবং হ্রাসের হার এক্সট্রাপোলেট (extrapolates)* করেন তাহলে দেখা যায় প্রায় $১০^{১৫}$ GeV শক্তিতে দুটি যুগ্মন ধ্রুবক সমান হয়। GeV - এর অর্থ এক বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা

---

* Extrapolate – জ্ঞাত তথ্যাদির বিচার দ্বারা জ্ঞাত তথ্য নিরূপণ করা।

যায় তাহলে যে শক্তি মুক্ত হবে এই শক্তি তার সমান। এর সঙ্গে যদি জ্বালানোর মতো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তুলনা করা যায় তাহলে পরমাণু প্রতি সেটা হয় এক ইলেকট্রন ভোল্টের মতো। তত্ত্বগুলির প্রস্তাব : শক্তি এর বেশি হলে শক্তিশালী পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, দুর্বল এবং তড়িৎচুম্বক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় কিন্তু নিম্নতর শক্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভঙ্গ হয়।

$১০^{১৫}$ GeV যে কোনও ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি। এই প্রজন্মের কণিকা ত্বরণ যন্ত্রগুলি প্রায় ১০ GeV ভরকেন্দ্রিক (center-of-mass) শক্তি উৎপন্ন করতে পারে এবং পরের প্রজন্মগুলি উৎপন্ন করবে ১০০ GeV-এর কাছাকাছি শক্তি। সালাম-উইনবার্গ তত্ত্ব অনুসারে এই শক্তি, শক্তির যে পাল্লায় তড়িৎচুম্বকীয় বলগুলির দুর্বল বলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গবেষণা করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যে বিরাট উচ্চশক্তিতে দুর্বল এবং তড়িৎচুম্বকীয় পারস্পরিক ক্রিয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শক্তিশালী পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে, ততটা শক্তি নয়। সে যাই হোক, গবেষণা করে পরীক্ষাযোগ্য মহান ঐক্যবদ্ধ শক্তিগুলির স্বল্পশক্তি ভবিষ্যদ্বাণীও থাকতে পারে। উদাহরণ : তত্ত্বগুলির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রোটনগুলির সম্পূর্ণ সুস্থিত (completely stable) হওয়ার কথা নয়। তাদের জীবনকাল $১০^{৩১}$ বছর – তারপর তাদের অবক্ষয় হওয়ার কথা। জীবনকালের আধুনিক পরীক্ষামূলক নিম্নতর সীমা $১০^{৩০}$ বৎসর এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীর উন্নতি করা সম্ভব।

আর একটা পরীক্ষাযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী হল–মহাবিশ্বে ব্যারিয়ন (baryon) এবং ফোটনের (photon) অনুপাত বিষয়ে। বস্তুকণা এবং বিপরীত বস্তুকণা সাপেক্ষ পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি অভিন্ন বলে মনে হয়। আরও নির্ভুলভাবে বলা যায় – যদি কণিকার স্থলে বিপরীত কণিকা প্রতিস্থাপন করা যায়, দক্ষিণাবর্তীর (right-handed) স্থলে বামাবর্তী (left-handed) প্রতিস্থাপন করা যায় এবং যদি সমস্ত কণিকার বেগ বিপরীতমুখী করা যায় তাহলেও পদার্থবিদ্যার বিধি অভিন্ন থাকে। একে বলা হয় C P T উপপাদ্য এবং যে মূলগত অনুমান যে কোনও যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বের ক্ষেত্রে সত্য এ উপপাদ্য তারই ফল। সমগ্র বিশ্ব, এমনকি সমগ্র সৌরজগৎ প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত অথচ কোনও বিপরীত প্রোটন কিংবা বিপরীত নিউট্রন নেই। আসলে কণিকা এবং বিপরীত কণিকার ভিতরে এইরকম সমতার অভাব পূর্বাহ্নে গৃহীত অস্তিত্বের আরও একটা শর্ত। কারণ সৌরজগৎ যদি সমসংখ্যক কণিকা এবং বিপরীত কণিকার মিশ্রণ দিয়ে তৈরি হ'ত তাহলে তারা পরস্পরকে বিনষ্ট করত এবং অবশিষ্ট থাকত শুধুমাত্র বিকিরণ।

বিনাশ পরবর্তী বিকিরণের অভাব পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি আমাদের ছায়াপথ বিপরীত কণিকা দিয়ে গঠিত নয়, গঠিত কণিকা দিয়ে। অন্য ছায়াপথগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আমাদের নেই, কিন্তু মনে হয় তাদের কণিকা দিয়ে গঠিত হওয়ারই সম্ভাবনা এবং সমগ্র মহাবিশ্বে বিপরীত কণিকার চাইতে কণিকার আধিক্য রয়েছে, প্রতি বিপরীত কণিকা পিছু রয়েছে ১০^{৮} কণিকা। এর কারণ আবিষ্কারের জন্য নরত্বীয় নীতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলি এই সমতার অভাবের একটা সত্যকারের সম্ভাব্য কারণ দেখাতে পারে। যদিও মনে হয় সমস্ত পারস্পরিক ক্রিয়াই C (কণিকার স্থলে বিপরীতমুখী গতি) P (দক্ষিণাবর্তীকে বামাবর্তীতে পরিণত করা) এবং T (সময়ের অভিমুখকে বিপরীতমুখী করা)- এর সমন্বয়ে নিশ্চর মনে হয় তবুও এমন কিছু পারস্পরিক ক্রিয়া আছে যেগুলি শুধুমাত্র T-এর প্রভাবে নিশ্চর নয়। আদিম মহাবিশ্বে যখন প্রসারণের দরুন লক্ষণীয় কালের তীর ছিল তখন এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াগুলি বিপরীত কণিকার চাইতে অনেক বেশি কণিকা উৎপন্ন করতে পারত। তবে যে সংখ্যা তাঁরা বলেন সেগুলি খুবই বেশি প্রতিরূপ নির্ভর (model dependent)। সেইজন্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মতৈক্য মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলির প্রমাণ হওয়া মুশকিল।

এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করা হয়েছে প্রথম তিন শ্রেণীর ভৌত পারস্পরিক ক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য : দুর্বল এবং সবল কেন্দ্রকীয় বল এবং বিদ্যুৎচৌম্বকত্ব। চতুর্থ অর্থাৎ শেষটির নাম মহাকর্ষ। সেটাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে – এর একটা যুক্তি হল মহাকর্ষ এত দুর্বল যে কশাবাদী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া বৃহৎ হবে শুধুমাত্র সেই কণিকাশক্তিতে যে শক্তি কণিকা ত্বরণ যন্ত্রগুলির ক্ষমতার চাইতে অনেক অনেক বেশি। আর একটা যুক্তি : মহাকর্ষকে পুনঃপরিমিতিযোগ্য মনে হয় না। মনে হয় একটা সসীম উত্তর পাওয়ার জন্য অসীম সংখ্যক অসীম বিয়োগ করতে হতে পারে – তার সঙ্গে থাকবে অনুরূপ অসীম সংখ্যক অনির্ধারিত সসীম অবশিষ্ট। তবুও পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব পেতে হলে মহাকর্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। তাছাড়া চিরায়ত তত্ত্বে ব্যাপক অপেক্ষবাদের পূর্বাভাস অনুসারে একাধিক স্থান-কাল অনন্যতা থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হবে অসীম শক্তিশালী, এই অনন্যতাগুলি থাকবে অতীতে। অতীতে মহাবিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণের শুরুতে (বৃহৎ বিস্ফোরণ) এবং ভবিষ্যতে তারকাগুলির এবং হয়ত সমগ্র মহাবিশ্বেরই মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনে চুপসে যাওয়ার সময় এই অনন্যতাগুলির আবির্ভাব হয়। এই অনন্যতাগুলি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় নির্দেশ করে

চিরায়ত তত্ত্বই ভেঙে পড়বে। তবে যতদিন পর্যন্ত না মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এমন শক্তিশালী হয় যে কোয়াণ্টাম মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে ওঠে ততদিন পর্যন্ত চিরায়ত তত্ত্বের ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। সুতরাং আমরা যদি আদিম মহাবিশ্বের বিররণ দিতে চাই এবং শুধুমাত্র নরত্বীয় নীতির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমরা আদিম অবস্থার অন্য কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাই তাহলে মহাকর্ষের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়।

চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কালের একটা আরম্ভ এবং সম্ভাব্য একটা শেষ কি সত্যই আছে? কিংবা বৃহৎ বিস্ফোরণ এবং বৃহৎ সঙ্কোচনের অনন্যতাগুলি কি কোয়াণ্টাম অভিক্রিয়া দ্বারা কোনওভাবে প্রলিপ্ত হয় (smeared out)? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য উপরে উল্লিখিত তত্ত্বটি প্রয়োজন। এ প্রশ্নের সুসংজ্ঞিত অর্থ পাওয়া কঠিন, কারণ স্থান ও কালের গঠনও অনিশ্চয়তা নীতির আওতায় পড়ে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা অনন্যতাগুলির অস্তিত্ব এখনও বোধহয় রয়েছে তবে বিশেষ একটা গাণিতিক অর্থে সেগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়। চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল সম্পর্কিত যে কোনও ব্যক্তিনিষ্ঠ কল্পন কিংবা মাপন ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যাবে।

মহাকর্ষের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার এবং তার সঙ্গে অন্য তিনটি শ্রেণীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? মনে হয় সবচাইতে বেশি আশা করা যায় ব্যাপক অপেক্ষবাদের একটা সম্প্রসারণের উপর, তার নাম –অতি মহাকর্ষ (supergravity)। এই তত্ত্বে গ্র্যাভিটন (graviton) নামে যে চক্রণ-২ কণিকা মহাকর্ষীয় পারস্পরিক ক্রিয়া বহন করে তাদের তথাকথিত অতি প্রতিসম রূপান্তরের (super symmetry transformation) মাধ্যমে সম্পর্ক রয়েছে অন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রতর চক্রণবিশিষ্ট কণিকার। এইরকম তত্ত্বের একটা বিরাট গুণ হল যে, 'পদার্থের' প্রতিনিধি এক অর্ধ পূর্ণসংখ্যা চক্রণ (one-half-integer spin) কণিকা এবং যে 'পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার' প্রতিনিধি পূর্ণসংখ্যা চক্রণ (integer-spin particles) কণিকা এই দুই-এর ভিতরকার দ্বি-বিভাজন (dichotomy) দূর করে এইরকম তত্ত্ব। এ তত্ত্বের আরও একটা বিরাট সুবিধা হল কোয়াণ্টাম তত্ত্বের বহু বাতিল অসীমের অনেকগুলিই পরস্পরকে বাতিল করে দেবে। সবগুলি বাতিল হয়ে এমন একটা তত্ত্ব সৃষ্টি হবে কিনা যাতে কোনও অসীম বিয়োগ নেই–সেটা এখনও জানা নেই। আশা করা যায় সেরকম হবে। কারণ দেখানো যেতে পারে মহাকর্ষ যে সমস্ত তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হয় সীমিত (finite) নয়ত তারা পুনঃপরিমিতিযোগ্য (renormalizable) নয়, কারণ

কেউ যদি কোনও অসীম বিয়োগ করতে যান তাহলে তাঁদের করতে হবে অসীম সংখ্যক অসীম বিয়োগ (infinite number of them) এবং তাতে থাকবে অনুরূপ অসীম সংখ্যক অনির্ধারিত অবশিষ্ট। অর্থাৎ অতি মহাকর্ষের সমস্ত অসীম যদি পরস্পরকে বাতিল করে তাহলে আমরা এমন একটা তত্ত্ব পেতে পারি সেটা শুধুমাত্র পদার্থকণিকা এবং পারস্পরিক ক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করবে তাই নয়, তারা এই অর্থে পূর্ণ যে তাদের কোনও অনির্ধারিত, পুনঃপরিমিত প্যারামিটার (স্থিতিমান স্বেচ্ছস্থিরাঙ্ক) থাকবে না।

যদিও উপযুক্ত কোয়াণ্টাম মহাকর্ষীয় তত্ত্ব এখনও আমাদের নেই, এর সঙ্গে অন্যান্য ভৌত পারস্পরিক ক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে, এমন তত্ত্ব তো নেইই তবে এ জাতীয় তত্ত্বের অবয়ব কিরকম হবে তার খানিকটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। তাদের একটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে : মহাকর্ষ স্থান-কালের নৈমিত্তিক গঠন প্রভাবিত করে (causal structure) এই তথ্যের। অর্থাৎ কোন ঘটনাগুলি নৈমিত্তিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা নির্ধারণ করে মহাকর্ষ। চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদে এর একটা উদাহরণ কৃষ্ণগহ্বর। এটা স্থান-কালের এমন একটা অঞ্চল যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী যে আলোক কিংবা অন্য কোনও সঙ্কেতকে পিছু টেনে ঐ অঞ্চলের ভিতরেই রাখা হয় – তারা বহির্জগতে নির্গত হতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের নিকটের তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফলে কণিকা এবং বিপরীত কণিকার জোড় সৃষ্টি হয়। তাদের একটা পতিত হয় কৃষ্ণগহ্বরে আর অন্যটি নির্গত হয় অসীমে। যে কণিকাটি নির্গত হয়, মনে হয় সেটি কৃষ্ণগহ্বর থেকেই নির্গত হয়েছে। কৃষ্ণগহ্বর থেকে দূরে একজন পর্যবেক্ষণকারী শুধুমাত্র বাইরে নির্গত হওয়া কণিকাগুলিই মাপতে পারে। যে কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয় সেগুলির সঙ্গে সে বাইরে নির্গত হওয়া কণিকাগুলির সম্পর্ক স্থির করতে পারে না। কারণ সেগুলিকে সে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। এর অর্থ হল বাইরে নির্গত হওয়া কণিকাগুলির একটু বেশি পরিমাণ অনিয়ম (randomness) রয়েছে অর্থাৎ অনিশ্চয়তা নীতির সঙ্গে যে পরিমাণ ভবিষ্যদ্বাণী করার অসুবিধা জড়িত থাকে এক্ষেত্রে তার চাইতে বেশি অসুবিধা জড়িত রয়েছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা নীতির নিহিতার্থ হল – একটা কণিকার হয় অবস্থান নয়ত গতিবেগ (velocity) সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব কিংবা সম্ভব অবস্থান এবং গতিবেগের একটা সমন্বয় (combination) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা। অর্থাৎ মোটামুটি বলা যায়, নির্দিষ্ট নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে যায়, তবে কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত কণিকাগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু

কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে কি হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করা যায় না সেইজন্য নির্গত কণিকাগুলির অবস্থান কিংবা গতিবেগ কোনওটা সম্পর্কেই নির্দিষ্ট নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সম্ভব সম্ভাব্যতা প্রকাশ করা – কণিকাগুলির নির্গত হওয়ার বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে।

সেইজন্য মনে হয় আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও হয়ত শুধুমাত্র পরিসাংখ্যিক ভবিষ্যদ্বাণীই করতে পারব। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি সেই রকম অদ্বিতীয় একটা মহাবিশ্বই রয়েছে এই মতও আমাদের ত্যাগ করতে হবে। তার বদলে আমার এমন একটা চিত্র গ্রহণ করতে হবে যে চিত্রে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার মহাবিশ্বের একটা সমগ্রতা (ensemble) রয়েছে আর তার সঙ্গে রয়েছে কিছু সম্ভাব্যতা বণ্টন (probability distribution)। এ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে মহাবিশ্ব বৃহৎ বিস্ফোরণে প্রায় নিখুঁত তাপীয় সাম্য (thermal equilibrium), তার কারণ তাপীয় সাম্য হবে বৃহত্তম সংখ্যক আণুবীক্ষণিক গঠনবিন্যাসের এবং বৃহত্তম সম্ভাব্যতার অনুরূপ। ভোলতেয়ারের দার্শনিক পেনগ্লসের (Pengloss) কথা সহজতর বাগ্বিধিতে প্রকাশ করলে বলা যায় 'সম্ভাব্য সর্বপ্রকার বিশ্বের সবচাইতে সম্ভাব্য জগতে আমরা বাস করি।'

অদূর ভবিষ্যতে আমাদের একটা পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা কতটা? যতবারই আমরা পর্যবেক্ষণকে ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের মান এবং উচ্চতর শক্তিতে প্রসারিত করেছি ততবারই আমরা গঠনের নতুন স্তর আবিষ্কার করেছি। এই শতাব্দীর প্রথমে ব্রাউনীয় গতির সঙ্গে শক্তিকণিকার ৩×১০^{২} eV ইলেকট্রন ভোল্ট-এর জাতিরূপ আবিষ্কারের ফলে দেখা যায় -- পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত – পদার্থ অবিচ্ছিন্ন নয়। এর কিছুদিন পরই আবিষ্কৃত হল : এই পরমাণুগুলিকে অবিভাজনযোগ্য অনুমান করা হলেও এরা কেন্দ্রকের চারপাশে ঘূর্ণায়মান কিছু ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। এদের শক্তির পরিমাণ কয়েক ইলেকট্রন ভোল্ট। এবার কেন্দ্রকের পালা। দেখা গেল কেন্দ্রকগুলি তথাকথিত মৌলকণা দিয়ে গঠিত। এগুলি প্রোটন আর নিউট্রন। এগুলি নিউক্লীয় বন্ধন দিয়ে যুক্ত। তাদের শক্তির পরিমাণ $১০^{৬}$ eV। এই কাহিনীর নবতম অংশ হল : আমরা আবিষ্কার করেছি প্রোটন আর ইলেকট্রন–কার্ক দিয়ে তৈরি। তারা পরস্পরের সঙ্গে যে বন্ধনে যুক্ত তার শক্তির পরিমাণ $১০^{২}$ eV-এর মতো। আমরা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় কতদূর এগিয়েছি সে সম্পর্কে এ উক্তি সপ্রশংস : এখন আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বিশাল যন্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী আমরা করতে পারি না।

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় – হয়ত উচ্চতর এবং অধিক উচ্চতর শক্তিতে অসীম সংখ্যক গঠনস্তরের ক্রম রয়েছে। তথাকথিত গ্যাং অফ ফোরের (Gang of four) অধীন চীনে বাক্সের ভিতরে বাক্সের মতো অসীম পশ্চাৎমুখীতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সরকারী মতবাদ। তবে মনে হয় মহাকর্ষ একটা সীমানা যোগাতে পারে, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র 10^{-33} এর মতো অত্যন্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যের মানে কিংবা ১০^{১৯}cV-এর মতো অত্যন্ত উচ্চশক্তির মানে। দৈর্ঘ্য এর চাইতে অল্প হলে আশা করা যায় স্থান-কাল একটা মসৃণ সাংতত্যকের (continuum) মতো আচরণ করা থেকে বিরত হবে এবং একটা সফেন (foam like) গঠনের মতো আকার ধারণ করবে। তার কারণ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোয়াণ্টাম হ্রাসবৃদ্ধি।

আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সীমা প্রায় ১০^{১৩} cV এবং মহাকর্ষীয় সীমা ১০^{১৯}cV। এর মধ্যবর্তী বিরাট অঞ্চল অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলি যা করে সেরকম যদি মনে করা হয় যে এই বিরাট অন্তর্বর্তী স্থান-কালে গঠনের মোটে একটি কি দুটি স্তর আছে তাহলে সেটি অর্বাচীনোচিত (naive) মনে হতে পারে। তবে আমাদেরও যুক্তি আছে। এই মুহূর্তে অন্তত মনে হয় মহাকর্ষকে অন্য ভৌত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, শুধুমাত্র কোনও অতিমহাকর্ষীয় তত্ত্বে। এই ধরনের তত্ত্বের সংখ্যা সীমিত। বিশেষ করে এরকম একটা বৃহত্তম তত্ত্ব আছে – সেটি তথাকথিত N= ৮ প্রসারিত অতি মহাকর্ষ (N=8 extended supergravity)। এতে রয়েছে একটা গ্র্যাভিটন, আটটি চক্রণ ৩/২ কণিকা – এগুলির নাম গ্র্যাভিটোনোস (gravitonos), আঠাশটি চক্রণ ১ কণিকা, ছাপ্পান্নটি চক্রণ ১/২ কণিকা এবং সত্তরটি চক্রণ ০ কণিকা। এই সংখ্যাগুলি বৃহৎ কিন্তু সবল এবং দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়ায় আমরা যে সমস্ত কণিকা পর্যবেক্ষণ করছি বলে মনে হয় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার মতো বৃহৎ নয়। উদাহরণ, N=৮ তত্ত্বে রয়েছে আঠাশটি চক্রণ ১ কণিকা। এরা সবল পারস্পরিক ক্রিয়া বহনকারী গ্লুয়ন (Gluon) ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট এবং দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া যারা বহন করে সেই চারটি কণিকার দুটিকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু বাকী দুটিকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাস করতে হয় গ্লুয়ন কিংবা কার্কের মতো পর্যবেক্ষণ করা অনেক কণিকা – হয়ত বা অধিকাংশ কণিকাই আসলে মৌল নয় – যদিও এই মুহূর্তে তাদের মৌলকণাই মনে হয় , এগুলি হয়ত N= ৮ মৌলকণাগুলির বদ্ধ অবস্থা (bound state)। নিকট ভবিষ্যতে এই যুগ্ম গঠন (composite structure) নিয়ে গবেষণা করার মতো শক্তিশালী ত্বরণ যন্ত্র

পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবণতার ভিত্তিতে অভিক্ষেপ (projection) করা যায়, তাহলে বলা যায় সে যন্ত্র আমরা কোনওদিনই পাব না। তবুও এই বদ্ধ অবস্থাগুলি যে N=৮ তত্ত্বের মতো একটা সুসংজ্ঞিত তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত, সেই তথ্য আমাদের এমন কতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দেবে যেগুলি এমন শক্তিতে পরীক্ষা করা যায় যে শক্তি এখন কিংবা নিকট ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব। পরিস্থিতি অনেকটা সালাম-উইনবার্গ তত্ত্বে ক্ষেত্রের মতো হতে পারে। এ তত্ত্ব তড়িৎচুম্বকত্ব এবং দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই তত্ত্বের ক্ষুদ্রশক্তি ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণের এত ভাল ঐক্য রয়েছে যে যদিও আমরা শক্তির যে স্তরে ঐক্যবদ্ধ হবে সে স্তরে এখনও পৌঁছাইনি তবুও এ তত্ত্ব এখন সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

মহাবিশ্বের বিবরণ দেয় এরকম তত্ত্বের একটা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। অন্য তত্ত্বগুলি যখন শুধুমাত্র তাদের আবিষ্কারকদেরই মনে থাকে তখন এই তত্ত্ব কেন জীবন্ত হয়ে ওঠে? N=৮ অতি মহাকর্ষ তত্ত্ব কিছু বিশেষত্ব দাবি করতে পারে। মনে হয় এটি একমাত্র তত্ত্ব –

১ যেটি চারমাত্রিক।

২ মহাকর্ষকে যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩ যেটি সসীম এবং যার অসীম বিয়োগ নেই।

আমি আগেই বলেছি স্থিতিমাপ (parameter) ছাড়া যদি একটা পূর্ণ তত্ত্ব গঠন করতে হয় তাহলে তৃতীয় ধর্মটি প্রয়োজন। তবে নরত্বীয় নীতির দ্বারস্থ না হয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধর্মের প্রয়োজনের কারণ বলা সম্ভব নয়। মনে হয় প্রথম এবং তৃতীয় ধর্মকে পরিতুষ্ট (satisfy) করে এরকম একটা সুসঙ্গত তত্ত্ব আছে কিন্তু মহাকর্ষ সে তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সেরকম একটা মহাবিশ্বে হয়ত এমন যথেষ্ট পরিমাণ আকর্ষণী বল থাকবে না যে বল যথেষ্ট পরিমাণ পদার্থ সংগ্রহ করে বৃহৎ পুঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। এই বৃহৎ পুঞ্জগুলিই হয়ত জটিল অবয়ব (complicated structure) বিকাশের জন্য প্রয়োজন। স্থান-কাল কেন চারমাত্রিক হবে? সাধারণত মনে করা হয় এ প্রশ্নটির অবস্থান পদার্থবিদ্যার এলাকার বাইরে। তাতে এক্ষেত্রেও একটা উত্তম নরত্বীয় নীতির যুক্তি রয়েছে। তিনটি স্থান-কাল মাত্রা – অর্থাৎ দুটি স্থান এবং একটা কাল – যে কোনও জটিল জীবের পক্ষে স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়। আবার অন্যদিকে তিনটির বেশি স্থানিক মাত্রা থাকলে – সূর্যকে পরিবেষ্টন করে গ্রহগুলির কক্ষপথ কিংবা কেন্দ্রককে বেষ্টন করে ইলেকট্রনের কক্ষপথ অস্থির হ'ত এবং তাদের সর্পিল পথে ভিতরে ঢুকে যাওয়ার

প্রবণতা থাকত। তাছাড়া অবশিষ্ট থাকে একাধিক কালিক মাত্রার সম্ভাবনা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এইরকম মহাবিশ্ব কল্পনা করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন।

এতক্ষণ পর্যন্ত একটা চরম তত্ত্বের অস্তিত্বের আভাস আমার অনুমানে নিহিত আছে। কিন্তু সত্যিই কি সেরকম কিছু আছে?

অন্তত তিনটি সম্ভাবনা থাকতে পারে :

(১) একটা পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আছে,

(২) কোনও চূড়ান্ত তত্ত্ব নেই তবে অসীম সংখ্যক তত্ত্বের একটা ক্রম রয়েছে। সেগুলি এমন যে শৃঙ্খলের যথেষ্ট নিম্নস্থিত তত্ত্বের সাহায্যে যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

(৩) কোনও তত্ত্ব নেই। একটা বিশেষ বিন্দু অতিক্রম করে কোনও পর্যবেক্ষণের বিবরণ কিংবা সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সেগুলি হবে একেবারেই যাদৃচ্ছিক।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়েছিল সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে : কি করে তাঁরা এমন বিধি গঠন করতে পারেন – যে বিধি নিজের মন পরিবর্তন করার ঐশ্বরিক স্বাধীন ইচ্ছাকে খর্ব করতে পারে? তবুও তাঁরা এ কর্ম করেছিলেন এবং এরকম করে পার পেয়েছিলেন। আধুনিক যুগে আমরা কার্যকরভাবে তৃতীয় সম্ভাবনাকে বাদ দিয়েছি এবং সে কাজ করছি ওটাকে আমাদের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করে। কণাবাদী বলবিদ্যা, যা আমরা জানি না এবং যে সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না, মূলত সেই সম্পর্কীয় তত্ত্ব।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তিতে অসীম সংখ্যক অবয়বের ক্রমের একটা চিত্র। এর আগে আমি বলেছিলাম এ সম্ভাবনা কম তার কারণ প্ল্যাঙ্ক শক্তি(Planck energy) $১০^{১৯}$eV তে ব্যাপারটি কেটে যাবে। ফলে অবশিষ্ট থাকে সম্ভাবনা ১। এই মুহূর্তে N= ৮ অতি মহাকর্ষ তত্ত্বকেই একমাত্র প্রার্থী হিসাবে দেখা যাচ্ছে*। আগামী কয়েক বছরে কয়েকটি বিনিশ্চায়ক গণণা

* মনে হয় অতি মহাকর্ষতত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব যার ১,২ এবং ৩ সবকটি ধর্মই আছে। কিন্তু তার পর থেকে অতিতন্তু তত্ত্বের (superstring theory) সপক্ষে একটি বিরাট আকর্ষণের ঢেউ এসেছে। এই তত্ত্বগুলিতে মূলগত বস্তুগুলি বিন্দুকণিকা নয়। সেগুলি তন্তুফাঁসের (loops) মতো প্রসারিত বস্তু। কল্পনটি হল : যেটা আমাদের কাছে বিন্দু বলে মনে হয় সেটা আসলে ফাঁসের উপরকার একটা কম্পন। মনে হয় স্বল্পশক্তি সীমায় এই অতিতন্তু তত্ত্বগুলি পরিণত হয় অতি মহাকাশ তত্ত্বে। কিন্তু এ পর্যন্ত অতিতন্তু তত্ত্ব থেকে পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে কোনও সাফল্যই হয়নি।

হতে পারে এবং একটা সম্ভাবনা আছে সে গণণায় প্রমাণিত হবে তত্ত্বটি কোনও কাজের নয়। এই সমস্ত পরীক্ষার পরও যদি তত্ত্বটির অস্তিত্ব থাকে তাহলে হয়ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা পাওয়ার মতো গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে আর মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার এবং স্থানীয় ভৌতবিধির কারণ বুঝতে আরও কয়েক বছর লাগবে। এগুলিই হবে আগামী কুড়ি বছর পর্যন্ত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অবশিষ্ট সমস্যা। তবে শেষ করতে হচ্ছে সামান্য আতঙ্কসৃষ্টিকারী ভাষায়। এ কাজ করার মতো সময় হয়ত তারা না পেতে পারে। বর্তমানে গবেষণায় কম্প্যুটার থেকে অনেক প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু কম্প্যুটার পরিচালনা করতে হবে মানুষের মনকেই । যদি কেউ ইদানীংকালে কম্প্যুটারের দ্রুত বিকাশের হারের ভিত্তি থেকে ভবিষ্যৎ গণনা করেন তাহলে এ সম্ভাবনা বেশ দেখা যায় যে হয়ত তারা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ করবে। তাহলে হয়ত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্তিম দশা না দেখা গেলেও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্‌দের অন্তিম দশা দেখা যেতে পারে।

আট

আইনস্টাইনের স্বপ্ন*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দুটি নতুন তত্ত্ব স্থান-কাল এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সত্তর বছরেরও বেশি হয়ে গেল আজও আমরা সেগুলির নিহিতার্থ অনুধাবনের জন্য অনুশীলন করে চলেছি আর চেষ্টা করে চলেছি তাদের সমন্বয় করে একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে। সে তত্ত্ব এমন হবে যে মহাবিশ্বের সবকিছুরই বিবরণ দান করতে পারবে। তত্ত্ব দুটি হল ব্যাপক অপেক্ষবাদ আর কণাবাদী বলবিদ্যা (general theory of relativity and quantum mechanics)। ব্যাপক অপেক্ষবাদের বিচার্য বিষয় স্থান আর কাল, মহাবিশ্বের পদার্থ এবং শক্তিপ্রভাবে বৃহৎ মানে কি করে তারা বেঁকে যায় কিংবা প্যাঁচ খেয়ে যায়। অন্যদিকে

* 1991 সালের জুলাই মাসে টোকিওতে এন. আই. টি. ডাটা কম্যুনিকেশন সিস্টেমের (NIT Data Communication System) প্যারাডিম সেশান-এ (Paradigm Session)- এ প্রদত্ত বক্তৃতা।

কণাবাদী বলবিদ্যা বিচার করে অতি ক্ষুদ্র মান, যাকে অনিশ্চয়তার নীতি বলা হয় সেটা এর অন্তর্ভুক্ত। এই নীতি অনুসারে একটি কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগ একই সময়ে কখনওই নির্ভুলভাবে মাপা যায় না। যত নির্ভুলভাবে একটিকে আপনি মাপবেন তত কম নির্ভুল হবে অন্যটির মাপন। একটা উপাদান সবসময়ই থাকে – সেটা হল অনিশ্চয়তা বা আপতন (chance)। এটা সবসময়ই ক্ষুদ্র মানে পদার্থের আচরণ মূলগতভাবে প্রভাবিত করে। আইনস্টাইন প্রায় একাই ব্যাপক অপেক্ষবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং কণাবাদী বলবিদ্যার বিকাশে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শেষোক্ত তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ পায় এই কথায় – 'ঈশ্বর জুয়া খেলেন না'। কিন্তু সমস্ত সাক্ষ্য থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় – ঈশ্বর সংশোধনের অতীত একজন জুয়াড়ি এবং তিনি জুয়ার দান ফেলে থাকেন। সুযোগ পেলেই তিনি জুয়া খেলেন।

এই রচনায় আমি চেষ্টা করব এই দুটি তত্ত্বের পিছনে যে মূলগত চিন্তাধারা আছে সেটা বলতে আর চেষ্টা করব বলতে আইনস্টাইন কেন কণাবাদী বলবিদ্যার ব্যাপারে এত অসুখী ছিলেন। তাছাড়া আমি দুটি তত্ত্বের সমন্বয় করলে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটে তার কয়েকটির বিবরণ দেব। এ থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় কালের নিজেরও প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে একটা শুরু ছিল এবং ভবিষ্যতে কোনও এক সময় এর শেষ হবে। তবুও অন্য এক ধরনের কালে মহাবিশ্বের কোনও শুরু নেই। এর সৃষ্টিও হয়নি, ধ্বংসও হয়নি। এ শুধু অস্তিমান।

আমি শুরু করব অপেক্ষবাদ দিয়ে। জাতীয় বিধিগুলি শুধু একটি দেশেই প্রযোজ্য কিন্তু পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জাপান সর্বত্র অভিন্ন। এমনকি মঙ্গলগ্রহ কিংবা এ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda) নীহারিকাতে এ বিধি এক। শুধু তাই নয় – আপনি যে গতিতেই চলমান হোন না কেন – বিধিগুলি একই থাকবে। একটা বুলেট ট্রেনে কিংবা একটা জেট বিমানে এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে এ রকম যে কোনও ব্যক্তি সাপেক্ষ বিধিগুলি একই হবে। আসলে পৃথিবীতে যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেও অবশ্যই সেকেণ্ডে প্রায় 18.6 মাইল (30 কি. মি.) বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলমান। সূর্য সেকেণ্ডে কয়েক শ' কিলোমিটার বেগে ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করে চলমান এবং এই রকম অনেক কিছুই। তবুও এই সমস্ত গতিই পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই এগুলি অভিন্ন।

একটি তন্ত্রের দ্রুতির স্বাতন্ত্র্য প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। তিনি কামানের গোলা কিংবা গ্রহগুলির মতো বস্তুপিণ্ডের গতির বিধি আবিষ্কার করেন। কিন্তু যখন এই দ্রুতির স্বাতন্ত্র্য আলোকের গতির বিধির ক্ষেত্রে প্রসারিত করার চেষ্টা করা হল, তখন একটা সমস্যা দেখা দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করা হয়েছিল, আলোক উৎস থেকে পর্যবেক্ষকের কাছে তৎক্ষণাৎ যায় না। বরং এটা যায় একটা বিশেষ গতিতে। সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার)। কিন্তু কি সাপেক্ষ এই দ্রুতি? মনে হয়েছিল সমগ্র স্থানে কোনও একটি মাধ্যম থাকা উচিত যার ভিতর দিয়ে আলোক গমন করে। এই মাধ্যমের নাম ইথার। চিন্তনটি ছিল আলোকতরঙ্গ সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল দ্রুতিতে (speed) ইথারের ভিতর দিয়ে গমন করে। এর অর্থ হল, যে ইথার সাপেক্ষ স্থিরাবস্থায় রয়েছে, সে আলোকের দ্রুতি মাপবে সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল। কিন্তু যে পর্যবেক্ষক ইথারের ভিতর দিয়ে চলমান তাঁর মাপনে আলোকের দ্রুতি উচ্চতর কি নিম্নতর মনে হবে, বিশেষ করে বিশ্বাস করা হ'ত পৃথিবী যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে কক্ষপথে ইথারের মধ্য দিয়ে চলমান তখন আলোকের দ্রুতির পরিবর্তন হওয়া উচিত। কিন্তু 1887 সালে মিচেলসন এবং মর্লি একটি সযত্ন পরীক্ষা করেন, তাতে দেখা গেল আলোকের গতি সবসময়ই অভিন্ন। পর্যবেক্ষক যে দ্রুতিতেই চলমান হোন না কেন, আলোকের গতি মাপলে তিনি সবসময়ই দেখবেন সেটা সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল।

এটা কি করে সত্য হতে পারে? বিভিন্ন দ্রুতিতে চলমান পর্যবেক্ষকরা কি করে আলোকের গতি মাপলে একই মাপনফল পাবেন? উত্তর : এ রকম তাঁরা পেতে পারেন না। অবশ্য যদি স্থান এবং কাল সম্পর্কে স্বাভাবিক চিন্তাধারা সত্য হয়। কিন্তু 1905 সালে একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন দেখালেন যদি সার্বিক কালের (universal time) চিন্তাধারা পরিত্যাগ করা হয় তাহলে ঐ রকম সমস্ত পর্যবেক্ষকই আলোকের গতির মাপনফল অভিন্ন পাবেন। তার বদলে প্রত্যেকে তাঁদের ব্যক্তিগত কাল পেতে পারেন। সেটা মাপতে হবে যে ঘড়ি তাঁরা নিজেরা বহন করছেন সেই ঘড়ি দিয়ে। এই সব বিভিন্ন ঘড়ির মাপনে যে কাল দেখা যাবে সেটা প্রায় নির্ভুলভাবে অভিন্ন হবে। অবশ্য তাঁরা যদি পরস্পরসাপেক্ষ ধীর গতিতে চলেন। কিন্তু তাঁরা যদি উচ্চ গতিতে চলেন, তাহলে বিভিন্ন ঘড়ির মাপনে যে কালগুলি পাওয়া যাবে তাদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকবে। এই অভিক্রিয়া বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা

গিয়েছে। সেটা করা হয়েছে পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থিত একটি ঘড়ির সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক বিমানে অবস্থিত একটি ঘড়ির তুলনা করে। বিমানে অবস্থিত ঘড়িটি স্থিতাবস্থায় অবস্থিত ঘড়ির তুলনায় সামান্য ধীর গতিতে চলে। কিন্তু পর্যটনের স্বাভাবিক দ্রুতিতে ঘড়িগুলির চলনের হারের পার্থক্য খুবই কম। আপনার আয়ু এক সেকেণ্ড বাড়াতে হলে আপনাকে বিমানে পৃথিবীকে চল্লিশ কোটি বার প্রদক্ষিণ করতে হবে। কিন্তু বিমানে আপনাকে যে খাবার দেবে সেই খাবার খেয়ে আপনার আয়ু অনেক বেশি কমে যাবে।

নিজেদের ব্যক্তিগত কাল থাকলেও কি করে বিভিন্ন দ্রুতিতে চলমান লোকের কাছে আলোকের দ্রুতির মাপনফল একই হবে? একটি আলোকের স্পন্দনের দ্রুতি হবে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কালে সে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে তার সঙ্গে সেই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কালের ভাগফল (এই অর্থে একটি ঘটনা হল স্থানের একক একটি বিন্দুতে, কালের একটি বিশেষ বিন্দুতে যা ঘটে তাই)। বিভিন্ন দ্রুতিতে চলমান লোকেদের দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে মতৈক্য হবে না। উদাহরণ : আমি যদি বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে এরকম একটা গাড়ি মাপি তাহলে আমি ভাবতে পারি গাড়িটা এক কিলোমিটার চলেছে। কিন্তু কেউ যদি সূর্য থেকে গাড়িটা দেখে তাহলে সে বলবে গাড়িটা প্রায় 1800 কিলোমিটার চলেছে। তার কারণ গাড়িটা যখন রাস্তা দিয়ে চলছিল পৃথিবীটাও তখন চলেছে। ভিন্ন দ্রুতিতে চলমান বিভিন্ন লোকের দূরত্বের মাপন বিভিন্ন হবে -- তাদের যদি আলোকের দ্রুতি সম্পর্কে এক মত হতে হয় তাহলে ঘটনাগুলির অন্তর্বর্তী কালের মাপনেও তাদের পার্থক্য হবে।

1905 সালের একটি গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন অপেক্ষবাদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখন আমরা এ তত্ত্বের নাম দিয়েছি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ। এ তত্ত্ব বস্তুপিণ্ডগুলি স্থান-কালে কিভাবে চলমান তার বিবরণ দান করে। এ তত্ত্ব দেখায় কাল একটি স্বতত অস্তিমান (exists on its own) স্থান থেকে স্বতন্ত্র সার্বিক রাশি নয়। অতীত এবং বর্তমান শুধু অভিমুখ মাত্র—স্থান-কালের মতো একটা কিছুর ভিতরে উচ্চ-নীচ(up and down), দক্ষিণ-বাম, সম্মুখ-পশ্চাতের মতো অনেকটা। কালে আপনি শুধু ভবিষ্যৎ অভিমুখেই যেতে পারেন তবে তার সঙ্গে একটু কৌণিকভাবেও যেতে পারেন। সেই জন্যই কাল বিভিন্ন হারে চলমান হতে পারে।

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ স্থান এবং কালকে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু স্থান-কাল ছিল ঘটনা ঘটবার একটি স্থির পশ্চাৎপট। আপনি স্থান-কালের ভিতর দিয়ে চলবার

জন্য বিভিন্ন পথ বেছে নিতে পারেন। কিন্তু যাই করুন না কেন স্থান-কালের পশ্চাৎপটের কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে 1915 সালে আইনস্টাইন যখন ব্যাপক অপেক্ষবাদ গঠন করলেন তখন এ সবেরই পরিবর্তন হল। তাঁর যে বিপ্লবী চিন্তাধারা ছিল সেটা হল মহাকর্ষ শুধুমাত্র স্থান-কালের পশ্চাৎপটে সক্রিয় একটি বল নয়। তার বদলে মহাকর্ষ স্থান-কালের একটি বিকৃতি। তার কারণ এর ভিতরকার বল এবং শক্তি। কামানের গোলা কিংবা গ্রহগুলির মতো বস্তুপিণ্ড স্থান-কালের ভিতর দিয়ে ঋজুরেখায় চলমান হয় কিন্তু যেহেতু স্থান-কাল সমতল না হয়ে বঙ্কিম এবং প্যাঁচ খাওয়া, সেইজন্য বস্তুপিণ্ডগুলির চলার পথকে বঙ্কিম মনে হয়। পৃথিবী চেষ্টা করে স্থান-কালের ভিতর দিয়ে ঋজুপথে যেতে কিন্তু সূর্যের ভরের ফলে স্থান-কালের বক্রতা পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করে চক্রাকারে ঘোরায়। একইভাবে আলোক চেষ্টা করে ঋজুপথে যেতে কিন্তু সূর্যের নিকটের স্থান-কালের বক্রতা সুদূর তারকাগুলি থেকে আগত আলোককে সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁকিয়ে দেয়। সাধারণত প্রায় সূর্যের অভিমুখে অবস্থিত আকাশের তারাগুলিকে দেখা যায় না। তবে গ্রহণের সময় সূর্যের প্রায় অধিকাংশ আলোককেই চাঁদ আটকে দেয়, তখন ঐ সমস্ত তারকা থেকে আগত আলোক পর্যবেক্ষণ করা যায়। আইনস্টাইন ব্যাপক অপেক্ষবাদ সৃষ্টি করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। কিন্তু 1919 সালে যুদ্ধের পরপরই একটি ব্রিটিশ অভিযান গ্রহণটি পর্যবেক্ষণ করে এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয় : স্থান-কাল সমতল নয়, ভিতরকার পদার্থ এবং শক্তির ফলে স্থান-কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

এটা ছিল আইনস্টাইনের বৃহত্তম বিজয়। তাঁর আবিষ্কারের ফলে স্থান-কাল সম্পর্কে আমাদের কল্পন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেগুলি আর যার ভিতরে ঘটনা ঘটে তার অক্রিয় পশ্চাৎপট নয়। আমরা আর স্থান-কালকে—মহাবিশ্বে কি হচ্ছে তা দিয়ে প্রভাবিত না হয়ে, অবিরত চলমান ভাবতে পারি না। তার বদলে এখন এরা হল নিজেরাই গতীয় রাশি (dynamic quantities), তার ভিতরে যা ঘটে তা দিয়ে তারা নিজেরা প্রভাবিত হয় এবং ঘটনাগুলিকেও প্রভাবিত করে।

ভর এবং শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল তারা সবসময়ই পরা (positive)। এইজন্য মহাকর্ষ সবসময়ই বস্তুপিণ্ডগুলিকে আকর্ষণ (পরস্পরের অভিমুখে) করে। উদাহরণ : বিশ্বের মহাকর্ষ পৃথিবীর দুই বিপরীত অভিমুখ

পর্যন্ত আমাদের আকর্ষণ করে। সেইজন্যই অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা পৃথিবী থেকে পড়ে যায় না। একইরকম ভাবে সূর্যের মহাকর্ষ গ্রহগুলিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করা কক্ষপথে রক্ষা করে এবং পৃথিবীটার আন্তঃতারকাস্থানের অন্ধকারে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে ভর সবসময়ই পরা (positive) হওয়ার অর্থ স্থান-কাল ভূ-পৃষ্ঠের মতো নিজের উপরে বেঁকে থাকে। ভর অপরা (negative) হলে স্থান-কাল ঘোড়ার জিনের মতো অন্য দিকে বেঁকে থাকত। স্থান-কালের এই পরা বক্রতা মহাকর্ষ যে আকর্ষণীয় সেটাই প্রকাশ করে। আইনস্টাইনের কাছে এটা ছিল একটা বিরাট সমস্যা। তখনকার দিনে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস ছিল মহাবিশ্বের অবস্থা স্থৈতিক (static)। তবুও, স্থান, বিশেষ করে কাল, যদি নিজের পশ্চাৎ মুখে বঙ্কিম থাকে তাহলে মহাবিশ্ব কি করে বর্তমানে যেরকম অবস্থায় আছে সেরকম একই অবস্থায় থাকতে পারে?

ব্যাপক অপেক্ষবাদ সম্পর্কে আইনস্টাইনের প্রথম সমীকরণগুলির ভবিষ্যদ্বাণী ছিল মহাবিশ্ব হয় প্রসারমান নয়ত সঙ্কোচনশীল। সুতরাং আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণগুলিতে আর একটি পদ (term) যোগ করলেন। এই পদটি মহাবিশ্বের ভর এবং শক্তির সঙ্গে স্থান-কালের বক্রতার সম্পর্ক নির্দেশ করে। এই তথাকথিত মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদের (cosmological term) একটি বিকর্ষণকারী মহাকর্ষীয় ক্রিয়া ছিল। এইভাবে পদার্থের আকর্ষণের সঙ্গে মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদের (term) একটা ভারসাম্য করা সম্ভব ছিল। অন্য কথায় মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদের তৈরি স্থান-কালের অপরা বক্রতা (negative curvature) মহাবিশ্বের ভর এবং শক্তি দিয়ে তৈরি পরা বক্রতাকে (positive curvature) নাকচ (cancel) করে দিতে পারে। এইভাবে মহাবিশ্বের এমন একটা প্রতিরূপ পাওয়া যেতে পারে যেটা চিরকাল একই অবস্থায় থাকে। আইনস্টাইন যদি তাঁর মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদ ছেড়ে দিয়ে তাঁর প্রথম সমীকরণগুলিতে লেগে থাকতেন তাহলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন মহাবিশ্ব হয় প্রসারিত হচ্ছে নয়ত 'সঙ্কুচিত হচ্ছে'। ব্যাপারটা হল : ১৯২৯ সালের আগে কেউই ভাবতে পারেনি যে কালের সঙ্গে মহাবিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই সময় এডুইন হাবল্ (Edwin Hubble) আবিষ্কার করলেন : দূরের ছায়াপথগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব প্রসারমান। পরে আইনস্টাইন বলেছেন—'মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদ আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল।'

মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদ থাকুক কিংবা না থাকুক পদার্থের স্থান-কালকে নিজের

উপর বাঁকিয়ে দেওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে রইল। অবশ্য সাধারণভাবে এটাকে সমস্যা বলে বোঝা যায়নি। এর অর্থ ছিল পদার্থ একটি অঞ্চলকে নিজের উপর এমনভাবে বাঁকিয়ে দিতে পারে যে পদার্থের কার্যকরভাবে নিজেকে বাকী মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। যাকে কৃষ্ণগহ্বর বলা হয় সেটা হয়ে দাঁড়াবে তাই। বস্তুপিণ্ডগুলি তার ভিতরে পড়ে যেতে পারে কিন্তু তার ভিতর থেকে কিছুই বেরোতে পারে না। বেরোতে হলে তাদের গতি হতে হবে আলোকের দ্রুতির চাইতে বেশি। অপেক্ষবাদ এটা অনুমোদন করে না। এইভাবে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরকার পদার্থ একটা ফাঁদে আটকে যাবে এবং চুপসে গিয়ে অত্যন্ত উচ্চঘনত্বসম্পন্ন একটা অজানা অবস্থায় পৌঁছাবে।

এই চুপসে যাওয়ার নিহিতার্থ আইনস্টাইনকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল এবং এরকম যে হতে পারে তিনি সেটা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে রবার্ট ওপেনহাইমার দেখিয়েছিলেন সূর্যের দ্বিগুণ ভরসম্পন্ন একটি বৃদ্ধ তারকার কেন্দ্রকীয় জ্বালানী (nuclear fuel) ফুরিয়ে গেলে সেটা চুপসে যেতে বাধ্য। তারপর যুদ্ধ এসে বাধা দিল, ওপেনহাইমার পারমাণবিক বোমা তৈরিতে জড়িয়ে পড়লেন এবং মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর আর কোনও আগ্রহ রইল না। অন্য বৈজ্ঞানিকরা পদার্থবিদ্যার যে অংশ নিয়ে পৃথিবীতেই গবেষণা করা যায় তাই নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। মহাবিশ্বের সুদূর অঞ্চল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না, তার কারণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সেগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব বলে তাঁদের মনে হয়নি। তবে ১৯৬০-এর দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের গুণগত মান এবং পাল্লার (range) বিরাট উন্নতিতে মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়া (gravitational collapse) এবং আদিম মহাবিশ্ব সম্পর্কে আকর্ষণ নতুন করে সৃষ্টি হল। আমি এবং রজার পেনরোজ কয়েকটি উপপাদ্য প্রমাণ না করা পর্যন্ত আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ এই অবস্থাগুলি সম্পর্কে ঠিক কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সেটা ছিল অস্পষ্ট। এগুলি দেখিয়েছিল : স্থান-কাল নিজের উপরে বক্র এইজন্য অনন্যতা থাকবে অর্থাৎ থাকবে এমন জায়গা যেখানে স্থান-কালের শুরুও ছিল শেষও ছিল। পনেরো শত কোটি বছর আগে বৃহৎ বিস্ফোরণে ছিল এর আরম্ভ এবং যে তারকা চুপসে যাবে তার পক্ষে এবং চুপসে যাওয়া তারকার পিছনে ফেলে যাওয়া যে কোনও জিনিস যা কৃষ্ণগহ্বরে পড়বে সেগুলির পক্ষে এই চুপসে যাওয়াটা হবে অন্তিম।

আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনন্যতার বাস্তবতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

করার ফলে পদার্থবিদ্যায় একটা সঙ্কট উপস্থিত হল। ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমীকরণগুলি স্থান-কালের বক্রতার সঙ্গে ভর এবং শক্তির একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তবে একে অনন্যতা বলে সংজ্ঞিত করা যায় না। তার অর্থ : একটি অনন্যতা থেকে কি বেরিয়ে আসবে সে সম্পর্কে ব্যাপক অপেক্ষবাদ কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদ, বিশেষ করে পারে না বৃহৎ বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব কি করে শুরু হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে। সেইজন্য অপেক্ষবাদ একটা সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়। মহাবিশ্ব কি করে শুরু হবে এবং পদার্থ যখন নিজের মহাকর্ষের চাপে চুপসে যায় তখন কি ঘটতে পারে – এগুলি নির্ধারণের জন্য অপেক্ষবাদে আরও একটা উপাদান যোগ করা প্রয়োজন।

মনে হয় প্রয়োজনীয় বাড়তি উপাদানটি হল কণাবাদী বলবিদ্যা। ১৯০৫ সালে অর্থাৎ যে বছর আইনস্টাইন বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ লেখেন, সেই বছর তিনি আলোকবিদ্যুৎ অভিক্রিয়া (photoelectric effect) নামক পরিঘটনা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দেখা গিয়েছিল কিছু কিছু ধাতুর উপর আলো পড়লে আধানযুক্ত কণিকা নির্গত হয়। হতবুদ্ধি হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল : আলোকের তীব্রতা কমলে নির্গত কণিকার সংখ্যা কমে কিন্তু যে দ্রুতিতে কণিকাগুলি নির্গত হয় সেটা অভিন্ন থাকে। আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন সবাই যা অনুমান করেছিল আলোক যদি সেরকম অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত না হয়ে একটা বিশেষ আকারের ক্ষুদ্র মোড়কে নির্গত হয়–এ তথ্য যদি মেনে নেওয়া যায় – তাহলে ব্যাপারটা ব্যাখা করা সম্ভব। আলোক শুধুমাত্র কোয়াণ্টা নামে প্যাকেটে আসে – কয়েকবছর আগে জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) এই চিন্তাধারা উপস্থিত করেন। এটা অনেকটা এই কথা বলার মতো : বাজারে চিনি খুচরো কিনতে পাওয়া যায় না – পাওয়া যায় এক কিলোগ্রাম ব্যাগে। প্লাঙ্ক কোয়াণ্টাম সম্পর্কিত চিন্তন ব্যবহার করেছিলেন – কেন একটি তপ্ত, লোহিতবর্ণ ধাতুখণ্ড অসীম পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে না সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর চিন্তনে কোয়াণ্টা ছিল একটি তাত্ত্বিক কৌশল মাত্র – সেগুলি কোনও ভৌত বাস্তবতার অনুরূপ নয়। আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রে দেখা গেল একক কোয়াণ্টাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। প্রতিটি নির্গত কণিকা এক কোয়াণ্টাম আলোকের ঐ ধাতুকে আঘাত করার অনুরূপ। এই গবেষণাপত্রটি কণাবাদী বলবিদ্যায় (কোয়াণ্টাম তত্ত্বে) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বহুল স্বীকৃতি লাভ করল। এই গবেষণার জন্য তিনি

১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ব্যাপক অপেক্ষবাদের জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্থান এবং কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয় এই চিন্তাধারা তখনও অত্যন্ত দূর কল্পনাভিত্তিক এবং বির্তকমূলক বলে বিবেচনা করা হ'ত। সেইজন্য তার বদলে তাঁকে আলোকবিদ্যুৎ অভিক্রিয়ার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে এই গবেষণা যে তাঁর নিজস্ব গুণে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না তা নয়।

এই আলোকবিদ্যুৎ অভিক্রিয়ার পূর্ণ নিহিতার্থ ১৯২৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি। সেই বছর ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ (Werner Heisenberg) দেখালেন এর ফলে একটি কণিকার অবস্থান নির্ভুলভাবে মাপা অসম্ভব। কণিকাটি কোথায় আছে দেখবার জন্য তার উপর আলো ফেলতে হয়। কিন্তু আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ আলোক ব্যবহার করা যায় না – অন্ততপক্ষে এক প্যাকেট – অর্থাৎ এক কোয়াণ্টাম আলোক ফেলতেই হবে। আলোকের এই প্যাকেট কণিকাটিকে বিচলিত করবে এবং একে কোনও দ্রুতিতে কোনও এক অভিমুখে চালনা করবে। যত নির্ভুলভাবে আপনি কণিকাটির অবস্থান জানতে চাইবেন, তত বেশি শক্তিসম্পন্ন প্যাকেট আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। ফলে কণিকাটি তত বেশি বিচলিত হবে। কণিকাটিকে আপনি যতই মাপতে চেষ্টা করবেন – তার অবস্থানের অনিশ্চয়তা এবং দ্রুতির অনিশ্চয়তার গুণফল সবসময়ই একটা সর্বনিম্ন পরিমাণের বেশি হবে।

হাইসেনবার্গের এই অনিশ্চয়তার নীতি দেখিয়েছে একটি তন্ত্রের অবস্থা নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয় সুতরাং ভবিষ্যতে সে কি করবে সে সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। করা যেতে পারে শুধু বিভিন্ন পরিণতির সম্ভাব্যতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই আপতনিক উপাদান (element of chance) অর্থাৎ নিয়মহীনতাই আইনস্টাইনকে অতখানি বিচলিত করেছিল। ভৌত বিধিগুলি ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট, নিশ্চিত সুনিয়মিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা যাবে না—একথা বিশ্বাস করতে আইনস্টাইন অস্বীকার করেন। কিন্তু যে ভাবেই এটা প্রকাশ করা হোক না কেন, সমস্ত সাক্ষ্যতেই দেখা যায় কোয়াণ্টাম পরিঘটনা এবং অনিশ্চয়তার নীতি পরিহার করা যায় না এবং পদার্থবিদ্যার সমস্ত শাখাতেই এদের অস্তিত্ব রয়েছে।

যাকে চিরায়ত তত্ত্ব বলে আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ হল তাই – অর্থাৎ অনিশ্চয়তার নীতি এ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এমন একটা নতুন

তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে যে তত্ত্ব ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং অনিশ্চয়তার নীতি সংযুক্ত করে। অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই এই নতুন তত্ত্ব এবং চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদে পার্থক্য হবে খুবই কম, এর কারণ আগেই যা বলা হয়েছে তার অনুরূপ। অর্থাৎ কোয়াণ্টাম অভিক্রিয়া যে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে সেটা খুবই ক্ষুদ্র মানে অথচ ব্যাপক অপেক্ষবাদের ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত বৃহৎ মানে স্থান-কালের গঠন নিয়ে। কিন্তু আমি আর রজার পেনরোজ যে অনন্যতা উপপাদ্য প্রমাণ করেছিলাম তাতে দেখা যায় অতি ক্ষুদ্র মানেও স্থান-কাল অত্যন্ত বঙ্কিম- হবে। তখন অনিশ্চয়তার নীতির প্রভাব হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে হয় এগুলি কিছু উল্লেখযোগ্য পরিণতি নির্দেশ করে।

একটি তন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট নিশ্চিত ইতিহাস আছে – সাধারণ বুদ্ধিজাত এই দৃষ্টিভঙ্গি আইনস্টাইন গ্রহণ করেছিলেন। কণাবাদী বলবিদ্যা এবং অনিশ্চয়তার নীতি নিয়ে তাঁর সমস্যার আংশিক উৎস এটাই। একটি কণিকার অবস্থান হয় একটি জায়গায় নয়ত অন্য জায়গায়। সেটা কখনওই অর্ধেক এক জায়গায় এবং বাকী অর্ধেক অন্য জায়গায় হতে পারে না। তেমনি একজন মহাকাশচারীর চন্দ্রে অবতরণের মতো ঘটনা হয় ঘটেছে নয়ত ঘটেনি। অর্ধেক ঘটেছে এরকম হতে পারে না। ব্যাপারটা অনেকটা এই তথ্যের মতো : আপনি সামান্য মৃত কিংবা সামান্য গর্ভবতী হতে পারেন না। হয় আপনি হয়েছেন নয়ত আপনি হননি। কিন্তু একটি তন্ত্রের যদি একক একটি নির্দিষ্ট নিশ্চিত ইতিহাস থাকে তাহলে অনিশ্চয়তার নীতির ফলে নানারকম স্ববিরোধিতা (paradox) উপস্থিত হয়। যেমন, কণিকাগুলির একই মুহূর্তে দুটি জায়গায় অবস্থান কিংবা মহাকাশচারীর চন্দ্রে অর্ধেক অবস্থান।

এই জাতীয় স্ববিরোধগুলি আইনস্টাইনকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সুস্থ উপায় প্রস্তাব করেছিলেন আমেরিকান পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান (Richard Feynman)। আলোকের কণাবাদী তত্ত্বের (quantum theory) উপর গবেষণার জন্য ১৯৪৮ সালে ফাইনম্যান সুপরিচিত হন। আরেকজন আমেরিকান জুলিয়ান সুইংগার (Julian Schwinger) এবং জাপানী পদার্থবিদ শিনিচিরো টোমোনাগা (Shincihiro Tomonaga) -র সঙ্গে তিনি ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু তিনি ছিলেন পদার্থবিদদের পদার্থবিদ অর্থাৎ আইনস্টাইনের ঐতিহ্যবাহক। জাঁকজমক আর ভড়ং তিনি ঘৃণা করতেন। ন্যাশানাল এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স থেকে তিনি ইস্তফা দেন। তার কারণ তিনি দেখেছিলেন তাঁরা অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন

অন্য কোনও বৈজ্ঞানিককে এ্যাকাডেমিতে নেওয়া হবে কিনা সেই আলোচনায়। ফাইনম্যানের মৃত্যু হয় ১৯৮৮ সালে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় বহু দানের জন্য তাঁকে স্মরণ করা হয়। এর ভিতরে ছিল তাঁর নাম বহন করে এমন কতগুলি চিত্র (diagram)। পদার্থবিদ্যার কণা-বিজ্ঞান শাখার (particle physics) প্রায় প্রতিটি গণনার ভিত্তি এই চিত্রগুলি। কিন্তু তাঁর এর চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি দান ছিল ইতিহাসের যোগফল সম্পর্কীয় কল্পন। চিন্তাধারাটি ছিল এইরকম : চিরায়ত অ-কোয়াণ্টাম তত্ত্বে যে রকম স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা হয়– একটি তন্ত্রের (system) স্থান-কালে সেইরকম একটি মাত্র ইতিহাস ছিল না। বরং তার ছিল সম্ভাব্য সবরকম ইতিহাস। উদাহরণ : বিচার করুন A বিন্দুতে একটা বিশেষ কালে অবস্থিত একটি কণিকা। সাধারণত অনুমান করা হয় কণিকাটি একটি ঋজুরেখায় A থেকে দূরে চলমান হবে। কিন্তু ইতিহাসের যোগফল অনুসারে কণিকাটি A থেকে শুরু হয় এরকম যে কোনও পথে চলমান হতে পারে। ব্যাপারটা এক টুকরো ব্লটিং পেপারে এক ফোঁটা কালি ফেললে যা ঘটে অনেকটা সেই রকম। কালির কণিকাগুলি সম্ভাব্য সবকটি পথে ব্লটিং পেপারের ভিতর দিয়ে চলমান হবে। এমনকি আপনি যদি ব্লটিং পেপারের একটা জায়গা কেটে দিয়ে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ঋজুরেখা বন্ধ করে দেন তাহলেও কালিটা কোণ দিয়ে ঘুরে যাবে।

প্রতিটি পথ কিংবা কণিকাটির প্রতিটি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত থাকবে একটি সংখ্যা। সংখ্যাটি নির্ভর করবে পথের গঠনের (shape) উপর। যে পথগুলি কণিকাটিকে A থেকে B তে নিয়ে যায় তার সবগুলির সঙ্গে জড়িত সংখ্যাগুলিকে যোগ করে কণিকাটির A থেকে B তে গমনের সম্ভাব্যতা পাওয়া যায়। অধিকাংশ পথের ব্যাপারেই পথের সঙ্গে জড়িত সংখ্যাগুলি নিকটবর্তী পথগুলি থেকে আসা সংখ্যাগুলিকে প্রায় বাতিল করে দেবে। সুতরাং কণিকাটির A থেকে B তে যাওয়ার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে তাদের দান থাকবে সামান্যই। কিন্তু ঋজুপথ থেকে আগত সংখ্যাগুলির সঙ্গে যোগ হবে প্রায় ঋজুপথ থেকে আগত সংখ্যাগুলির। সুতরাং সম্ভাব্যতার প্রধান দান আসবে যে পথগুলি ঋজু কিংবা প্রায় ঋজু সেগুলির কাছ থেকে। সেইজন্য একটি কণিকা যখন বুদ্বুদ কক্ষ (bubble chamber) দিয়ে গমন করে তখন তার গমনপথকে প্রায় ঋজু মনে হয়। কিন্তু আপনি যদি কণিকাটির গমনপথে রেখা ছিদ্র (slit) সমন্বিত দেওয়ালের মতো একটা কিছু রেখে দেন তাহলে কণিকার গমনপথগুলি ওই রেখাছিদ্রের ওপারেও বিস্তারলাভ করতে পারে। কণিকাটিকে

রেখাছিদ্র থেকে দূরে, প্রত্যক্ষ রেখায় পাওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষ্ণগহ্বরের কাছে বঙ্কিম স্থান-কালে একটি কণিকার উপর অনিশ্চয়তার নীতির কি ক্রিয়া হবে ১৯৭৩ সালে আমি সেই বিষয়ে গবেষণা শুরু করি। যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল : আমি আবিষ্কার করলাম কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ হবে না। অনিশ্চয়তার নীতি কণিকা এবং বিকিরণের স্থিরহারে ক্ষরিত হওয়া (leak out) অনুমোদন করবে। এই গবেষণাফল আমার কাছে এবং অন্যান্যদের কাছে সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল এবং সাধারণ অবিশ্বাসই এই গবেষণাফলকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। পশ্চাৎদৃষ্টিতে বোঝা যায় ব্যাপারটি স্বতঃপ্রতীয়মান হওয়া উচিত ছিল। কৃষ্ণগহ্বর স্থানের এমন একটি অঞ্চল যেখান থেকে আলোর দ্রুতির চাইতে স্বল্প দ্রুতিতে চললে নিষ্ক্রমণ অসম্ভব। কিন্তু ফাইনম্যানের ইতিহাসের যোগফল অনুসারে কণিকাগুলি স্থান-কালের ভিতর দিয়ে যে কোনও পথ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং একটি কণিকার আলোকের চাইতে দ্রুততর গমন সম্ভব। কিন্তু আলোকের দ্রুতির চাইতে বেশি দ্রুতিতে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা অল্প। তবে কণিকাটি আলোকের চাইতে দ্রুতগতিতে কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিষ্ক্রমণের মতো দূরত্ব মাত্র অতিক্রম করতে পারে, তারপর এটা যেতে পারে আলোকের চাইতে স্বল্পতর গতিতে। এইভাবে অনিশ্চয়তার নীতি কণিকাগুলিকে আগে যাকে বলা হ'ত অন্তিম কারাগার (ultimate prison) তা থেকে পলায়ন অনুমোদন করে। সূর্যের মতো ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বর থেকে একটি কণিকার পলায়নের সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ সেক্ষেত্রে ঐ কণিকাটির আলোকের চাইতে দ্রুতগতিতে কয়েক কিলোমিটার যেতে হবে। কিন্তু আদিম মহাবিশ্বে গঠিত, তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বরও থাকতে পারে। এই আদিম কৃষ্ণগহ্বরগুলির আকার একটি পরমাণুর কেন্দ্রকের চাইতেও ক্ষুদ্র হতে পারে অথচ ভর হতে পারে এক হাজার কোটি টন অর্থাৎ ফুজি পর্বতের ভরের মতো। তারা একটা বৃহৎ শক্তি (বিদ্যুৎ) উৎপাদন কেন্দ্রের মতো শক্তি বিকিরণ করতে পারে। অবশ্য যদি আমরা ঐরকম একটা ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে বার করে তার শক্তিকে কাজে লাগাতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহাবিশ্বে আমাদের খুব কাছাকাছি ওরকম কৃষ্ণগহ্বর খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে কোয়াণ্টাম নীতির সংযোগের অনতিতুচ্ছ ফল। এ থেকে দেখা গিয়েছে মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়াকে যেরকম অন্তিম অবস্থা মনে

হয়েছিল ব্যাপারটি সেরকম নয়। কৃষ্ণগহ্বরের কণিকাগুলি একটা অনন্যতায় এলে সেটাই তাদের ইতিহাসের অন্তিম হওয়া আবশ্যিক নয়। তার বদলে তারা কৃষ্ণগহ্বর থেকে পালিয়ে বাইরে এসে তাদের ইতিহাসকে চলমান রাখতে পারে। হয়ত কোয়াণ্টাম নীতির অর্থ হতে পারে – কালে ইতিহাসের একটা প্রারম্ভ থাকা, বৃহৎ বিস্ফোরণে একটা সৃষ্টির মুহূর্ত থাকা – এ জাতীয় তথ্য এড়িয়ে যাওয়া।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক বেশি কঠিন কারণ এর সঙ্গে জড়িত শুধুমাত্র একটি বিশেষ স্থান-কালের পশ্চাৎপটে কণিকাটির গমনপথই নয়, এর সঙ্গে জড়িত আছে স্থান-কালের নিজেদের গঠনের উপর কোয়াণ্টাম নীতি প্রয়োগ করা। যেটা প্রয়োজন সেটা শুধু কণিকাগুলির ক্ষেত্রেই ইতিহাসের যোগফল বার করা নয়, স্থান-কালের সার্বিক গঠনেরও যোগফল বার করা। আমরা এখনও এই যোগ ঠিক কিভাবে করতে হবে জানি না তবে সেই যোগের অবয়ব কি হবে তার খানিকটা আমরা জানি। তার একটা হল : ইতিহাস সম্পর্কে কাজ করতে হলে সাধারণ বাস্তব কালের মাধ্যমে করার চাইতে যাকে কাল্পনিক কাল বলে তার মাধ্যমে করা সহজ। কাল্পনিক কালের কল্পন কঠিন--সেটা বোঝা শক্ত। আমার বইয়ের পাঠকদের কাছে এটাই সবচাইতে বড় সমস্যাগুলির সৃষ্টি করেছে। কাল্পনিক কাল ব্যবহার করার জন্য দার্শনিকরাও আমার হিংস্র সমালোচনা করেছেন। কাল্পনিক কালের সঙ্গে বাস্তব মহাবিশ্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমার মনে হয় এই দার্শনিকরা ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। এক সময় পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করে এই মতই স্বতঃপ্রতীয়মান মনে হ'ত কিন্তু কোপারনিকাস আর গ্যালিলিও-র পর থেকে পৃথিবী গোল এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এই মতের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হয়েছে। একইভাবে বহুদিন পর্যন্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল কাল প্রতিটি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ সমহারে চলমান, কিন্তু আইনস্টাইনের পর থেকে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে কাল বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ বিভিন্ন হারে চলমান। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান মনে হয়েছিল যে, মহাবিশ্বের একটা অদ্বিতীয় ইতিহাস আছে তবুও কণাবাদী বলবিদ্যা আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের ভাবতে হয়েছে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ইতিহাসই থাকতে পারে। আমি প্রস্তাব করতে চাই কাল্পনিক কালও এমন একটা জিনিস যা আমাদের মেনে নিতে হবে। পৃথিবী গোলাকার এই বিশ্বাস করার মতোই কাল্পনিক কালে বিশ্বাস একটা বৌদ্ধিক লক্ষ্য। আমার মনে হয় পৃথিবী গোলাকার এ তথ্য এখন

যে রকম স্বাভাবিক মনে হয় ভবিষ্যতে কাল্পনিক কালও মনে হবে তেমনি স্বাভাবিক, শিক্ষাজগতে চ্যাপ্টা-বিশ্বে বিশ্বাসী (flat earthers) আর বেশি অবশিষ্ট নেই।

সাধারণ বাস্তব কালকে ভাবা যেতে পারে – বাম থেকে দক্ষিণে গমনকারী একটি আনুভূমিক (horizontal) রেখা। পূর্ববর্তী কাল রয়েছে বাঁদিকে আর পরবর্তী কাল রয়েছে ডাইনে। কিন্তু কালের অন্য অভিমুখও আপনি ভাবতে পারেন – পৃষ্ঠার উপরে আর নীচে। ঐটাই তথাকথিত কাল্পনিক কালের অভিমুখ। এ অভিমুখ বাস্তব কালের সমকোণে।

কাল্পনিক কালের কল্পন উপস্থিত করার কারণ কি? সাধারণ বাস্তব কাল – যা বুঝতে পারি তাতেই আমরা বিশ্বাসী হয়ে যাব না কেন? এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। কারণটা হল স্থান এবং কালের নিজের উপর একটা স্থান-কাল বক্রতা সৃষ্টি করার প্রবণতা রয়েছে। বাস্তব কালের অভিমুখে সুনিশ্চিতভাবে এর ফল হয় একাধিক অনন্যতা – অর্থাৎ এমন কতগুলি জায়গায় যেখানে স্থান-কাল শেষ হয়ে যায়। অনন্যতাগুলিতে পদার্থবিদ্যার সমীকরণগুলি সংজ্ঞিত করা যায় না। সুতরাং কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাল্পনিক কালের অভিমুখ বাস্তব কালের সমকোণে। তার অর্থ : যে তিনটি অভিমুখ স্থানে চলাচলের অনুরূপ, এর আচরণ তার সমরূপ। মহাবিশ্বের পদার্থের জন্য স্থান-কালের বক্রতা তাহলে স্থানের তিনটি অভিমুখের পথ দেখাতে পারে এবং কালের অভিমুখ তার পশ্চাতে মিলিত হতে পারে (meeting up around the back)। তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো একটি বদ্ধ পৃষ্ঠ তৈরি করবে। তিনটি স্থানিক অভিমুখ এবং কাল্পনিক কাল এমন একটি স্থান-কাল তৈরি করবে যেটা নিজের উপরেই বদ্ধ তবে তার কোনও কিনারা কিংবা সীমানা থাকবে না। শুরু কিংবা শেষ বলা যায় এরকম কোনও বিন্দু তার থাকবে না। ভূ-পৃষ্ঠের যেমন কোনও শুরু কিংবা শেষ নেই অন্তত তার চাইতে বেশি কিছু এর থাকবে না।

1983 সালে আমি আর জিম হার্টল (Jim Hartle) প্রস্তাব করেছিলাম – মহাবিশ্বের ইতিহাসগুলির যোগফলকে বাস্তব কালে ইতিহাসগুলির যোগফলরূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। বরং গ্রহণ করা উচিত কাল্পনিক কালের ইতিহাসগুলি – তারা ভূ-পৃষ্ঠের মতো নিজের উপরে বদ্ধ। যেহেতু এই ইতিহাসগুলির কোনও অনন্যতা কিংবা কোনও শুরু কিংবা কোনও শেষ ছিল না, সেইজন্য কি ঘটেছিল সেটা স্থির হবে শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি দিয়ে।

এর অর্থ কাল্পনিক কালে কি ঘটেছিল সেটা গণনা করা যায় এবং আপনি যদি কাল্পনিক কালে মহাবিশ্বের ইতিহাস জানেন তাহলে বাস্তব কালে এর আচরণ আপনি গণনা করতে পারবেন। এইভাবে আপনি একটি পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার আশা করতে পারেন। সে তত্ত্ব মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। আইনস্টাইন জীবনের শেষভাগ ব্যয় করেছেন এ রকম একটি তত্ত্ব অনুসন্ধান করে। এ রকম তত্ত্ব আইনস্টাইন খুঁজে পাননি – তার কারণ কণাবাদী বলবিদ্যায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ইতিহাসগুলির যোগফলের মতো মহাবিশ্বের বহু বিকল্প ইতিহাসের সম্ভাবনা তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ইতিহাসের যোগফল কি করে সঠিকভাবে করতে হয় সেটা এখনও আমরা জানি না তবে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে কাল্পনিক কাল এবং স্থান-কালের নিজের উপর বদ্ধ থাকার কল্পন এর সঙ্গে জড়িত থাকবে। আমার মনে হয় আগামী প্রজন্মের কাছে বিশ্ব গোলাকৃতি এই কল্পনের মতোই উল্লিখিত কল্পনগুলি স্বাভাবিক মনে হবে। কাল্পনিক কাল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে আজকাল খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু কাল্পনিক কালের গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী কিংবা গাণিতিক চাতুর্যের চাইতে বেশি। এ কল্পন এমন জিনিস যা আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি সেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে।

নয়

মহাবিশ্বের উৎপত্তি *

মহাবিশ্বের উৎপত্তির সমস্যা অনেকটা সেই প্রাচীন প্রশ্নের মতো : প্রথম কি হয়েছিল? ডিম না বাচ্চা? অন্য কথায় কোন্ কর্মক (agency) মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিল এবং সেই কর্মক কে সৃষ্টি করেছিল? কিংবা হয়ত মহাবিশ্ব কিংবা যে কর্মক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিল তার অস্তিত্ব চিরদিনই ছিল – তাদের সৃষ্টি করার দরকার হয়নি। আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের প্রবণতা ছিল এ ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার। তাঁরা ভাবতেন এগুলি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্নগুলি অধিবিদ্যা (metaphysics) কিংবা ধর্মের অধিকারে। গত কয়েক বছরে কিন্তু এ মতের উদ্ভব হয়েছে যে বিজ্ঞানের বিধিগুলি হয়ত মহাবিশ্বের

* ১৯৮৭ সালে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশতবার্ষিকীতে কেম্‌ব্রিজে অনুষ্ঠিত 'মহাকর্ষের তিন শতাব্দী' সভায় দেওয়া বক্তৃতা।

আরম্ভতেও সত্য। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হয়ত নিজেই নিজেকে ধারণ করেছিল (self-contained) এবং বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ামক।

মহাবিশ্বের কোনও আরম্ভ ছিল কি না এবং থাকলে সে আরম্ভটা কিভাবে হয়েছে এ বিতর্ক চলেছে লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকে। মূলত চিন্তাধারা ছিল দুটি। বহু প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ইহুদি, ক্রীশ্চান আর ইস্‌লামিক ধর্মের মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বেশ নিকট অতীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশপ উসার (Bishop Ussher) হিসাব করে বলেছিলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল ৪০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ওল্ড টেস্টামেন্টের লোকেদের বয়স যোগ করে তিনি এই হিসাব পেয়েছিলেন। মহাবিশ্বের জন্ম অদূর অতীতে – একটি তথ্য এ কল্পন সমর্থন করে। সেটা হল মানবজাতি যে সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসরমান, স্পষ্ট প্রতীয়মান এই তথ্য - তার স্বীকৃতি। আমরা স্মরণ করি কোন্ কাজ কে প্রথম করেছে কিংবা কোন্ প্রযুক্তি কে বিকশিত করেছে। যুক্তিটা হল : সেইজন্য আমাদের অস্তিত্ব বেশিদিনের নয়, তা না হলে আমাদের যা অগ্রগতি হয়েছে তার চাইতেও বেশি অগ্রগতি হ'ত। আসলে বাইবেলের সৃষ্টির তারিখ এবং শেষ তুষার যুগ শেষ হওয়ার তারিখের ভিতরে খুব বেশি দূরত্ব নেই। মনে হয় সেই সময়ই আধুনিক মানবজাতি দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতো কিছু লোক মহাবিশ্বের যে একটা আরম্ভ ছিল এ চিন্তা পছন্দ করেননি। তাঁদের মনে হয়েছিল এর নিহিতার্থ হবে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ। মহাকালের অস্তিত্ব চিরকাল রয়েছে এবং থাকবে এই বিশ্বাসই তাঁদের পছন্দ ছিল। যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার চাইতে যা চিরন্তন সেটা অনেক বেশি নিখুঁত। উপরে উল্লিখিত মানব প্রগতির যুক্তির একটা প্রত্যুত্তর তাঁদের ছিল : মাঝে মাঝে বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মনুষ্যজাতিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

দুটি চিন্তাধারাতেই বিশ্বাস ছিল মহাবিশ্ব মূলত কালের সঙ্গে অপরিবর্তনশীল। হয় মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় এইরূপই ছিল কিংবা আজ যেমন আছে চিরকালই সেরকম ছিল। এটা ছিল একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস, তার কারণ মানবজীবন, এমন কি লিখিত ইতিহাসের সম্পূর্ণটাই এত সংক্ষিপ্ত যে, মানুষের জীবনকালে মহাবিশ্বের কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। একটা সুস্থিত অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব চিরন্তন, না অতীতে কোনও সীমিত কালে এর সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রশ্ন অধিবিদ্যা কিংবা ধর্মের ব্যাপার। যে কোনও তত্ত্বই ঐরকম মহাবিশ্বের কারণ দেখাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট

(Immanuel Kant) একটি উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য বই লিখেছিলেন 'The Critique of Pure Reason'। সে বইয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, মহাবিশ্বের কেন একটা আরম্ভ ছিল এবং কেন আরম্ভ ছিল না - এই দুটি মতেরই সপক্ষে এবং বিপক্ষে সমান অকাট্য যুক্তি আছে। শিরোনাম থেকে বোঝা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল শুধুমাত্র যুক্তি। অন্য কথায় বলা যায় তাঁরা মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের উপর কোনও গুরুত্ব দেননি। আসলে একটি অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বে পর্যবেক্ষণ করার আছেটা কি?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু পৃথিবী এবং বাকী মহাবিশ্ব যে কালের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ জমতে লাগল। ভূ-তত্ত্ববিদরা বুঝতে পারলেন প্রস্তর এবং সেগুলির ভিতরকার জীবাশ্ম সৃষ্টি হতে বহু কোটি কিংবা অর্বুদ বৎসর লেগেছে। এই কাল, সৃষ্টকদিগের (creations) গণনা করা পৃথিবীর বয়সের চাইতে অনেক বেশি। আরও সাক্ষ্য পাওয়া গেল তথাকথিত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি থেকে। এই বিধিটি গঠন করেছিলেন জার্মান পদার্থবিদ লুডভিক বোল্‌জম্যান (Ludwig Boltzmann)। এ বিধি বলে : মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলার মোট পরিমাণ কালের সঙ্গে সবসময়ই বর্ধমান [এটাকে একটি রাশি দিয়ে মাপা হয় তাকে বলা হয় 'এনট্রপি' (entropy)]। মানবিক অগ্রগতির যুক্তির মতো এই যুক্তিও বলে মহাবিশ্বের শুধুমাত্র সসীম কালে অস্তিত্ব থাকারই সম্ভাবনা, তাছাড়া মহাবিশ্ব এতদিনে অপজাত হয়ে (degenerated) সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পৌঁছাত এবং সবটাই একই তাপাঙ্কে পৌঁছাত।

সুস্থিত মহাবিশ্বের কল্পন সম্পর্কে আরেকটি অসুবিধা: নিউটনের (Newton) মহাকর্ষ বিধি অনুসারে মহাবিশ্বের প্রতিটি তারকাই অন্য প্রতিটি তারকাকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করছে। তাই যদি হয় তাহলে তারা পরস্পর থেকে স্থির দূরত্বে থেকে কি করে গতিহীন হতে পারে? তাদের কি একসঙ্গে পতন হবে না?

নিউটন এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রিচার্ড বেন্টলি (Richard Bentley) নামে তখনকার একজন অগ্রগণ্য দার্শনিককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে এ বিষয়ে তিনি একমত : সীমিত সংখ্যক তারকাসমূহ গতিহীন হয়ে থাকতে পারে না, তারা কোনও কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়বে। তবে তাঁর যুক্তি ছিল অসীম সংখ্যক তারকাসমূহ একসঙ্গে পতিত হবে না। তার কারণ, পতিত হওয়ার মতো কোনও কেন্দ্রবিন্দু তাদের থাকবে না। অসীম তন্ত্র

(infinite system) নিয়ে কেউ আলোচনা করতে গেলে তিনি কিরকম চোরাবালিতে আটকে যেতে পারেন এই যুক্তি তারই একটি উদাহরণ। মহাবিশ্বের অসীম সংখ্যক অন্য তারকাগুলি থেকে আগত প্রতিটি তারকার উপর বল বিভিন্ন পদ্ধতিতে যোগ করে তারকাগুলি পরস্পর থেকে স্থির দূরত্বে থাকতে পারে কিনা – এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া সম্ভব । এখন আমরা জানি সঠিক পদ্ধতিটি হল তারকাগুলির সীমিত অঞ্চল নিয়ে বিচার করা এবং তারপর তার সঙ্গে আরও তারকা যোগ করা। সেই তারকাগুলি ঐ অঞ্চলের বাইরে মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত। তারকাগুলির একটি সীমিত সংগ্রহ একত্রে পতিত হবে এবং নিউটনীয় বিধি অনুসারে অঞ্চলের বাইরে অধিকতর সংখ্যক তারকা যোগ করলে চুপসে যাওয়া বন্ধ হবে না। সুতরাং অসীম সংখ্যক তারকাসংগ্রহ গতিহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। এককালে যদি তারা পরস্পর সাপেক্ষ চলমান না হয় তাহলে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে তারা পরস্পরের উপরে পতিত হতে শুরু করবে। বিকল্পে তারা পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ করতে পারে, সেক্ষেত্রে মহাকর্ষ তাদের অপসরণের বেগ শ্লথতর করবে।

সুস্থির এবং অপরিবর্তনীয় মহাবিশ্বের কল্পন সম্পর্কে এই অসুবিধাগুলি থাকলেও সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ প্রস্তাব কেউ করেননি যে কালের সঙ্গে মহাবিশ্বেরও বিবর্তন হতে পারে। নিউটন এবং আইনস্টাইন দু'জনেই মহাবিশ্ব হয় প্রসারিত হচ্ছে না হয় সঙ্কুচিত হচ্ছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগ হারিয়েছেন। নিউটনকে এ জন্য দোষ দেওয়া যায় না কারণ নিউটন জীবিত ছিলেন প্রসারমান মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণভিত্তিক আবিষ্কারের আড়াইশ' বছর আগে। কিন্তু ব্যাপারটা আইনস্টাইনের বোঝা উচিত ছিল। ১৯১৫ সালে তিনি যে ব্যাপক অপেক্ষবাদ গঠন করেছিলেন তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল–মহাবিশ্ব প্রসারমান। কিন্তু সুস্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর এতই বিশ্বাস ছিল যে তিনি নিউটনের তত্ত্ব এবং মহাকর্ষকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর তত্ত্বে একটি উপাদান যোগ করেন।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল্ (Edwin Hubble)-এর মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কারের ফলে এর উৎপত্তি সম্পর্কীয় আলোচনায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। আপনি যদি নীহারিকাগুলি সম্পর্কে আধুনিক মত মেনে নেন এবং সেগুলিকে কালে পশ্চাৎগামী করে চালিয়ে দেন তাহলে মনে হয় দশ থেকে কুড়ি হাজার মিলিয়ন বছর আগে কোনও এক মুহূর্তে সবগুলি নীহারিকাই (galaxy) একটা

আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ত। এই সময় অর্থাৎ বৃহৎ বিস্ফোরণ নামক অনন্যতায়, মহাবিশ্বের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতা হ'ত অসীম। ঐ রকম অবস্থায় জ্ঞাত সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিধি ভেঙে পড়বে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা একটা সর্বনাশা দুর্ঘটনা (disaster)। এর অর্থ বিজ্ঞান, মহাবিশ্ব কি করে শুরু হল সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত না। বিজ্ঞান শুধুমাত্র বলতে পারে, মহাবিশ্ব এখন যে রকম সেই রকমই আছে। অতীতে যে রকম ছিল সেই রকমই ছিল। কিন্তু মহাবিশ্ব বৃহৎ বিস্ফোরণের ঠিক পর যেমন ছিল কেন সেরকম ছিল সেটা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক বৈজ্ঞানিকই খুশি হননি – তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেইজন্য অনেকবার চেষ্টা হয়েছে – বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা একটা ছিল সুতরাং সময়েরও একটা আরম্ভ ছিল – এ সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে যেতে। একটা ছিল তথাকথিত স্থায়ী অবস্থা তত্ত্ব (steady state theory)। কল্পনটি ছিল : নীহারিকাগুলি যেমন পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ করে তেমনি যে পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে অন্তর্বর্তী স্থানে নতুন নীহারিকা সৃষ্টি হবে। মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল এবং আজ যে রকম অবস্থা মোটামুটি সেই অবস্থাতেই চিরকাল তার অস্তিত্ব চলতে থাকবে।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চলতে থাকা এবং নতুন পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার জন্য স্থায়ী অবস্থা প্রতিরূপের প্রয়োজন ছিল ব্যাপক অপেক্ষবাদের একটা পরিবর্তন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সৃষ্টির হার ছিল অত্যন্ত অল্প : বছরে প্রতি ঘন কিলোমিটারে প্রায় একটি কণিকা – এর সঙ্গে পর্যবেক্ষণফলের কোনও দ্বন্দ্ব হবে না। তত্ত্বের আরও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল : নীহারিকা এবং সমরূপ বস্তুপিণ্ডগুলির গড় ঘনত্ব স্থানে এবং কালে স্থির থাকবে। তবে কেম্‌ব্রিজে মার্টিন রাইল (Martin Ryle) এবং তাঁর সহকর্মীদের করা আমাদের নীহারিকার বাইরে থেকে আসা বেতার তরঙ্গগুলির উৎস জরিপ থেকে দেখা যায় শক্তিশালী উৎসগুলির চাইতে ক্ষীণ উৎসগুলির সংখ্যা অনেক বেশি। আশা করা যায় ক্ষীণ উৎসগুলি গড়ে অনেক বেশি দূরের। সুতরাং দুটি সম্ভাবনা ছিল। হয় আমরা এমন অঞ্চলে আছি যেখানে শক্তিশালী উৎসের বারংবারতা গড় বারংবারতার চাইতে কম (less frequent average)। কিংবা অতীতে যখন আলোক অধিক দূরত্বে অবস্থিত ছিল, উৎসগুলি থেকে যখন আমাদের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে তখন উৎসগুলির ঘনত্ব আরও বেশি ছিল। স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বেতার উৎসের ঘনত্ব স্থানে এবং কালে অচর (constant) হবে। উপরে

উল্লিখিত কোনও সম্ভাবনাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে খাপ খায় না। এই তত্ত্বের উপর মরণ আঘাত হেনেছিলেন ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) এবং রবার্ট উইলসন (Robert Wilson). তাঁরা আমাদের নীহারিকা থেকে বহু দূরের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পশ্চাৎপট আবিষ্কার করেছিলেন। এই বিকিরণের ছিল উষ্ণ বস্তুপিণ্ড থেকে নির্গত বিকিরণের বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণালী। যদিও এক্ষেত্রে উষ্ণ কথাটি ঠিক প্রযোজ্য নয় তার কারণ তাপমাত্রা ছিল চরম শূন্য থেকে মাত্র ২.৭ ডিগ্রী বেশি। মহাবিশ্ব একটি শীতল অন্ধকারময় জায়গা। স্থায়ী অবস্থা তত্ত্বে এমন কোনও যুক্তিসহ ব্যবস্থা ছিল না যার দ্বারা ঐরকম বর্ণালীযুক্ত মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এ তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে হল।

১৯৬৩ সালে ইভজেনী লিফ্‌শিজ্ (Evgenii Lifshitz) এবং আইজাক খালাতনিকভ্ (Isaac Khalatnikov) নামে দু'জন রুশ বৈজ্ঞানিক একটি কল্পন উপস্থিত করেন। সে কল্পনে বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা এড়ানো যেত। তাঁরা বলেছিলেন অসীম ঘনত্বের অবস্থা শুধুমাত্র হতে পারত যদি নীহারিকাগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর থেকে দূরে কিংবা পরস্পরের অভিমুখে চলমান থাকত। শুধুমাত্র সেইসময়ই তারা অতীতে একবিন্দুতে মিলিত হতে পারত তবে নীহারিকাগুলির সামান্য পার্শ্বমুখী গতিবেগও থাকতে পারত এবং এর জন্য হয়ত অতীতে মহাবিশ্বের একটি সঙ্কোচন দশার সম্ভাবনা থাকত। সেই দশায় নীহারিকাগুলি হয়ত পরস্পরের খুবই কাছে এসেছে। কিন্তু কোনওভাবে পরস্পরকে আঘাত করা এড়িয়ে গিয়েছে। সেই সময় মহাবিশ্ব অসীম ঘনত্বের অবস্থায় না গিয়ে হয়ত আবার সম্প্রসারিত হয়েছে ।

লিফ্‌শিজ্ এবং খালাতনিকভ্ যখন এই প্রস্তাবগুলি দিয়েছিলেন তখন আমি ছিলাম একজন গবেষণাকারী ছাত্র। আমি তখন এমন একটি সমস্যা খুঁজছিলাম যা নিয়ে কাজ করে আমি নিজের পি. এইচ. ডি. থিসিস্‌টা শেষ করতে পারি। আমার আকর্ষণ ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণ অনন্যতা হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে । কারণ সেটি ছিল মহাবিশ্বের উৎপত্তি বোঝার পক্ষে বিনিশ্চায়ক। রজার পেনরোজ আর আমি এই সমস্যা এবং অন্যান্য এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন এক কেতা গাণিতিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা দেখিয়েছিলাম ব্যাপক অপেক্ষবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে মহাবিশ্বের যে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রতিরূপেরই শুরু হতে হবে একটা অনন্যতা দিয়ে। এর অর্থ : বিজ্ঞান বলতে পারে মহাবিশ্বের একটা অনন্যতা ছিল কিন্তু কিভাবে

মহাবিশ্বের শুরু হওয়ার কথা সেটা বলতে পারে না। সেজন্য দরবার করতে হবে ঈশ্বরের কাছে।

অনন্যতা সম্পর্কে মতামতের আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা বেশ আকর্ষণীয়। আমি যখন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ছিলাম তখন প্রায় কেউই এগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করত না। এখন অনন্যতা উপপাদ্যগুলির ফলে প্রায় সবাই বিশ্বাস করে, মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল অনন্যতা দিয়ে এবং সেসময় পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি ভেঙে পড়েছিল। তবে আমার এখন মনে হয় যদিও অনন্যতা একটি রয়েছে তবুও পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি স্থির করতে পারে কি করে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল।

কণিকাগুলির নির্ভুলভাবে সংজ্ঞিত অবস্থান এবং গতিবেগ থাকে না — কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি বলে তারা একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রলিপ্ত থাকে (smeared out)। কণাবাদী বলবিদ্যা অবস্থান এবং বেগ যুগপৎ মাপন অনুমোদন করে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদ এই তথ্যগুলিকে ধর্তব্য বলে গ্রহণ করে না। সেইজন্য যাকে চিরায়ত তত্ত্ব বলা হয় ব্যাপক অপেক্ষবাদ সেইরকমই একটা তত্ত্ব। এর ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও অসুবিধা হয় না, তার কারণ স্থান-কালের বক্রতার ব্যাসার্ধ কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তার তুলনায় খুবই বৃহৎ। তবে অনন্যতা উপপাদ্যগুলির ,নির্দেশ : মহাবিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণ দশার প্রারম্ভে বক্রতার ব্যাসার্ধ থাকবে ক্ষুদ্র এবং স্থান-কাল অত্যন্ত বেশি বিকৃত হবে। এই অবস্থায় অনিশ্চয়তার নীতি হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং অনন্যতার ভবিষ্যদ্বাণী করে ব্যাপক অপেক্ষবাদ নিজেই নিজের পতন ঘটিয়েছে। মহাবিশ্বের প্রারম্ভ নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন কণাবাদী বলবিদ্যা এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদকে সংযুক্ত করে এরকম একটা তত্ত্ব।

সেই তত্ত্বটা কণাবাদী মহাকর্ষ (quantum gravity)। সঠিক কণাবাদী মহাকর্ষ তত্ত্ব নির্ভুল কি রূপ নেবে আমরা এখনও জানি না। আপাতত যে তত্ত্ব সবচাইতে ভাল প্রার্থী তার নাম অতিতন্তু তত্ত্ব (theory of superstring)। কিন্তু এখনও এমন কয়েকটা সমস্যা আছে যার সমাধান হয়নি। তার ভিতর একটা হল আইনস্টাইনের কল্পন : মহাকর্ষের ক্রিয়ার প্রতিরূপ হতে পারে, এমন একটা স্থান-কাল যেটা তার ভিতরকার পদার্থ এবং শক্তির দ্বারা বক্র কিংবা বিকৃত হয়েছে অথবা জড়িয়ে গিয়েছে। এই বক্রস্থানে বস্তুপিণ্ডগুলি ঋজুরেখার নিকটতম পথে যেতে চেষ্টা করে। তবে স্থানটা বঙ্কিম হওয়ার দরুন মনে হয় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যেন তাদের বঙ্কিম করে দিয়েছে।

পরম তত্ত্বের (ultimate theory) আর একটি উপাদান অর্থাৎ রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রস্তাব আমরা আশা করতে পারি। সে প্রস্তাবে বলা বয়েছে কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে আমরা 'বহু ইতিহাসের যোগফল' (sum over histories) রূপে গঠন করতে পারি। এর সরলতম রূপে কল্পনটি হল : স্থান-কালে প্রতিটি কণিকারই সম্ভাব্য সবরকম পথ কিংবা ইতিহাস রয়েছে। প্রতিটি পথ কিংবা ইতিহাসেরই একটা সম্ভাব্যতা আছে। সেটা নির্ভর করে তার আকারের (shape) উপর। এই কল্পনকে কার্যকর করতে হলে, যে বাস্তব কালে আমরা বেঁচে আছি বলে অনুভব করি সে কালে বিচার না করে আমাদের কাল্পনিক কালে যে ইতিহাস ঘটে সেগুলি বিচার করতে হবে। কাল্পনিক কালকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অংশের মতো শোনাতে পারে কিন্তু এটি একটি সুসংজ্ঞিত গাণিতিক ধারণা (a well-defined mathematical concept) । এক অর্থে একে কালের একটি অভিমুখরূপে ভাবা যেতে পারে। সে অভিমুখ বাস্তব কালের সমকোণে। বিশেষ কয়েকটি ধর্ম সমন্বিত কণিকার ইতিহাসগুলির সম্ভাব্যতা যোগ করা হয়। ধর্মটি হতে পারে বিশেষ কয়েকটি কালে বিশেষ কয়েকটি বিন্দুর ভিতর দিয়ে গমন করা। তারপর আমরা যে স্থান-কালে বাস করি যোগফলটিকে সেই স্থান-কালে বহির্বেশন (extrapolate) করতে হয়। কণাবাদী বলবিদ্যায় সবচাইতে পরিচিত অভিগমন (approach) এটা নয় তবে এ পদ্ধতিতে অন্য পদ্ধতির মতো একই ফল পাওয়া যায়।

কণাবাদী মহাকর্ষের ক্ষেত্রে ফাইনম্যানের ইতিহাসগুলির যোগফলের কল্পনের সঙ্গে জড়িত থাকবে মহাবিশ্বের অর্থাৎ বিভিন্ন বক্র স্থান-কালের সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির যোগফল। এগুলি হবে মহাবিশ্ব এবং তার অন্তর্গত সমস্ত জিনিসের প্রতিনিধি। ইতিহাসের এই যোগফলের ভিতরে কোন্ শ্রেণীর সম্ভাব্য বক্রস্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই শ্রেণীর স্থান নির্বাচনই নির্ধারণ করবে মহাবিশ্ব কোন্ অবস্থায় আছে, যে শ্রেণীর বক্র স্থান মহাবিশ্বের অবস্থা সংজ্ঞিত করে। অনন্যতা সমন্বিত স্থান যদি তার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে ঐ ধরনের স্থানের সম্ভাবনা তত্ত্ব দিয়ে নির্ধারিত হবে না। তার বদলে কোনও যাদৃচ্ছিক উপায়ে সম্ভাব্যতাগুলিকে আরোপ করতে হবে। এর অর্থ বিজ্ঞান স্থান-কালের এই ধরনের একক ইতিহাসগুলির সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। অর্থাৎ মহাবিশ্বের কি আচরণ হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। তবে এ সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, মহাবিশ্ব এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থা একটা যোগফল দিয়ে

সংজ্ঞিত, যার অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র অনেকক (nonsingular) বঙ্কিম স্থানগুলি। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিধিগুলিই মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করবে। কি করে মহাবিশ্বের প্রারম্ভ সেটি নির্ধারণ করার জন্য মহাবিশ্ব বহির্ভূত কোনও কর্মকের (agency) দ্বারস্থ হতে হবে না। একদিক দিয়ে মহাবিশ্বের অবস্থা শুধুমাত্র অনেকক ইতিহাসগুলির যোগফল দিয়ে নির্ধারিত হয় – এই প্রস্তাব মাতালের ল্যাম্প পোস্টের (আলোক স্তম্ভ) নিচে চাবি খোঁজার মতো। যেখানে সে চাবিটা হারিয়েছে ওটা সে জায়গা না হতে পারে কিন্তু ওটাই একমাত্র জায়গা যেখানে তার চাবিটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একইভাবে বলা যায় মহাবিশ্ব অনেকক ইতিহাসগুলির যোগফল দিয়ে সংজ্ঞিত হতে পারে এরকম অবস্থায় না থাকতে পারে কিন্তু এটাই একমাত্র অবস্থা যেখানে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে মহাবিশ্বের কি অবস্থায় থাকা উচিত।

১৯৮৩ সালে আমি এবং জিম হার্টল (Jim Hartle) প্রস্তাব করেছিলাম মহাবিশ্বের অবস্থা একটি বিশেষ শ্রেণীর ইতিহাসগুলির যোগফল দিয়ে প্রকাশ পাওয়া উচিত। এই শ্রেণীতে থাকবে বঙ্কিম স্থান কিন্তু তাতে কোনও অনন্যতা থাকবে না। এদের আকার সীমিত থাকবে কিন্তু এদের কোনও সীমানা কিংবা কিনারা থাকবে না। এগুলি হবে ভূ-পৃষ্ঠের মতো সসীম কিন্তু তাদের আরও দুটি মাত্রা থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠের এলাকা সসীম কিন্তু এর কোনও অনন্যতা, সীমানা কিংবা কিনারা নেই। এটি আমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে বিচার করে দেখেছি। আমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছি কিন্তু কখনও পড়ে যাইনি।

আমি আর জিম হার্টল্ যে প্রস্তাব করেছিলাম তাকে এই বাগ্বিধিতে প্রকাশ করা যায় : মহাবিশ্বের সীমান্তের অবস্থা এমন যে তার কোনও সীমানা নেই। মহাবিশ্ব যদি শুধুমাত্র এই সীমানাবিহীন অবস্থায় থাকে তাহলেই বিজ্ঞানের বিধিগুলি স্বকীয়ভাবে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ইতিহাসের সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ শুধুমাত্র এইরকম ক্ষেত্রেই জানিত বিধিগুলি নির্ধারণ করবে মহাবিশ্বের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত। মহাবিশ্ব যদি অন্য কোনও অবস্থায় থাকে তাহলে ইতিহাসগুলির যোগফলের যে শ্রেণীতে বঙ্কিম স্থানগুলি পড়বে তার অন্তর্ভুক্ত হবে অনন্যতা সমন্বিত স্থানগুলি। ঐরকম অনন্য ইতিহাসগুলির ((singular histories) সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে হলে বিজ্ঞানের জানিত বিধিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও নীতিকে আহ্বান জানাতে হবে। এই নীতি (principle) হবে আমাদের মহাবিশ্ব বহির্ভূত একটা কিছু। আমাদের মহাবিশ্বের ভিতর থেকে আমরা সে সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারি না। অন্য দিকে

মহাবিশ্ব যদি সীমানাবিহীন অবস্থায় থাকে তাহলে মহাবিশ্বের আচরণ আমরা সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতে পারি -- অবশ্য অনিশ্চয়তা নীতি নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত।

মহাবিশ্ব যদি সীমানাবিহীন অবস্থায় থাকত তাহলে বিজ্ঞানের পক্ষে খুবই ভাল হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাবিশ্ব ঐ অবস্থায় আছে কিনা, কি করে আমরা বলব? এর উত্তর হল : সীমানাহীনতার প্রস্তাব মহাবিশ্বের আচরণ কি রকম হবে সে সম্পর্কে কতগুলি নির্দিষ্ট নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সঙ্গে যদি পর্যবেক্ষণফলের অনৈক্য হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি মহাবিশ্ব সীমানাহীন অবস্থায় নেই। সুতরাং দার্শনিক কার্ল পপার (Karl Popper) সংজ্ঞিত অর্থে সীমানাহীনতার প্রস্তাব একটি উত্তম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এ তত্ত্বকে অপ্রমাণ করা যায় কিংবা মিথ্যা প্রমাণ করা যায়।

পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যদি ভবিষ্যদ্বাণীর মতানৈক্য হয় তাহলে আমরা জানব সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির শ্রেণীর ভিতরে অনন্যতা অবশ্যই আছে। তবে ঐটুকুই আমরা জানতে পারব। আমরা একক ইতিহাসগুলির সম্ভাব্যতা গণনা করতে পারব না সুতরাং মহাবিশ্বের আচরণ কি রকম হবে সে সম্পর্কেও আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। ভাবা যেতে পারে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার অভাব যদি শুধুমাত্র বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় হয় তাহলে খুব বেশি কিছু আসবে যাবে না। কারণ ঘটনাটা তো এক হাজার কিংবা দু'হাজার কোটি বছর আগেকার ব্যাপার। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা যদি বৃহৎ বিস্ফোরণের অত্যন্ত শক্তিশালী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে ভেঙে পড়ে তাহলে যখনই একটি তারকা চুপসে যায় তখনও এটা ভেঙে পড়তে পারে। শুধু আমাদের ছায়াপথেই এ ঘটনা ঘটতে পারে সপ্তাহে কয়েকবার।

অবশ্য, বলা যেতে পারে একটা দূরস্থিত তারকায় যদি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ভেঙে পড়ে তাহলে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে – যা সত্যই নিষিদ্ধ নয় তা ঘটতে পারে এবং ঘটবে। উদাহরণ : অনন্যতা সম্পর্কিত স্থান যদি সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে অনন্যতা যে কোনও জায়গাতেই ঘটতে পারে -- শুধুমাত্র বৃহৎ বিস্ফোরণে এবং চুপসে যাওয়া তারকাতেই নয়। এর অর্থ হবে : আমরা কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই করতে পারতাম না। বিপরীতে (conversely) আমরা ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি এই তথ্যই অনন্যতাগুলির বিপক্ষে এবং সীমানাহীনতার প্রস্তাবের সপক্ষে পরীক্ষাভিত্তিক সাক্ষ্য।

তাহলে সীমানাহীনতার প্রস্তাব মহাবিশ্ব সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করে? এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য : যেহেতু মহাবিশ্বের সমস্ত ইতিহাসগুলিই বিস্তারের দিক দিয়ে সসীম (finite in extent), সেইজন্য কালের মাপনের জন্য যে রাশিই ব্যবহার করা হোক না কেন সে রাশির একটি বৃহত্তম, একটি ন্যূনতম মূল্যাঙ্ক থাকবে। সুতরাং মহাবিশ্বের একটি প্রারম্ভ থাকবে এবং একটি অন্ত থাকবে। বাস্তব কালে প্রারম্ভ হবে বৃহৎ বিস্ফোরণ অনন্যতা। তবে কাল্পনিক কালের প্রারম্ভ একটি অনন্যতা হবে না, তার বদলে এটা হবে অনেকটা পৃথিবীর উত্তর মেরুর মতো। যদি অক্ষাংশের ডিগ্রীকে (degree of latitude) কালের পৃষ্ঠে (surface of time) কালের সমরাশি (analogue) রূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে ভূ-পৃষ্ঠ শুরু হয় উত্তর মেরুতে। তবুও উত্তর মেরু পৃথিবীর একটি নিখুঁত সাধারণ বিন্দু। উত্তর মেরুর বিশেষত্ব কিছু নেই। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যে বিধি সত্য উত্তর মেরুতেও সে বিধিগুলি সত্য। একইভাবে বলা যায়, যে ঘটনাকে 'কাল্পনিক কালে মহাবিশ্বের আরম্ভ' বলে নির্বাচন করে চিহ্নিত করতে পারি সেটা হবে স্থান-কালের একটা সাধারণ বিন্দু – যে কোনও অন্য বিন্দুর মতোই। অন্যান্য স্থান-কালের (elsewhere) মতোই প্রারম্ভে বিজ্ঞানের বিধি সত্য হবে।

ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে উপমা থেকে আশা করা যায় মহাবিশ্বের অন্ত প্রারম্ভের মতোই হবে, ঠিক যেমন উত্তর মেরু অনেকটা দক্ষিণ মেরুর মতো। তবে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু মহাবিশ্বের ইতিহাসে প্রারম্ভ এবং অন্তের অনুরূপ। শুধু কাল্পনিক কালে, যে বাস্তব কাল আমরা অনুভব করি সেই বাস্তব কালে নয়। আমরা যদি ইতিহাসের যোগফলটি কাল্পনিক কাল থেকে বাস্তব কালে বহির্বেশন করি (extrapolation) তাহলে দেখা যাবে বাস্তব কালে মহাবিশ্বের প্রারম্ভ তার অন্ত থেকে খুবই পৃথক হতে পারে।

জোনাথন হ্যালিওয়েল (Jonathan Halliwell) এবং আমি সীমানাবিহীন অবস্থার নিহিতার্থ কি হবে সে সম্পর্কে একটা আসন্ন গণনা (approximate calculation) করেছিলাম। আমরা মহাবিশ্বকে বিচার করেছিলাম একটি নিখুঁত মসৃণ এবং সমরূপ পশ্চাৎপটরূপে। তার ভিতরে ঘনত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচরণ (perturbations) ছিল। বাস্তব কালে মনে হয় মহাবিশ্ব তার সম্প্রসারণ শুরু করবে অতিক্ষুদ্র ব্যাসার্ধ থেকে। প্রথমে সম্প্রসারণ হবে যাকে বলা হয় অতিস্ফীতি, সেইরকম : মহাবিশ্ব এক সেকেণ্ডের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশে আকারে দ্বিগুণ হবে, ঠিক যেমন অনেক দেশে মূল্যমান প্রতিবছরে দ্বিগুণ হয়।

অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতির বিশ্বরেকর্ড বোধহয় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর। সে দেশে একটা পাঁউরুটির দাম কয়েক মার্ক থেকে বেড়ে কয়েক মাসে কয়েক মিলিয়ন মার্কে পৌঁছায়, কিন্তু মনে হয় আদিম মহাবিশ্বে যে অতিস্ফীতি হয়েছিল (inflation) তার তুলনায় এই মুদ্রাস্ফীতি কিছুই নয় : এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ভিতরে আকার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল এক মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়িন, মিলিয়ন, মিলিয়ন গুণ। অবশ্য সেটা হয়েছিল বর্তমান সরকারের আগে।

অতিস্ফীতি ব্যাপারটা ভালই হয়েছিল কারণ এর ফলে এমন একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হল যেটা বৃহৎ মানে ছিল মসৃণ এবং সমরূপ, আবার চুপসে যাওয়া এড়ানোর জন্য সম্প্রসারণ হচ্ছিল ঠিক ক্রান্তিক হারে। এই অতিস্ফীতি অন্যদিক দিয়েও ভাল জিনিসই ছিল। তার কারণ এর ফলে উৎপন্ন হয়েছিল মহাবিশ্বের সমস্ত আধেয় (content - অন্তর্বস্তু)। এ সৃষ্টি হয়েছিল আক্ষরিক অর্থে শূন্যতা থেকে। মহাবিশ্ব যখন উত্তর মেরুর মতো একক বিন্দু ছিল তখন এর কোনও অন্তর্বস্তু ছিল না, কিন্তু এখন মহাবিশ্বের যে অংশ আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাতে রয়েছে অন্তত $১০^{৮০}$ কণিকা। এই সমস্ত কণিকা এল কোথা থেকে? উত্তরটা হল : অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যা শক্তি থেকে বস্তু সৃষ্টি অনুমোদন করে। বস্তুটি সৃষ্টি হয় কণিকা, বিপরীত কণিকা জোড় রূপে। তাহলে এই পদার্থসৃষ্টির জন্য শক্তি কোথা থেকে এল? উত্তরটা হল শক্তিটা ধার করা হয়েছিল মহাকর্ষীয় বলের কাছ থেকে। অপরা (negative) মহাকর্ষীয় শক্তির কাছে মহাবিশ্বের একটা বিরাট ঋণ রয়েছে – তার সঙ্গে পদার্থের পরা শক্তির ভারসাম্য নিখুঁত (exactly balances)। অতিস্ফীতির যুগে আরও পদার্থ সৃষ্টি করার অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য মহাবিশ্ব মহাকর্ষীয় শক্তির কাছ থেকে বিরাট ঋণ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে হয়েছিল কীন্‌স্‌-এর অর্থনীতির জয় : একটা বীর্যবান এবং সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আর সেটা ছিল নানা পদার্থে পরিপূর্ণ। মহাবিশ্বের অন্তিম কালের আগে পর্যন্ত এই মহাকর্ষীয় ঋণ শোধ করতে হবে।

আদিম মহাবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে সমসত্ত্ব এবং সমরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না,কারণ তাহলে কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি ভেঙে যেত। তার বদলে সমরূপ ঘনত্ব থেকে নিশ্চয়ই কিছু বিচ্যুতি হয়েছে। সীমানাহীনতার প্রস্তাবের নিহিতার্থ হল ঘনত্বের এই পার্থক্য শুরু হবে একদম নীচুতলা থেকে অর্থাৎ তারা হবে যত ক্ষুদ্র সম্ভব। অবশ্য অনিশ্চয়তার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। অতিস্ফীতিরূপ সম্প্রসারণের সময় কিন্তু পার্থক্যের বিবর্ধন (amplification)

হবে। অতিস্ফীতিরূপ সম্প্রসারণের যুগ শেষ হওয়ার পর এমন একটা মহাবিশ্ব রইল যেটা কোনও কোনও জায়গায় অন্য জায়গার তুলনায় দ্রুততর সম্প্রসারিত হচ্ছিল। যে সব অঞ্চলে সম্প্রসারণ শ্লথতর ছিল সেই সমস্ত অঞ্চলে পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সম্প্রসারণকে আরও শ্লথ করে দেবে। শেষে ওই অঞ্চলে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঞ্চলটা নীহারিকা এবং তারকা গঠন করার জন্য সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সুতরাং আমরা আমাদের চারপাশে যে সমস্ত গঠন দেখতে পাই সেগুলির কারণ হতে পারে সীমানাহীনতার প্রস্তাব। তবে এই প্রস্তাব মহাবিশ্ব সম্পর্কে শুধুমাত্র একটা ভবিষ্যদ্বাণীই করে না, তার বদলে এর ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকে সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির সম্পূর্ণ একটা গোষ্ঠী। এর প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সম্ভাব্যতা আছে। ইতিহাসের একটি সম্ভাবনা হতে পারে : গত নির্বাচনে লেবার পার্টি জিতেছিল। অবশ্য তার সম্ভাব্যতা খুবই কম।

সীমানাহীনতার প্রস্তাবের মহাবিশ্বের ব্যাপারে ঈশ্বরের ভূমিকা বিষয়ে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এখন সাধারণত মেনে নেওয়া হয় সুসংজ্ঞিত বিধি অনুসারে মহাবিশ্ব বিবর্তিত হয়। এই বিধিগুলি ঈশ্বরের আদেশে হয়েছে – এটা হতে পারে। কিন্তু তিনি এখন আর আইনভঙ্গ করার জন্য মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন না। তবে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই বিধিগুলি মহাবিশ্বের আরম্ভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঘুড়ির মতো মহাবিশ্বকে গুটিয়ে নিয়ে তাঁর যেমন খুশি সেইভাবে মহাবিশ্বকে আবার শুরু করা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সুতরাং মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা হবে ঈশ্বরের প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনের ফল।

যদি সীমানাহীনতার প্রস্তাব নির্ভুল হয় তাহলে কিন্তু পরিস্থিতিটা খুবই পৃথক হবে। সেক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি মহাবিশ্বের আরম্ভেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য মহাবিশ্ব যে বিধিগুলি মেনে চলে সে বিধিগুলি নির্বাচন করার স্বাধীনতা তাঁর থাকত। তবে নির্বাচনের খুব বেশি কিছু হয়ত থাকত না, হয়ত খুব অল্পসংখ্যক বিধি থাকত। সে বিধিগুলি নিজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমাদের মতো জটিল জীব সৃষ্টির পথিকৃৎ। সেই জীবেরা প্রশ্ন করতে পারে : ঈশ্বরের চরিত্র (nature) কিরকম।

যদি অদ্বিতীয় এক কেতা বিধিই থাকে সেটা শুধুমাত্র এক কেতা সমীকরণ। সেই সমীকরণগুলিতে প্রাণসঞ্চার করে কে? কে তা থেকে একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে, যে মহাবিশ্ব তারা পরিচালনা করতে পারে? পরম ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব কি

এমনই শক্তিশালী যে সে নিজেই নিজের অস্তিত্ব সৃষ্টি করে? যদিও বিজ্ঞান হয়ত মহাবিশ্ব কি করে সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার সমাধান করতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ; মহাবিশ্ব অস্তিমান হওয়ার ঝামেলা কেন নিয়েছে? আমিও তার উত্তর জানি না।

দশ

কৃষ্ণগহ্বরের কণাবাদী বলবিদ্যা *

এই শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক তিনটি তত্ত্বের উত্থান দেখেছে। এ তত্ত্বগুলি পদার্থবিদ্যা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন এনেছে। পদার্থবিদরা এখনও এগুলির নিহিতার্থ অনুসন্ধান করছেন আর চেষ্টা করছেন এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। তিনটি তত্ত্ব হল : বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ (১৯০৫), ব্যাপক অপেক্ষবাদ (১৯১৫) এবং কণাবাদী বলবিদ্যার তত্ত্ব (১৯২৬)। প্রথম তত্ত্বটির প্রধান দায়িত্ব ছিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের, দ্বিতীয় তত্ত্বটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর এবং তৃতীয় তত্ত্বটির বিকাশে একটা প্রধান ভূমিকা ছিল আইনস্টাইনেরই, তবুও আইনস্টাইন কখনওই কণাবাদী বলবিদ্যাকে মেনে নেননি। তার কারণ এ তত্ত্বে আপতন (chance) এবং অনিশ্চয়তার উপস্থিতি। তাঁর মনের ভাব প্রকাশ পায় তাঁর বহু উল্লিখিত বিবৃতিতে : 'ঈশ্বর জুয়া খেলেন না।' অধিকাংশ পদার্থবিদই কিন্তু বিশিষ্ট

*১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ।

অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যা সহজেই মেনে নিয়েছিলেন, তার কারণ এ তত্ত্বগুলির দেওয়া বিবরণ প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। অন্যদিকে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, কারণ তত্ত্বটিকে মনে হয়েছিল গাণিতিকভাবে খুবই জটিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এর সত্যতা পরীক্ষা করা যায় না এবং এটা ছিল একটা বিশুদ্ধ চিরায়ত তত্ত্ব যার সঙ্গে কণাবাদী বলবিদ্যাকে মানিয়ে নেওয়া যায় না। সেইজন্য, প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ব্যাপক অপেক্ষবাদ নিয়ে কেউ বিশেষ নাড়াচাড়া করেনি।

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যবেক্ষণ খুবই বাড়তে শুরু করে। ফলে ব্যাপক অপেক্ষবাদের চিরায়ত তত্ত্বে আকর্ষণ পুনরুজ্জীবিত হয়। তার কারণ কোয়াসার (quasar), পালসার (pulsar) এবং ঘনবিন্যস্ত X - রশ্মির উৎস (compact X-Ray sources)-এর মতো যে সমস্ত নতুন পরিঘটনা আবিষ্কৃত হচ্ছিল, সেগুলির ইঙ্গিত ছিল অতি শক্তিশালী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বের। এই ক্ষেত্রগুলির বিবরণ শুধুমাত্র ব্যাপক অপেক্ষবাদের সাহায্যেই দেওয়া যেতে পারে। কোয়াসাররা তারকার মতো বস্তুপিণ্ড তবে সেগুলি নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ নীহারিকাগুলির চাইতে বহু গুণ উজ্জ্বল। অবশ্য তাদের বর্ণালীর রক্তিমতা যা নির্দেশ করে ওগুলি যদি ঐরকম দূরত্বে অবস্থিত হয় তাহলে। পালসারগুলি সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশিষ্টাংশ। এগুলি দ্রুতহারে মিটমিট করে। বিশ্বাস করা হয় পালসারগুলি অতি ঘন নিউট্রন তারকা। ঘনসন্নিবিষ্ট X- রশ্মির উৎসগুলি মহাকাশযানের ভিতরকার যন্ত্রপাতি দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিও নিউট্রন তারকা হতে পারে। কিংবা হতে পারে আরও উচ্চতর ঘনত্ববিশিষ্ট প্রকল্পিত বস্তুপিণ্ড (hypothetical objects) অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বর।

যে পদার্থবিদরা এই নব আবিষ্কৃত কিংবা প্রকল্পিত বস্তুপিণ্ডগুলিতে ব্যাপক অপেক্ষবাদ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের একটা সমস্যা ছিল এই তত্ত্বকে কণাবাদী বলবিদ্যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। গত কয়েক বছরে এমন কিছু উন্নয়ন হয়েছে, যা থেকে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা মহাকর্ষের একটা সুসঙ্গত কণাবাদী তত্ত্ব পাব। এই তত্ত্বের স্থূলসত্বক (macroscopic) বস্তুপিণ্ডগুলি সাপেক্ষ ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে মতৈক্য থাকবে এবং আশা করা যায়, এগুলি গাণিতিক অসীমত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। এই অসীম তত্ত্বগুলি অন্যান্য কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বগুলির ঘাড়ে বহুদিন ভূতের মতো চেপে বসে আছে। এই বিকাশগুলির অধুনা আবিষ্কৃত কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত কোয়াণ্টাম ক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে হবে। কৃষ্ণগহ্বরগুলির এবং তাপগতিবিদ্যার বিধিগুলিকে

উল্লেখযোগ্যভাবে সংযুক্ত করে এই বিকাশগুলি।

কি করে কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি হতে পারে সেটা আমি সংক্ষেপে বলছি। সূর্যের চাইতে দশ গুণ ভরসম্পন্ন একটা তারকা কল্পনা করুন। এর জীবনকাল হবে প্রায় এক হাজার কোটি বছর। এর অধিকাংশ সময়ই তারকাটি অক্সিজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তর করে নিজের কেন্দ্রে তাপ উৎপন্ন করবে। মুক্ত শক্তি তারকাটিকে তার নিজস্ব মহাকর্ষ থেকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে, এমন একটা বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি হবে যার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের পাঁচ গুণ। ঐ রকম একটা তারকার পৃষ্ঠ থেকে পলায়ন করে মুক্ত হওয়ার মতো গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ যদি তারকাটির পৃষ্ঠ থেকে একটা বস্তুপিণ্ডকে উল্লম্বভাবে সেকেণ্ডে ১০০০ কি.মি.-র কম গতিবেগে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে সেটাকে তারকার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র টেনে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবে এবং সেটা তারকার পৃষ্ঠে ফিরে আসবে। তবে এর চাইতে বেশি গতিবেগসম্পন্ন একটা বস্তুপিণ্ড অসীমে মুক্ত হবে।

তারকাটির কেন্দ্রকীয় (nuclear) জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তার বহির্মুখচাপ রক্ষা করার মতো কিছু থাকবে না এবং তারকাটি তার নিজস্ব মহাকর্ষের ফলে চুপসে যেতে শুরু করবে। তারকাটি যেমন সঙ্কুচিত হবে পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রও ততই শক্তিশালী হবে এবং পলায়নের গতিবেগ (escape velocity) বৃদ্ধি পাবে। ব্যাসার্ধ ৩০ কি.মি-তে নেমে এলে পলায়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি.মি হবে অর্থাৎ আলোকের গতিবেগের সমান হবে। তারপর থেকে নির্গত কোনও আলোকই অসীমে নিষ্ক্রমণ করতে পারবে না। সে আলোক মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের আকর্ষণে আবার ফিরে আসবে। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ অনুসারে আলোকের চাইতে বেশি গতিবেগে কিছুই চলাচল করতে পারবে না। সুতরাং আলোক যদি নিষ্ক্রমণ করতে না পারে, তাহলে আর কিছুই সেখান থেকে নিষ্ক্রমণ করতে পারবে না।

এর ফল হবে একটা কৃষ্ণগহ্বর : স্থান-কালের একটা অঞ্চল যেখান থেকে অসীমে নিষ্ক্রমণ সম্ভব নয়। কৃষ্ণগহ্বরের সীমানার নাম ঘটনা দিগন্ত। আলোকের যে তরঙ্গমুখ তারকা থেকে অসীমে নিষ্ক্রমণ করতে বিফল হয় সেটা কিন্তু সোয়ার্জচাইল্ড (Schwarzchild) ব্যাসার্ধ থেকে চলাচল করে। ব্যাসার্ধটা হল, $2GM/\sqrt{c}$। এখানে G নিউটনের মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। M হল তারকাটির ভর এবং C আলোকের গতিবেগ। সূর্যের ভরের দশগুণ ভরসম্পন্ন একটা তারকার সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ প্রায় ৩০ কিলোমিটার।

সিগনাস এক্স-1(Cygnus X-1) নামক এক্স রশ্মির উৎসের মতো দ্বি-তারকাতন্ত্রের ভিতরে এই জাতীয় কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের অভিভাবন করার (suggest) মতো যথেষ্ট ভাল সাক্ষ্য প্রমাণ এখন রয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক অধিকতর ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর হয়ত মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এগুলি তারকা চুপসে গিয়ে সৃষ্টি হয়নি ; হয়েছে উত্তপ্ত ঘন মাধ্যমের অত্যন্ত উচ্চচাপগ্রস্ত অঞ্চল চুপসে যাওয়াতে। যে বৃহৎ বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিস্ফোরণের স্বল্পকাল পরে ঐরকম উত্তপ্ত ঘন মাধ্যম ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। যে কোয়াণ্টাম ক্রিয়ার বিবরণ আমি এখানে দেব সেই কোয়াণ্টাম ক্রিয়া সাপেক্ষ এই 'আদিম' কৃষ্ণগহ্বরগুলির বৃহত্তম গুরুত্ব রয়েছে। এক হাজার কোটি টন ভরের (প্রায় একটা পর্বতের ভরের সমান) একটা কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার (একটা নিউট্রন কিংবা প্রোটনের আকার)। এটা একটা সূর্য প্রদক্ষিণ কক্ষে থাকতে পারে কিংবা থাকতে পারে একটা নীহারিকাকেন্দ্র প্রদক্ষিণ কক্ষে।

কৃষ্ণগহ্বর এবং তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। এ সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিত এসেছিল ১৯৭০ সালের একটা গাণিতিক আবিষ্কারের পর। এই আবিষ্কার অনুসারে ঘটনা দিগন্তের পৃষ্ঠের (surface) ক্ষেত্রফল অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের সীমানার (boundary) একটা ধর্ম হল কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর যখন অপর (additional) পদার্থ কিংবা বিকিরণ পতিত হয় তখন সবসময়ই কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যদি দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষের পর তারা একটি কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করে তাহলে যে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হবে তার ঘটনা দিগন্ত বেষ্টনীর যে ক্ষেত্রফল হবে সেটা আগেকার কৃষ্ণগহ্বর দুটির ঘটনা দিগন্তের বেষ্টনীর ক্ষেত্রফলের যোগফলের চাইতে বেশি হবে। এই ধর্মগুলি থেকে অভিভাবন করা যায় একটি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে তাপগতিবিদ্যার এনট্রপি (entropy) কল্পনের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। তাপগতিবিদ্যার বিখ্যাত দ্বিতীয় বিধি বলে এনট্রপি সবসময়ই কালের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণগহ্বরের ধর্মগুলির সঙ্গে তাপগতিবিদ্যার ধর্মগুলির সাদৃশ্য ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্ এম. বার্দিন (James M. Bardeen), মিউডন অবজারভেটরীর (Meudon Observatory) ব্র্যাণ্ডন কার্টার এবং আমি সম্প্রসারিত করেছি। তাপগতিবিদ্যার প্রথম বিধি বলে একটা তন্ত্রের এনট্রপির

সামান্য পরিবর্তনের সঙ্গে তন্ত্রটির শক্তির আনুপাতিক পরিবর্তন হয়। আনুপাতিকতার উপাদানকে (factor of proportionality) বলা হয় তন্ত্রটির তাপমাত্রা। বার্দিন, কার্টার এবং আমি দেখলাম কৃষ্ণগহ্বরের ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলের পরিবর্তনের একটা সদৃশ বিধি পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আনুপাতিকতার উপাদানের সঙ্গে একটা রাশি জড়িত। তার নাম পৃষ্ঠ মহাকর্ষ (surface gravity)। পৃষ্ঠ মহাকর্ষ ঘটনা দিগন্তের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে শক্তির একটা মান (measure)। যদি মেনে নেওয়া যায় ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফল এনট্রপির সঙ্গে তুলনীয় তাহলে মনে হবে পৃষ্ঠ মহাকর্ষ তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনীয়। দেখা যায় পৃষ্ঠ মহাকর্ষ ঘটনা দিগন্তের প্রত্যেক বিন্দুতেই এক। ঠিক যেমন যে বস্তুপিণ্ডের তাপের সুস্থিতি রয়েছে (thermal equilibrium) তার প্রতিটি বিন্দুতেই তাপমাত্রা এক। এই তথ্য উপরে উল্লিখিত সাদৃশ্যকে আরও শক্তিশালী করে।

যদিও এনট্রপি এবং ঘটনা দিগন্তের একটা স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে তবুও ঐ অঞ্চলকে কি করে কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি বলে শনাক্ত করা যায় সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান ছিল না। কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি কথাটির অর্থ কি হয়? বিনিশ্চায়ক অভিভাবন (crucial suggestion) করেছিলেন জেকব ডি. বেকেনস্টাইন (Jecob D. Bekenstieh) ১৯৭২ সালে। তিনি তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি রয়েছেন ইজরায়েলের নেগেভ (Negev) বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যাপারটা এইরকম হয়-- মহাকর্ষের ফলে চুপসে গিয়ে যখন কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হয় তখন সেটা দ্রুত একটা সুস্থিত অবস্থায় স্থিতি লাভ করে (settles down to a stationary state)। এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র তিনটি স্থিতিমাপ (parameters)—ভর, কৌণিক ভরবেগ এবং বৈদ্যুৎ আধান। এই তিনটি ধর্ম ছাড়া যে বস্তুগুলি চুপসে গিয়েছে তার অন্য কোনও বিস্তৃত বিবরণ কৃষ্ণগহ্বর রক্ষা করে না। এই সিদ্ধান্ত 'একটা কৃষ্ণগহ্বরের কোনও লোম নেই' নামক উপপাদ্য দিয়ে পরিচিত। এই উপপাদ্য প্রমাণ করা হয়েছিল কার্টার (Carter), অ্যালবার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্নার ইজরায়েল, লণ্ডনের কিংস্ কলেজের ডেভিড সি. রবিনসন এবং আমার সংযুক্ত গবেষণার দ্বারা।

লোমহীনতার উপপাদ্যের নিহিতার্থ : মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়ার সময় বিরাট পরিমাণ সংবাদ হারিয়ে যায়। উদাহরণ : কৃষ্ণগহ্বরের অন্তিম অবস্থা—যে বস্তুপিণ্ড চুপসে গিয়েছে সেটা পদার্থ কিংবা বিপরীত পদার্থের দ্বারা গঠিত ছিল;

কিংবা সেটা গোলীয় ছিল অথবা অত্যন্ত অনিয়মিত গঠনের ছিল--তার সঙ্গে সম্পর্কহীন। অন্য কথায় একটা নির্দিষ্ট ভর, কৌণিক ভরবেগ এবং বৈদ্যুৎ আধান সমন্বিত কৃষ্ণগহ্বর বহুসংখ্যক বিভিন্ন গঠনের পদার্থ চুপসে যাওয়ার ফলে হওয়া সম্ভব। সত্যি কোয়াণ্টাম ক্রিয়াকে যদি অগ্রাহ্য করা যায় তাহলে আকারের (configurations) সংখ্যা হতে পারে অসীম। কারণ কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হয়ে থাকতে পারে অনিশ্চিত বৃহৎ সংখ্যক, অনিশ্চিত স্বল্প ভরের কণিকাগুলির মেঘ চুপসে যাওয়ার ফলে।

কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির নিহিতার্থ কিন্তু বলে- m ভরসম্পন্ন একটা কণিকার আচরণ হবে h/mc তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন একটা তরঙ্গের মতো। এক্ষেত্রে h প্লাঙ্ক (Plank)-এর ধ্রুবক (ক্ষুদ্রসংখ্যা ৬.৬২ $\times 10^{-27}$ সেকেণ্ড) এবং C আলোকের গতিবেগ। একটি কণিকামেঘের চুপসে গিয়ে একটি কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করার সামর্থ্য পেতে হলে মনে হয় এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হবে তার চাইতে ক্ষুদ্র হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—একটা নির্দিষ্ট ভর, কৌণিক ভরবেগ এবং বৈদ্যুতিক আধানসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করতে পারে এরকম আকৃতির (configuration) সংখ্যা খুব বেশি হলেও অসীম নয়। বেকেনস্টাইনের অভিভাবন ছিল এই সংখ্যার লগারিদ্‌ম (logarithm)-কে একটা কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি রূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংখ্যাটির লগারিদ্‌ম হবে কৃষ্ণগহ্বর যখন সৃষ্টি হয় তখন যে সংবাদগুলি ঘটনা দিগন্তের ভিতর দিয়ে হারিয়ে গিয়ে উদ্ধারের অতীত হয়েছিল তার পরিমাণের একটা মাপ।

বেকেনস্টাইনের অভিভাবনের আপাতদৃষ্ট মারাত্মক ভুল ছিল : যদি একটা কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে আনুপাতিক সান্ত এনট্রপি থাকে তাহলে তার পৃষ্ঠ মহাকর্ষের সঙ্গে আনুপাতিক সান্ত (finite) তাপমাত্রাও থাকা উচিত। এর নিহিতার্থ : একটি কৃষ্ণগহ্বর শূন্য ছাড়া অন্য যে কোনও তাপমাত্রায় তাপ বিকিরণের সঙ্গে সুস্থিত থাকতে পারে (in equilibrium)। অথচ চিরায়ত কল্পন অনুসারে এরকম কোনও সুস্থিত অবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ কৃষ্ণগহ্বরের উপর যে তাপ বিকিরণই পড়বে তাকেই সে বিশোষণ করে নেবে কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে তার পরিবর্তে সে কিছু উৎসর্জন (emit) করতে পারবে না।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই কূটাভাসের (paradox) অস্তিত্ব ছিল। সেই সময়

আমার গবেষণার বিষয় ছিল : কণাবাদী বলবিদ্যা অনুসারে কৃষ্ণগহ্বরের নিকটবর্তী পদার্থের আচরণ কি হবে? আমি আবিষ্কার করলাম কৃষ্ণগহ্বর স্থির হারে কণিকা উৎসর্জন করে বলে মনে হয়। এ আবিষ্কারে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। সেই সময় অন্য সবার মতো আমি এই অনুশাসন বাক্য (dictum) মেনে নিয়েছিলাম যে কৃষ্ণগহ্বর কিছু উৎসর্জন করতে পারে না। তাইতে বোকা হয়ে যাওয়ার মতো এই অভিক্রিয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি খুবই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই অভিক্রিয়া যেতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে মেনেই নিলাম। এটা যে একটি বাস্তব ভৌতপদ্ধতি শেষ পর্যন্ত সেটা আমাকে বিশ্বাস করাল এই তথ্য : যে কণিকাগুলি নির্গত হয় তার বর্ণালী নির্ভুলভাবে তাপীয় (thermal)। কৃষ্ণগহ্বর সাধারণ তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো কণিকা সৃষ্টি করে এবং উৎসর্জন করে। তার তাপমাত্রা পৃষ্ঠ মহাকর্ষের আনুপাতিক এবং ভরের ব্যস্ত আনুপাতিক (inversly proportional)। এর ফলে বেকেনস্টাইনের অভিভাবন কৃষ্ণগহ্বরের সান্ত এনট্রপি আছে--সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। তার কারণ এর নিহিতার্থ হল কৃষ্ণগহ্বর শূন্য ছাড়া কোনও একটা সান্ত তাপমাত্রায় তাপীয় সুস্থিতি লাভ করতে পারে।

তারপর থেকে কৃষ্ণগহ্বরগুলি তাপীয় উৎসর্জন করতে পারে এ তথ্যের গাণিতিক সাক্ষ্য অনেকের দ্বারাই সপ্রমাণিত হয়েছে। তাদের সমাধানের পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন। উৎসর্জন বোঝার একটি উপায় কণাবাদী বলবিদ্যার নিহিতার্থ অনুসারে সমগ্র স্থান (space) কণিকা এবং বিপরীত কণিকার জোড়ে পূর্ণ। সবসময়ই তারা জোড়ে জোড়ে সৃষ্ট হচ্ছে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে আবার নিকটবর্তী হচ্ছে এবং পরস্পরকে বিনাশ করছে। এই কণিকাগুলিকে কল্পিত কণিকা বলার কারণ বাস্তব কণিকাগুলির মতো এগুলিকে কণিকা অভিজ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্যে (particle detector) প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। সে যাই হোক, তাদের পরোক্ষ অভিক্রিয়া কিন্তু মাপা যায়। তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে একটি ক্ষুদ্র স্থানচ্যুতি (shift) দিয়ে (ল্যাম্ব শিফ্‌ট্ — Lamb shift)। কল্পিত কণিকাগুলি উত্তেজিত হাইড্রোজেন পরমাণুর আলোক বর্ণালীতে এই বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতিতে একজোড়া কল্পিত কণিকার একটি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হতে পারে-ফলে জোড়ের অন্যটির বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার মতো কোনও অংশীদার থাকে না। পরিত্যক্ত কণিকা কিংবা বিপরীত কণিকা তার জোড় কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হওয়ার পর নিজেও কৃষ্ণগহ্বরে পড়তে পারে তবে

সেটা ছাড়া পেয়ে অসীমেও গমন করতে পারে। সেখানে তাদের মনে হবে কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জন করা বিকিরণ।

এই ক্রিয়া দেখবার আরেকটি উপায় জোড়ের যে কণিকাটি কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে—ধরুন সেটা বিপরীত কণিকা—সেটাকে কালে পশ্চাৎমুখী চলমান বাস্তবিক কণিকাই ভাবা। অর্থাৎ যে বিপরীত কণিকা কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হচ্ছে সেটাকে ভাবা যায় কৃষ্ণগহ্বর থেকে আগন্তুক একটি কণিকা কিন্তু সেটা কালে পশ্চাৎমুখী চলমান। যে বিন্দুতে কণিকা-বিপরীত কণিকা জোড় প্রথমে বাস্তবায়িত হয়েছিল কণিকাটি যখন সেই বিন্দুতে পৌঁছায় তখন সেটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের দ্বারা বিক্ষেপিত (scattered) হয় ফলে সেটা কালে সম্মুখে চলমান হয়।

সুতরাং কণাবাদী বলবিদ্যা একটি কণিকার কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর থেকে নিষ্ক্রমণ অনুমোদন করে। চিরায়ত বলবিদ্যা এরকম অনুমোদন করে না। তবে পারমাণবিক এবং কেন্দ্রকীয় পদার্থবিদ্যায় এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে এমন কতগুলি বাধা রয়েছে যেগুলি চিরায়ত নীতি অনুসারে কণিকাগুলি ভেদ করতে পারে না। কিন্তু কণাবাদী বলবিদ্যার নীতি অনুসারে সেগুলি সুড়ঙ্গপথে (tunnel through) যেতে পারে।

কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশের বাধার স্থূলতা কৃষ্ণগহ্বরের আকারের আনুপাতিক। এর অর্থ সিগনাস X—১ (Cygnus X—1) এ বিদ্যমান বলে প্রকল্পিত কৃষ্ণগহ্বরের আকারের কৃষ্ণগহ্বর থেকে খুব সামান্য সংখ্যক কণিকাই নিষ্ক্রমণ করতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর কৃষ্ণগহ্বর থেকে তারা দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে। বিস্তৃত গণনায় দেখা যায় নির্গত কণিকাগুলির এমন একটি তাপীয় বর্ণালী রয়েছে যেটা তাপমাত্রার অনুরূপ। সেই তাপমাত্রা কৃষ্ণগহ্বর ভরের হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সূর্যের ভরের মতো ভরসম্পন্ন একটি কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা চরম শূন্যের এক কোটি ভাগের একভাগ মাত্র। কৃষ্ণগহ্বর থেকে এই তাপমাত্রার তাপীয় বিকিরণ মহাবিশ্বের বিকিরণের সাধারণ পশ্চাৎপটে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে। অন্যদিকে মাত্র একশ' কোটি টন ভরের একটি কৃষ্ণগহ্বর অর্থাৎ একটি প্রোটনের আকারে আদিম একটি কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা হবে বারো হাজার কোটি কেলভিন্ (Kelvin), এটা এক কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তির অনুরূপ। এইরকম তাপমাত্রার একটি কৃষ্ণগহ্বর ইলেকট্রন পজিট্রনের জোড় সৃষ্টি করতে পারবে এবং সৃষ্টি করতে পারবে ফোটন। নিউট্রিনো এবং গ্র্যাভিটনের (অনুমিত মহাকর্ষীয় শক্তি বহনকারী কণিকা) মতো শূন্য ভরসম্পন্ন কণিকা। একটি আদিম কৃষ্ণগহ্বর ছয় হাজার মেগাওয়াট হারে শক্তি মুক্ত

করবে। এই পরিমাণ শক্তি চারটি বড় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদনের সমান ।

কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা উৎসর্জন হলে কৃষ্ণগহ্বরটির ভর এবং আকার স্থির হারে হ্রাস পায়। এর ফলে আরও অধিকসংখ্যক কণিকার ছিদ্রপথে নির্গমন সহজতর হয় এবং এই নির্গমন ক্রমবর্ধমান হারে চলতে থাকে যতক্ষণ না এই নির্গমনের ফলে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের সমস্ত কৃষ্ণগহ্বরই এইভাবে উবে যায়। তবে একটি বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে এই উবে যাওয়ার কাল সত্যিই খুব দীর্ঘ। সূর্যের সমান ভরসম্পন্ন একটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব প্রায় ১০^{৬৬} বৎসর। অন্যদিকে একটি আদিম কৃষ্ণগহ্বরে বৃহৎ বিস্ফোরণের পরে যে এক হাজার কোটি বৎসর অতীত হয়েছে (যাকে আমরা কালের আরম্ভ বলে জানি) তার ভিতরেই প্রায় সম্পূর্ণ উবে গিয়েছে। এইরূপ কৃষ্ণগহ্বর এখন প্রায় দশ কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের সমান শক্তিসম্পন্ন কঠিন গামা রশ্মি উৎসর্জন করবে।

SAS-2 নামক উপগ্রহের গামা রশ্মি বিকিরণের মহাজাগতিক পশ্চাৎপট মাপনের ভিত্তিতে করা ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তখন কর্মরত ডন এন. পেজ (Don N. Page) এবং আমার গণনা অনুসারে দেখা যায় মহাবিশ্বে আদিম কৃষ্ণগহ্বরের গড় ঘনত্ব নিশ্চয়ই হবে প্রতি ঘন আলোক বৎসরে প্রায় দুইশত-র কম। যদি কৃষ্ণগহ্বরগুলি নীহারিকাগুলির 'জ্যোতিষচক্রে' (halo) কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে আমাদের নীহারিকায় স্থানীয় ঘনত্ব হতে পারে এই রাশির দশ লক্ষ গুণ বেশি। জ্যোতিষচক্র বলতে বোঝায় দ্রুত চলমান তারকাগুলির যে পাতলা মেঘে নীহারিকাগুলি ডুবে রয়েছে সেইগুলি। নীহারিকাগুলি সমগ্র মহাবিশ্বে সমভাবে বণ্টিত নয়। এর নিহিতার্থ হল পৃথিবীর নিকটতম আদিম কৃষ্ণগহ্বরের দূরত্ব হবে অন্ততপক্ষে প্লুটোগ্রহের দূরত্বের সমান।

কৃষ্ণগহ্বরের উবে যাওয়া শেষ অবস্থায় এত দ্রুত হবে যে, এর অন্ত হবে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে। এই বিস্ফোরণ কতটা শক্তিশালী হবে সেটা নির্ভর করবে কতরকম শ্রেণীর মৌলকণা এর ভিতরে আছে তার উপরে। বহুলোকের এখন বিশ্বাস সবরকম মৌলকণাই হয়ত গঠিত হয় দু'রকম বিভিন্ন কার্ক দিয়ে। এ বিশ্বাস যদি সত্য হয় তাহলে অন্তিম বিস্ফোরণের শক্তি হবে এক কোটি এক মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার সমান। অন্যদিকে সার্ন (CERN অর্থাৎ জেনেভায় অবস্থিত কেন্দ্রকীয় গবেষণার জন্য ইউরোপীয় সংগঠন)-এর আর. হ্যাগেডর্ন (R. Hagedorn) একটি বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর যুক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর অসীম সংখ্যক মৌলকণা আছে। একটি কৃষ্ণগহ্বর যত ক্ষুদ্রতর এবং তপ্ততর হবে ততই সেটা বৃহত্তর এবং বৃহত্তর সংখ্যক বিভিন্ন জাতির কণিকা উৎসর্জন করবে এবং এমন একটি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করবে যেটা কার্ক প্রকল্পের

ভিত্তিতে গণনা করা বিস্ফোরণের চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। সুতরাং একটা কৃষ্ণগহ্বর পর্যবেক্ষণ থেকে মৌলকণা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যাবে। এ সংবাদ অন্য কোনও উপায়ে পাওয়া নাও যেতে পারে।

একটা কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণে বিরাট পরিমাণ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়ে উপচে পড়বে, যদিও একটা উপগ্রহ কিংবা বেলুনে অবস্থিত গামা রশ্মি অভিজ্ঞাপক (Gamma Ray detectors) যন্ত্রের সাহায্যে এগুলি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে, তবুও একটা বিস্ফোরণ থেকে নির্গত গামা রশ্মি'র ফোটন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ধরার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা আছে এইরকম বৃহৎ আকারের একটা অভিজ্ঞাপক যন্ত্রকে আকাশে ওড়ানো বেশ কঠিন হবে। একটা সম্ভাবনা : স্থানে যাতায়াত করে এরকম যানের সাহায্যে (space shuttle) পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এরকম কক্ষেই একটা বৃহৎ গামা রশ্মি অভিজ্ঞাপক যন্ত্র লাগানো। একটা সহজতর এবং স্বল্পতর ব্যয়বহুল পদ্ধতি হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরকে অভিজ্ঞাপক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা। একটা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ের বর্ষণ সৃষ্টি করবে। প্রথমে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে তার গতি হবে আলোকের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে গতির চাইতে বেশি (বায়ু অণুদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে আলোকের গতি হ্রাস পায়)। এইভাবে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন এক ধরনের স্বরভিত্তিক আকস্মিক বৃদ্ধি (sonic boom) কিংবা বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে অভিঘাত তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। এই ধরনের অভিঘাত তরঙ্গের (shock wave) নাম চেরেনকভ বিকিরণ। এগুলিকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দৃশ্যমান আলোকের ঝলক রূপে চেনা যায়।

ডাবলিনের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নীল এ. পোর্টার (Neil A. Porter) এবং ট্রেভর সি. উইক্স্ (Trevor C. Weekes)-এর প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যদি হ্যাগেডর্ন (Hagedorn)-এর তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণ হয় তাহলে প্রতি ঘন আলোকবর্ষ পিছু, প্রতি শতাব্দীতে নীহারিকা আমাদের অঞ্চলে কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণের সংখ্যা দুই-এর চাইতেও কম হওয়ার কথা। এর নিহিতার্থ হবে আদিম কৃষ্ণগহ্বরের ঘনত্ব, প্রতি ঘন আলোক বৎসরে দশ কোটিরও কম। এই ধরনের পর্যবেক্ষণে সুগ্রাহিতা (sensitivity) অনেক বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব হওয়া উচিত। এতে যদি আদিম কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে কোনও পরা (positive) সাক্ষ্য না পাওয়া যায় তাহলেও তারা খুবই মূল্যবান হবে। ঐরকম কৃষ্ণগহ্বরগুলির ঘনত্বের উচ্চমানের একটা নিম্নসীমা বেঁধে দিয়ে পর্যবেক্ষণগুলি নির্দেশ করবে আদিম মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই অত্যন্ত মসৃণ এবং বিক্ষোভবিহীন (nonturbulant) ছিল।

বৃহৎ বিস্ফোরণ কৃষ্ণগহ্বর বিস্ফোরণের অনুরূপ কিন্তু তার মান তুলনায় অনেক বৃহৎ সুতরাং আশা করা যায় কৃষ্ণগহ্বর কি করে কণিকা সৃষ্টি করে সেটা বোঝা গেলে বৃহৎ বিস্ফোরণ কি করে মহাবিশ্বের সব জিনিস সৃষ্টি করেছিল সেটা বোঝার পথ দেখাবে। কৃষ্ণগহ্বরে পদার্থ চুপসে যায় এবং চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় কিন্তু তার স্থানে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় সুতরাং হতে পারে মহাবিশ্বের একটা পূর্বতন দশা ছিল। সেই দশায় পদার্থ চুপসে গিয়েছিল এবং বৃহৎ বিস্ফোরণে নতুন করে পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল।

যে পদার্থ চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়েছিল তার যদি সব কেটেছেঁটে অবশিষ্ট কোনও বৈদ্যুৎ আধান (net electric charge) থাকে তাহলে ফলস্বরূপ যে কৃষ্ণগহ্বর হল সে কৃষ্ণগহ্বরও ঐ বৈদ্যুৎ আধান বহন করবে। এর অর্থ কৃষ্ণগহ্বর চেষ্টা করবে কল্পিত বৃহৎ কণিকার যে জোড়গুলির বিপরীত আধান থাকবে সেগুলিকে আকর্ষণ করতে এবং যেগুলির আধান সমরূপ থাকবে তাদের বিকর্ষণ করতে। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর পছন্দ করবে সেই কণিকাগুলিকে উৎসর্জন করতে যেগুলির আধানের লিঙ্গ তার নিজের সমরূপ হবে। ফলে তার আধান দ্রুত নিঃশেষ হবে। একইভাবে যে পদার্থগুলি চুপসে যাচ্ছে, তাদের যদি অবশিষ্ট কোনও কৌণিক ভরবেগ (net angular momentum) থাকে তাহলে যে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হবে সেটা ঘূর্ণায়মান হবে এবং পছন্দ করবে যে কণিকাগুলি কৌণিক ভরবেগ বহন করে দূরে অপসরণ করে সেই কণিকাগুলি উৎসর্জন করতে। কৃষ্ণগহ্বরে বৈদ্যুৎ আধান, কৌণিক ভরবেগ এবং যে পদার্থ চুপসে গিয়েছিল তার ভর স্মরণে রাখার (remembers) এবং অন্য সব কিছু ভুলে যাওয়ার (forgets) কারণ এই তিনটি রাশি দীর্ঘ পাল্লা ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে (long range fields) যুগ্মিত : আধানের বেলায় বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র এবং কৌণিক ভরবেগ, আর ভরের বেলায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র।

Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ের রবর্ট এইচ. ডিক (Robert H. Dicke) এবং মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভ্লাদিমির ব্র্যাগিন্স্কি (Vladimir Braginsky), এই দুইজনের গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়--ব্যারিয়ন সংখ্যা (baryon number) নামাঙ্কিত কণাবাদী ধর্মের সঙ্গে জড়িত কোনও দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেত্র নেই (ব্যারিয়ন এক শ্রেণীর কণিকা, প্রোটন এবং নিউট্রনও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত)। সেইজন্য কিছু ব্যারিয়ন সংগ্রহ চুপসে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট কৃষ্ণগহ্বর তার ব্যারিয়ন সংখ্যা ভুলে যাবে এবং সমপরিমাণ ব্যারিয়ন এবং বিপরীত ব্যারিয়ন বিকিরণ করবে। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরটি যখন অদৃশ্য হল, তখন কণিকা পদার্থবিদ্যার সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত বিধিগুলির একটাকে ভঙ্গ করা হল। এই বিধির নাম ব্যারিয়ন সংরক্ষণ বিধি (law of barion conservation)।

কৃষ্ণগহ্বরগুলির একটা সসীম এনট্রপি রয়েছে - বেকেনস্টাইনের এই প্রকল্পের

সামঞ্জস্যের জন্য যদিও কৃষ্ণগহ্বরগুলির তাপীয় বিকিরণ প্রয়োজন কিন্তু প্রথমে মনে হয়, কণিকাসৃষ্টির বিস্তৃত কণাবাদী বলবিদ্যাভিত্তিক গণনায় তাপীয় বর্ণালী সমন্বিত একটা উৎসর্জন সৃষ্টি করবে। এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। এর ব্যাখ্যা : নির্গত কণিকাগুলির কৃষ্ণগহ্বর থেকে সুড়ঙ্গপথে নির্গত হওয়া। যে অঞ্চল থেকে এগুলি নির্গত হয় সে অঞ্চল সম্পর্কে বাইরের একজন পর্যবেক্ষকের তার ভর, কৌণিক ভরবেগ এবং বৈদ্যুৎ আধান ছাড়া কোনও জ্ঞান নেই - উল্লিখিত তথ্যের এটাই ব্যাখ্যা। এর অর্থ যে সমস্ত নির্গত কণিকাগুলির একই শক্তি, কৌণিক ভরবেগ এবং বৈদ্যুৎ আধান রয়েছে, তাদের 'সর্বপ্রকার সংযুক্তি কিংবা আকারের একইরকম সম্ভাবনা রয়েছে'। সত্যিই কৃষ্ণগহ্বরের একটা টেলিভিশন সেট কিংবা দশ খণ্ড চামড়া বাঁধানো প্রাউস্ট (Proust) রচনাবলী উৎসর্জনের সম্ভাবনা আছে কিন্তু কণিকাগুলির যে সংরচনা (configuration) এই উদ্ভট জিনিসগুলির অনুরূপ হবে তার সম্ভাবনা এত অল্প যে প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষুদ্র বলা চলে। যে আকারে কণিকাগুলি উৎসর্জিত হবে সেগুলির বৃহত্তম সংখ্যার বর্ণালী প্রায় তাপীয় বর্ণালীর মতো।

কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জনের কণাবাদী বলবিদ্যার সঙ্গে সাধারণত জড়িত অনিশ্চয়তা কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী করার অক্ষমতার চাইতেও একটু বেশি অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার অক্ষমতা থাকবে। চিরায়ত বলবিদ্যায় কণিকাটির অবস্থান এবং গতিবেগ দুই-ই মাপা সম্ভব। কণাবাদী বলবিদ্যায় অনিশ্চয়তার নীতি বলে এই দুটি মাপনের একটা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। পর্যবেক্ষক কণিকাটির অবস্থান কিংবা গতিবেগ—এই দুটির একটি মাপনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। কিন্তু দুটি সম্পর্কে পারেন না। পরিবর্তে তিনি অবস্থান এবং গতিবেগের একটা সমন্বয়ের মাপনফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের নির্দিষ্ট নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করার সামর্থ্য কার্যক্ষেত্রে অর্ধেক হয়ে যায়। কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপারে পরিস্থিতি আরও খারাপ। যেহেতু কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জিত কণিকাগুলি এমন অঞ্চল থেকে আসে, সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, সেইজন্য তিনি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিতভাবে একটা কণিকার গতিবেগ কিংবা অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না, কিংবা পারেন না এ দুটির সমন্বয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে। তিনি শুধু পারেন কতগুলি কণিকা নির্গত হবে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে। সেইজন্য মনে হয় আইনস্টাইন যখন বলেছিলেন 'ঈশ্বর জুয়া খেলেন না' তখন তাঁর ভুল হয়েছিল দ্বিগুণ। কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জিত কণিকাগুলি বিচার করলে মনে হবে ঈশ্বর শুধুমাত্র জুয়া খেলেন তাই নয়, অনেক সময় তিনি জুয়ার ঘুঁটিগুলি এমন জায়গায় নিক্ষেপ করেন যে সেগুলিকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

এগারো

কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্বসমূহ*

কৃষ্ণগহ্বরের পতন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলির একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে এখন বলা যায় কৃষ্ণগহ্বরগুলি বিজ্ঞানের বাস্তবতার অংশ, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অংশ নয়। এখন আমি বলব কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব আছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ করা সাক্ষ্য সজোরে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের নীহারিকায় একাধিক কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে এবং আরও অনেক রয়েছে অন্যান্য নীহারিকায়।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকদের সত্যিকারের সাফল্য হয়েছে আপনি যদি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হন তাহলে কি হবে সেই ব্যাপারে। একটি সাধারণ অভিভাবন (suggestion) হল কৃষ্ণগহ্বরটি যদি ঘূর্ণায়মান হয় তাহলে আপনি স্থান-কালের ছোট একটি গর্ত দিয়ে পড়ে মহাবিশ্বের অন্য অঞ্চলে গিয়ে উঠতে

* ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিচ্‌কক বক্তৃতা।

পারেন। এর ফলে স্পষ্টতই মহাকাশ ভ্রমণের অনেক সম্ভাবনা খুলে যায়। সত্যিই, অন্য নীহারিকার কথা বাদ দিলেও আমাদের যদি অন্য তারকায় ভ্রমণ ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত করতে হয় তাহলে এরকম একটা কিছু প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, যেহেতু আলোকের চাইতে দ্রুত কিছু চলতে পারে না, সেইজন্য নিকটতম তারকায় যাতায়াতে অন্তত আট বছর লাগবে। আলফা সেঞ্চাওরি (Alpha Centauri)তে সাপ্তাহান্তিক ছুটি কাটানোর ব্যাপারটা এই পর্যন্ত। অন্য দিকে কেউ যদি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর দিয়ে যেতে পারে তাহলে হয়ত সে মহাবিশ্বের যে কোনও জায়গায় ভেসে উঠতে পারে। কি করে গন্তব্যস্থান স্থির করতে হবে সেটা স্পষ্ট নয়। আপনি ছুটি কাটাতে ভার্গো (Virgo) রওনা হয়ে ক্র্যাব (crab) নীহারিকায় গিয়ে শেষ করতে পারেন।

ভবিষ্যৎ নীহারিকায় ভ্রমণকারীদের হতাশ করতে হচ্ছে সেজন্য আমি দুঃখিত। এই দৃশ্যপট অবাস্তব। আপনি যদি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেন তাহলে আপনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন এবং প্রচণ্ড চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপনার অস্তিত্বই মুছে যাবে। তবে একটা অর্থ আছে – সে অর্থে যে কণিকাগুলি দিয়ে আপনার দেহ তৈরি হয়েছে সেই কণিকাগুলি অন্য মহাবিশ্বে গিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। কেউ যদি একটি কৃষ্ণগহ্বরে গিয়ে সেমাই (spaghetti) হয়ে যায় তাহলে তার দেহের কণিকাগুলি হয়ত বেঁচে যেতে পারে - এই সম্ভাবনায় তিনি কোনও সান্ত্বনা পাবেন কিনা তা আমার জানা নেই।

আমি সামান্য হাল্কাভাবে কথাটা বলেছি কিন্তু রচনাটির ভিত্তি কঠিন বিজ্ঞান। আমি যা বলেছি তার বেশির ভাগই এখন এই ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা মেনে নেন তবে এ স্বীকৃতি এসেছে খুবই সম্প্রতি। এই রচনার শেষ অংশটির ভিত্তি কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক গবেষণা এবং এ সম্পর্কে এখনও সাধারণ মতৈক্য হয়নি। কিন্তু এই গবেষণায় প্রচুর আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও আমরা এখন যাকে কৃষ্ণগহ্বর বলি সেই কল্পন প্রায় দুশ' বছরের পুরানো তবুও কৃষ্ণগহ্বর নামটি দিয়েছিলেন আমেরিকান পদার্থবিদ জন হুইলার (John Wheeler) ১৯৬৭ সালে। এই নামকরণ এক মহাপ্রতিভার সাক্ষ্য। এই নামের পরে কৃষ্ণগহ্বর নিশ্চিতভাবে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পুরাণের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই নামের ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উদ্দীপিত হয় তার কারণ আগে যার কোনও সন্তোষজনক নাম ছিল না সে জিনিসের একটি নির্দিষ্ট নিশ্চিত নামকরণ হল। বিজ্ঞানে ভাল একটি নামের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা উচিত

নয়।

আমি যতদূর জানি কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে যিনি প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলেন তাঁর নাম জন মিচেল (John Michell)। তিনি ১৭৮৩ সালে এগুলি সম্পর্কে একটা গবেষণাপত্র লেখেন। তাঁর কল্পনটি ছিল এইরকম - অনুমান করা যাক, আপনি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উল্লম্বভাবে একটি কামানের গোলা ছুঁড়েছেন। উপরে উঠতে উঠতে মহাকর্ষের ক্রিয়ার জন্য এর গতি ক্রমশ হ্রাস পাবে। শেষ পর্যন্ত গোলাটা উপরে যাওয়া বন্ধ করে পৃথিবীতে এসে পড়বে। যদি এটা একটা বিশেষ ক্রান্তিক দ্রুতির চাইতে বেশি দ্রুতিতে চলা শুরু করে থাকে তাহলে এটা কখনওই উপরে ওঠা বন্ধ করে নীচে এসে পড়বে না। গোলাটা তখন অপসরণ করতেই থাকবে। এই ক্রান্তিক দ্রুতির নাম মুক্তির বেগ (escape velocity)। পৃথিবীর ক্ষেত্রে মুক্তির বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৭ মাইল এবং সূর্যের ক্ষেত্রে মুক্তির বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ মাইল। এই দুটো গতিবেগই বাস্তব কামানের গোলার দ্রুতির চাইতে বেশি। কিন্তু আলোর গতিবেগের চাইতে আনেক কম। সে গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এর অর্থ মহাকর্ষের আলোকের উপর বিশেষ কোনও ক্রিয়া নেই। আলোক স্বচ্ছন্দে পৃথিবী কিংবা চন্দ্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। তবে মিচেল যুক্তি দেখিয়েছিলেন এমন কোনও একটা তারকা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যেটা যথেষ্ট ভরসম্পন্ন এবং আকারে যথেষ্ট ক্ষুদ্র। তাহলে তার মুক্তির বেগ হবে আলোকের গতিবেগের চাইতে বেশি। এরকম তারকা আমরা দেখতে পাব না। তার কারণ তার পৃষ্ঠ থেকে আলোক আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। তারকাটা একে নিজস্ব মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে টেনে রাখবে। তবে এই তারকাটির নিকটবর্তী পদার্থের উপরে যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে তার ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা তারকাটির অস্তিত্ব ধরতে পারব।

আলোককে কামানের গোলার মতো বিচার করা বাস্তবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। ১৮৯৭ সালে করা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অনুসারে আলোক সবসময়ই একই অচর গতিবেগে চলাচল করে। তাহলে মহাকর্ষ কি করে আলোকের গতি হ্রাস করবে? ১৯১৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত আলোকের উপর মহাকর্ষের ক্রিয়া সম্পর্কে কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব তৈরি হয়নি। সেই সময় আইনস্টাইন ব্যাপক অপেক্ষবাদ গঠন করেন। তবুও পুরাতন তারকা এবং অন্যান্য উচ্চভরসম্পন্ন বস্তুপিণ্ডগুলি সাপেক্ষ এ তত্ত্বের নিহিতার্থ ১৯৬০-এর দশকের আগে সাধারণভাবে বোধগম্য হয়নি।

ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে ভাবা যেতে পারে স্থান এবং কাল যুক্তভাবে

একটি চারমাত্রিক স্থান গঠন করে, তার নাম স্থান-কাল। এই স্থান সমতল নয়, এটার ভিতরের পদার্থ এবং শক্তির দ্বারা এটা বিকৃত কিংবা বক্র। এই আলো কিংবা রেডিও তরঙ্গগুলি আমাদের কাছে আসবার পথে সূর্যের কাছে চলমান থাকে। তখন এই তরঙ্গগুলির বেঁকে যাওয়া দেখে আমরা এই বক্রতা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আলোকের সূর্যের নিকট দিয়ে গমনের সময় বক্রতা হয় খুবই সামান্য। তবে সঙ্কুচিত হতে হতে তার সূর্যের আকার যদি আড়াআড়ি কয়েক মাইলের ভিতরে এসে যায় তাহলে বক্রতা এত বেশি হবে যে, সূর্যকে যে আলোক পরিত্যাগ করতে চাইছে সে পালাতে পারবে না, সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তাকে পিছন দিকে টেনে রাখবে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে কিছুই আলোকের দ্রুতির চাইতে দ্রুততর গমন করতে পারে না। সুতরাং এমন একটি অঞ্চল থাকবে যেখান থেকে কোনও কিছুর মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে। এই অঞ্চলের নাম হবে কৃষ্ণগহ্বর। এর সীমানাকে বলা হয় ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। যে আলো কৃষ্ণগহ্বর থেকে পালাতে চাইছে কিন্তু পারেনি, শুধুমাত্র বিফল হয়েছে (just fails) কিন্তু কিনারার চারপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই আলো দিয়েই ঘটনা দিগন্ত গঠিত।

সূর্য সঙ্কুচিত হয়ে আড়াআড়িভাবে কয়েক মাইলে দাঁড়াবে এ কথাটা হাস্যকর মনে হতে পারে। মনে হতে পারে পদার্থকে এতটা সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয় কিন্তু দেখা যায় সম্ভব।

সূর্য অত উত্তপ্ত বলেই তার আকার এত বড়। এটা নিয়ন্ত্রিত একটা হাইড্রোজেন বোমার মতো হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়াম করছে। এই প্রক্রিয়াতে যে তাপ মুক্ত হচ্ছে সেই তাপ একটি চাপ সৃষ্টি করে এবং সে চাপ সূর্যকে তার নিজস্ব মহাকর্ষকে বাধা দিতে সক্ষম করে। এই মহাকর্ষ চেষ্টা করে সূর্যকে ক্ষুদ্রতর করতে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে। এ রকম ঘটনা পাঁচশ' কোটি বছরের আগে হবে না। সুতরাং অন্য তারকায় যাওয়ার জন্য টিকিট কাটার কোনও তাড়া নেই। তবে সূর্যের চাইতে অধিক ভরসম্পন্ন তারকাগুলি তাদের জ্বালানী আরও দ্রুত জ্বালিয়ে শেষ করবে। তাদের জ্বালানী যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তার তাপ কমতে থাকবে এবং তারা সঙ্কুচিত হবে। তাদের ভর যদি সূর্যের ভরের প্রায় দ্বিগুণের চাইতে কম হয় তাহলে তারা শেষে সঙ্কুচিত হওয়া বন্ধ করবে এবং একটা সুস্থির অবস্থায় স্থিতি লাভ করবে। এইরকম একটি অবস্থার নাম শ্বেত বামন (white dwarf)। এগুলির ব্যাসার্ধ

কয়েক হাজার মাইল এবং ঘনত্ব প্রতি ঘন ইঞ্চিতে কয়েকশ' টন। এইরকম আরেকটি অবস্থার নাম নিউট্রন তারকা। এগুলির ব্যাসার্ধ প্রায় দশ মাইল কিন্তু এর ঘনত্ব প্রতি ঘন ইঞ্চিতে বহু মিলিয়ন (দশ লক্ষ) টন।

আমাদের নীহারিকায় আমাদের নিকট সান্নিধ্যে বহু শ্বেত বামন আমরা পর্যবেক্ষণ করি। নিউট্রন তারকাগুলি কিন্তু ১৯৬৭ সালের আগে দেখা যায়নি। তখন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেলিন বেল (Jocelyn Bell) এবং অ্যাণ্টনি হিউয়িশ (Antony Hewish) পালসার (pulsar) নামে একরকম বস্তুপিণ্ড আবিষ্কার করেন। সেগুলি থেকে নিয়মিত বেতার তরঙ্গ নির্গত হয়। প্রথমে তাঁরা চিন্তা করেছিলেন আমরা কোনও অপরিচিত সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছি কি না। সত্যি আমার মনে আছে, যে ঘরে এই আবিষ্কার ঘোষণা করার জন্য বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল সেই ঘরটা 'ক্ষুদ্র সবুজ মানুষের' চিত্র দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শেষে কিন্তু তাঁরা এবং আর সবাই অনেক কম রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সে সিদ্ধান্তটা হল এই বস্তুপিণ্ডগুলি ছিল আসলে ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকা। যাঁরা স্থানভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখেন তাঁদের পক্ষে এটা ছিল দুঃসংবাদ, কিন্তু আমাদের মতো স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন তখনকার দিনে কৃষ্ণগহ্বরে বিশ্বাস করতেন তাঁদের পক্ষে এটা ছিল সুসংবাদ। তারকাগুলি যদি সঙ্কুচিত হয়ে আড়াআড়ি ১০-২০ মাইল হয়ে নিউট্রন তারকায় পরিণত হতে পারে তাহলে আশা করা যেতে পারে যে অন্য তারকাগুলি আরও বেশি সঙ্কুচিত হয়ে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারে।

সূর্যের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ বেশি ভরসম্পন্ন একটি তারকা শ্বেত বামন কিংবা নিউট্রন তারকারূপে স্থিতিলাভ করতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারকাটি বিস্ফোরিত হতে পারে এবং যথেষ্ট পদার্থ নিক্ষেপ করে নিজের ভর এর নীচে নামিয়ে আনতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এ রকম হবে না। কোনও কোনও তারকা এত ক্ষুদ্র হয়ে যাবে যে, তাদের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রগুলি আলোককে বাঁকিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে আসবে যে, সেই আলো তারকাতেই আবার ফিরে আসবে আর কোনও আলোক কিংবা কোনও কিছুই পালাতে পারবে না। এই তারকাগুলি হয়ে দাঁড়াবে কৃষ্ণগহ্বর।

পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি কাল-প্রতিসম (time symmetric)। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর নামে যদি এমন বস্তুপিণ্ড থাকে যাতে জিনিসগুলি পড়তে পারে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না, তাহলে এমন বস্তুপিণ্ড থাকা উচিত যা থেকে জিনিসগুলি বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু যার ভিতরে জিনিস পড়তে পারে না।

এগুলির নাম দেওয়া যেতে পারে শ্বেতগহ্বর। দূর কল্পনা করা যেতে পারে যে, একজন একস্থানে কৃষ্ণগহ্বরে লাফিয়ে পড়ে অন্যস্থানে শ্বেতগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বহুদূরে স্থানে ভ্রমণ সম্পর্কে এর আগে বলা হয়েছিল উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি হবে তার একটি আদর্শ উপায়। আপনার প্রয়োজন হবে শুধু কাছাকাছি একটি কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পাওয়া।

প্রথমে স্থানে এই ধরনের ভ্রমণ সম্ভব মনে হয়েছিল। আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদের এমন কতগুলি সমাধান আছে যাতে কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে শ্বেতগহ্বর দিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব। পরে গবেষণায় অবশ্য দেখা গিয়েছে এই সমাধানগুলি খুবই অস্থির (unstable) : একটি মহাকাশযানের উপস্থিতির মতো সামান্য একটু বিক্ষোভই কৃষ্ণগহ্বর থেকে শ্বেতগহ্বরে যাওয়ার ওই সরু সুড়ঙ্গ পথকে (wormhole or passage) ধ্বংস করে দেবে। এটাও আরেকটা পিপেতে চড়ে নায়েগ্রা যাওয়ার মতো।

তারপরে মনে হল ব্যাপারটার কোনও আশা নেই। কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে ময়লা ফেলা কিংবা কোনও বন্ধুকে ফেলে দেওয়ার মতো কাজ হতে পারে। কিন্তু সেগুলি 'এমন দেশ যেখান থেকে কোনও পথিক ফিরে আসে না'। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা বলেছি তার সবটাই কিন্তু আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভিত্তিতে গণনার সাহায্যে। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমরা যে পর্যবেক্ষণ করেছি তার অতিসুন্দর ঐক্য রয়েছে কিন্তু আমরা জানি এটা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। তার কারণ কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অনিশ্চয়তার নীতি বলে কণিকাগুলির সুসংজ্ঞিত অবস্থান এবং সুসংজ্ঞিত গতিবেগ দুই-ই থাকতে পারে না। যত নিখুঁতভাবে আপনি একটি কণিকার অবস্থান মাপবেন তত কম নিখুঁতভাবে আপনি তার গতিবেগ মাপতে পারবেন এবং তার বিপরীতও সত্য।

১৯৭৩ সালে আমি গবেষণা করতে শুরু করি, কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার নীতি কি পার্থক্য সৃষ্টি করবে সেই বিষয়ে। আমি দেখলাম এর অর্থ হবে কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়। এই গবেষণার ফলে আমি এবং আর সবাই অবাক হয়ে গেলাম। কৃষ্ণগহ্বরগুলি স্থির হারে কণিকা এবং বিকিরণ প্রেরণ করবে। অক্সফোর্ডের কাছে একটি কনফারেন্সে আমি যখন আমার গবেষণার ফল ঘোষণা করলাম তখন সবাই ঐ ঘোষণা অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সভার সভাপতি বলেছিলেন গবেষণার ফলটি একেবারেই অর্থহীন। তিনি এই মত প্রকাশ করে একটি গবেষণাপত্র লিখিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য সবাই যখন আমার গণনা আবার করে দেখলেন তাঁরাও একই অভিক্রিয়া

(effect) পেলেন। সুতরাং সভাপতিও মেনে নিলেন আমি সঠিক ছিলাম।

একটি কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থেকে বিকিরণ কি করে পলায়ন করতে পারে? কি করে পারে সেটি বুঝবার কয়েকটি উপায় আছে। যদিও তাদের খুবই পৃথক মনে হয় তবুও আসলে তারা তুল্য। একটি উপায় : অনিশ্চয়তার নীতি কণিকাগুলির আলোকের চাইতে বেশি গতিবেগে ক্ষুদ্র দূরত্ব অতিক্রম অনুমোদন করে – এ তথ্য মেনে নেওয়া। এর ফলে কণিকাগুলি এবং বিকিরণ ঘটনা দিগন্ত দিয়ে বেরিয়ে কৃষ্ণগহ্বর থেকে পলায়ন করতে পারে। কৃষ্ণগহ্বর থেকে যা বেরিয়ে আসে সেটি কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরে যা পড়েছিল তার চাইতে পৃথক। শুধুমাত্র শক্তিটা একরূপ থাকবে।

কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা এবং বিকিরণ নির্গত হলে তার ভর হ্রাস পাবে। এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরটি ক্ষুদ্রতর হবে এবং কণিকাগুলি দ্রুততর গতিতে বাইরে প্রেরিত হবে। শেষ পর্যন্ত এর ভর শূন্যে পরিণত হবে এবং কৃষ্ণগহ্বরটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে। সম্ভাব্য মহাকাশযান এবং অন্য যে বস্তুগুলি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর পড়েছিল সেগুলির কি হবে? আমার সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা অনুসারে এ প্রশ্নের উত্তর : তারা তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র একটি শিশু মহাবিশ্বে চলে যাবে। একটি ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চল থেকে শাখাবিস্তার করবে। এই শিশু মহাবিশ্ব আবার স্থান-কালের আমাদের অঞ্চলে যোগ দিতে পারে। যদি যোগ দেয় তাহলে সেটাকে মনে হবে আর একটি কৃষ্ণগহ্বর। সেটা গঠিত হয়েছিল এবং উবে গিয়েছিল। যে কণিকাগুলি একটি কৃষ্ণগহ্বরে পড়েছিল সেগুলিকে মনে হবে অন্য কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসর্জিত হয়েছে এবং এর বিপরীতও হবে (and vice versa) সত্য।

শুনে মনে হবে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর দিয়ে মহাকাশে ভ্রমণের জন্য যা প্রয়োজন এগুলি শুধুমাত্র তাই। আপনি আপনার মহাকাশযানটিকে চালিয়ে নিয়ে একটা উপযুক্ত কৃষ্ণগহ্বরে পড়ুন। মহাকাশযানটি বেশ বড় হওয়া ভাল। তাছাড়া ভিতরে যাওয়ার আগেই মহাকর্ষীয় বলগুলি আপনাকে ছিঁড়ে সেমাই (spaghetti) বানিয়ে দেবে। তাহলে আশা করতে পারেন অন্য কোনও কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসবেন। তবে কোথায় সেটি আপনি বেছে নিতে পারবেন না।

কিন্তু এই আন্তঃনীহারিকা পরিবহন পরিকল্পনায় একটা বাধা আছে। কণিকাগুলি যে শিশু মহাবিশ্বে পড়েছিল সেই শিশু মহাবিশ্ব যাকে আমরা কাল্পনিক কাল বলি সেই কাল্পনিক কালেই হয়েছিল। বাস্তব কালে যে

মহাকাশচারী কৃষ্ণগহ্বরে পড়বে তার একরকম চট্‌চটে মৃত্যু (sticky end) হবে। মাথার দিকের আর পায়ের দিকের মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্য তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। যে কণিকাগুলি তার দেহ গঠন করেছিল সেগুলিও বেঁচে থাকবে না। একটি অনন্যতায় এসে, বাস্তব কালের গণনায় তাদের ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কাল্পনিক কালের হিসাবে তাদের ইতিহাস চলতে থাকবে। তারা শিশু মহাবিশ্বে প্রবেশ করবে এবং অন্য কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা কণিকারূপে আবার নির্গত হবে। সুতরাং এক অর্থে মহাকাশচারীরা মহাবিশ্বের অন্য অঞ্চলে পরিবাহিত হবে। তবে যে কণিকাগুলি নির্গত হবে সেগুলিকে দেখতে ঠিক মহাকাশচারীর মতো হবে না। সে বাস্তব কালের অনন্যতায় ঢুকে পড়েছিল, তার কণিকাগুলি যে কাল্পনিক কালে বেঁচে থাকবে এ তথ্য তাকে খুব একটা সান্ত্বনা দেবে না। কৃষ্ণগহ্বরে যে পড়বে আবশ্যিকভাবে তার নীতিবাক্য হওয়া উচিত 'কাল্পনিকের কথা চিন্তা করো।'

কণিকাগুলি পুনর্বার কোথায় নির্গত হবে সেটা কে নির্ধারণ করে? শিশু মহাবিশ্বে কণিকাগুলির সংখ্যা হবে কৃষ্ণগহ্বরে যে কণিকাগুলি পড়েছিল তার সংখ্যা এবং কৃষ্ণগহ্বরটি উবে যাওয়ার সময়, কৃষ্ণগহ্বর থেকে যে কণিকাগুলি নির্গত হয় তার সংখ্যার যোগফলের সমান। এর অর্থ একটি কৃষ্ণগহ্বরে যে কণিকাগুলি পতিত হয় সেগুলি প্রায় একই ভরের অন্য একটি গহ্বর দিয়ে বেরিয়ে আসে। সুতরাং যে কৃষ্ণগহ্বরে কণিকাগুলি পতিত হয়েছিল সেই আকারের কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করে চেষ্টা করা যেতে পারে কণিকাগুলি কোথা থেকে নির্গত হবে সেই জায়গা নির্বাচন করা। তবে কৃষ্ণগহ্বরগুলির মোট একই শক্তিসম্পন্ন অন্য এক কেতা (set) কণিকা উৎসর্জনের একইরকম সম্ভাবনা আছে। তাহলেও যে কণিকাগুলি অন্য গহ্বরে ঢুকেছিল উৎসর্জিত কণিকাগুলি সেই কণিকাগুলি কিনা বলা সম্ভব নয়। কণিকাগুলির পরিচয়পত্র থাকে না, এক ধরনের সমস্ত কণিকা দেখতে একরকম।

এসবের অর্থ হল কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর দিয়ে যাওয়া মহাকাশ ভ্রমণের জনপ্রিয় এবং বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, আপনাকে কাল্পনিক কালে ভ্রমণ করে সেখানে পৌঁছাতে হবে এবং আপনার ইতিহাস বাস্তব কালের হিসাবে যে একটা চট্‌চটে অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেছিল তা নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, আপনি সত্যিই নিজের গন্তব্যস্থল নির্বাচন করতে পারবেন না। এই ভ্রমণ হবে কতগুলি বিমান পরিবহন কোম্পানীর বিমানে ভ্রমণ করার মতো, সে কোম্পানীগুলির নামও আমি করতে পারি।

যদিও শিশু মহাবিশ্বগুলি মহাকাশ ভ্রমণে খুব কার্যকর হবে না তবুও মহাবিশ্বের সব জিনিস ব্যাখ্যা করার মতো সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টায় এর গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ আছে। আমাদের বর্তমান তত্ত্বগুলিতে একটি কণিকার বৈদ্যুৎ আধানের মতো কতগুলি রাশি রয়েছে, এই রাশিগুলির মূল্যাঙ্ক সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তার বদলে আমাদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ঐক্য থাকবে এই রকম রাশি বেছে নিতে হয়। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই বিশ্বাস এমন একটি মূলগত ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে, যে তত্ত্ব এই রাশিগুলির মূল্যাঙ্ক আগাম প্রকাশ (predict) করতে পারে।

এরকম একটি তত্ত্ব থাকতে পারে। বর্তমানে এবিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীর নাম হেটারোটিক অতিতন্তু (heterotic superstring)। চিন্তনটা এই রকম: স্থান-কাল ক্ষুদ্র তন্তুর টুকরোর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁসে পূর্ণ। যেগুলিকে আমরা মৌলকণা বলি সেগুলি আসলে বিভিন্নভাবে কম্পমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁস (loops)। এই তত্ত্বে এমন কোনও সংখ্যা নেই যার মূল্যাঙ্কের সমন্বয় (adjust) করা যেতে পারে। সুতরাং আশা করা উচিত একটি কণিকার বৈদ্যুৎ আধানের মতো যে সমস্ত সংখ্যার মূল্যাঙ্ক বর্তমান তত্ত্বগুলির দ্বারা অনির্ধারিত থাকে, ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের উচিত হবে সেই মূল্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার সামর্থ্য থাকা। যদিও আমরা অতিতন্তু তত্ত্বের সাহায্যে এই পরিমাণগুলির কোনওটি সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারিনি, তবুও অনেকের বিশ্বাস আমরা শেষ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব।

তবে শিশু মহাবিশ্ব সম্পর্কিত এই মানসচিত্রগুলি যদি সঠিক হয় তাহলে এই পরিমাণগুলি সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে, কারণ, কতগুলি শিশু মহাবিশ্ব রয়েছে যেগুলি মহাবিশ্বে আমাদের অঞ্চলে যোগদান করার জন্য অপেক্ষা করছে, যেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। এমন শিশু মহাবিশ্ব থাকতে পারে যাতে সামান্য কয়েকটি কণিকামাত্র রয়েছে। এই শিশু মহাবিশ্বগুলি এত ক্ষুদ্র যে এগুলির আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিংবা আমাদের শাখারূপে বিস্তৃত হওয়া আমরা লক্ষ্য করতে পারব না। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলে কিন্তু একটি কণিকার বৈদ্যুৎ আধানের মতো পরিমাণগুলির আপাতদৃষ্ট মূল্যাঙ্কের পরিবর্তন হবে। শিশু মহাবিশ্বের সংখ্যার একটি বিস্ফোরণ হতে পারে (population explotion)। তবে মানুষের ক্ষেত্রে যা হয় এক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহ কিংবা দাঁড়াবার স্থানের মতো কোনও সীমক উপাদান (limiting factor) থাকবে না। মহাবিশ্বগুলি তাদের নিজেদের রাজ্যেই বর্তমান। এটা

অনেকটা এই প্রশ্নের মতো : একটি আলপিনের ডগায় ক'জন দেবদূত নাচতে পারে?

ছোট হলেও মনে হয় অধিকাংশ পরিমাণ সাপেক্ষই শিশু মহাবিশ্বগুলি, খুবই অল্প হলেও, ভবিষ্যদ্বাণী করা মূল্যাঙ্কে নির্দিষ্ট নিশ্চিত পরিমাণ অনিশ্চয়তা উপস্থিত করে। তবে এরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থাৎ তথাকথিত মহাজাগতিক ধ্রুবকের পর্যবেক্ষিত মূল্যাঙ্কের একটা ব্যাখ্যা হয়ত দিতে পারে। এটা ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমীকরণগুলির একটা শব্দ। এই শব্দ স্থান-কালের অন্তঃস্থিত একটা প্রসারণ কিংবা সঙ্কোচনের ঝোঁক স্বীকার করে। প্রথমে আইনস্টাইন খুব ক্ষুদ্র একটি মহাজাগতিক ধ্রুবক প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল এই ধ্রুবকের সাহায্যে তিনি পদার্থের যে সঙ্কোচনের ঝোঁক মহাবিশ্বকে সঙ্কুচিত করে, তার সঙ্গে একটি ভারসাম্য তৈরি করতে পারবেন। যখন আবিষ্কৃত হল যে মহাবিশ্ব প্রসারমান তখন এই উদ্দেশ্য আর রইল না, কিন্তু মহাজাগতিক ধ্রুবকের থেকে মুক্তি পাওয়া অত সহজ ছিল না। আশা করা যেতে পারে কণাবাদী বলবিদ্যায় যে হ্রাস-বৃদ্ধি অন্তর্নিহিত রয়েছে সেটা একটা অতি বৃহৎ মহাজাগতিক ধ্রুবক দান করবে। তবুও আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি মহাবিশ্বের প্রসারণ কিভাবে কালের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এইভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি, মহাজাগতিক ধ্রুবক খুবই ক্ষুদ্র। এ পর্যন্ত পর্যবেক্ষিত মূল্যাঙ্ক কেন এত ক্ষুদ্র তার কোনও ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে শিশু মহাবিশ্বসমূহের আমাদের কাছ থেকে শাখায়িত হওয়া এবং আমাদের সঙ্গে আবার যোগদান করা মহাজাগতিক ধ্রুবকের আপাতদৃষ্ট মূল্যাঙ্ককে প্রভাবিত করবে। যেহেতু কতগুলি শিশু মহাবিশ্ব আছে আমরা তা জানি না, সেইজন্য আপাতদৃষ্ট মহাজাগতিক ধ্রুবকের বিভিন্ন সম্ভাব্য মূল্যাঙ্ক হবে। তবে প্রায় শূন্য মূল্যাঙ্কই হবে সবচাইতে বেশি সম্ভাব্য। এটা ভাগ্যের কথা, কারণ, যদি মহাজাগতিক ধ্রুবকের মূল্যাঙ্ক অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়, শুধুমাত্র তাহলেই মহাবিশ্ব আমাদের মতো জীবের বাসযোগ্য হবে।

সংক্ষিপ্তসার ঃ মনে হয় কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হতে পারে এবং উবে গিয়ে মহাবিশ্বের আমাদের অঞ্চল থেকে অদৃশ্য হতে পারে। কণিকাগুলি শিশু মহাবিশ্বে গমন করে, সেই শিশু মহাবিশ্বগুলি আমাদের মহাবিশ্ব থেকে শাখায়িত হয়। তারপর এই শিশু মহাবিশ্বগুলি অন্য কোথাও যুক্ত হতে পারে। এগুলি মহাকাশ ভ্রমণের পক্ষে খুব ভাল না হতে পারে। কিন্তু সেগুলির অস্তিত্বের অর্থ: আমরা যা আশা করেছিলাম আমরা তার থেকেও কম ভবিষ্যদ্বাণী করতে

পারব, এমনকি যদি আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি তাহলেও। অন্যদিকে আমরা মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতো কিছু পরিমাণে মাপিত মূল্যাঙ্কের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হতে পারি। গত কয়েক বছর বহুলোক শিশু মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছেন। আমার মনে হয় না স্থানে ভ্রমণের একটা পদ্ধতি হিসাবে এর পেটেন্ট নিয়ে কেউ বিরাট অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। কিন্তু গবেষণার জগতে এই বিষয়ে খুবই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

বারো

সবই কি পূর্বনির্ধারিত?*

জুলিয়াস সীজার নাটকে কেসিয়াস ব্রুটাসকে বলছে 'অনেক সময় মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হয়'। কিন্তু সত্যিই কি আমরা নিজেদের ভাগ্যবিধাতা? আমরা যা করি সবই কি পূর্বনির্ধারিত? আগেই ভাগ্যে লেখা ছিল? পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের সপক্ষে যুক্তি ছিল—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং কালের অতীত, সুতরাং কি হতে চলেছে ঈশ্বর সেটা জানেন। কিন্তু তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের কি করে থাকতে পারে? নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আমরা কি করে দায়ী হতে পারি? একজনের কপালে যদি আগে থাকতেই ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা লেখা হয়ে থেকে থাকে তাহলে তার দোষ কোথায়? তাহলে সে জন্য কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে?

* ১৯৯০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিগমা ক্লাব সেমিনারে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।

সাম্প্রতিককালে নিয়তিবাদের (determinism) ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞান। মনে হয় মহাবিশ্ব এবং তার ভিতরকার সবকিছু কালানুসারে কিভাবে বিকাশলাভ করবে সে সম্পর্কে সুসংজ্ঞিত বিধি আছে। যদিও আমরা এই সমস্ত বিধির একেবারে নির্ভুল গঠন আবিষ্কার করতে পারিনি তবুও একেবারে চরম পরিস্থিতি ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই কি হবে সেটা নির্ধারণ করার মতো জ্ঞান আমাদের আছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা অবশিষ্ট বিধিগুলি আবিষ্কার করতে পারব কিনা সে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। আমার মনে হয় আগামী কুড়ি বছরে বিধিগুলি আবিষ্কার হওয়ার আধাআধি সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি আবিষ্কার নাও করতে পারি তাহলেও আমাদের যুক্তিতে সত্যিকারের কোনও পার্থক্য হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল : এমন এক কেতা বিধি থাকা উচিত যে বিধিগুলি শুরু থেকে মহাবিশ্বের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করবে। এ বিধিগুলি ঈশ্বর সৃষ্টি করে থাকতে পারেন কিন্তু মনে হয় ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরী আইনভঙ্গ করার জন্য মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন না।

মহাবিশ্বের প্রাথমিক নক্সা হয়ত ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন কিংবা হয়ত সেটাও নির্ধারিত হয়েছিল বিজ্ঞানের বিধিগুলি দিয়ে। যাই হোক না কেন, মনে হয় তারপর থেকে মহাবিশ্বের সবই নির্ধারিত হবে বিজ্ঞানের বিধিসম্মত বিবর্তনের দ্বারা। সুতরাং আমরা কি করে নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হব সেটা বোঝা কঠিন।

এমন কোনও মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আছে যে তত্ত্ব মহাবিশ্বের সব কিছু নির্ধারণ করে— এ কল্পন কতকগুলি সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রথমত ধরে নেওয়া যেতে পারে মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব গাণিতিক বাগ্বিধিতে সুষ্ঠু এবং সংক্ষিপ্ত (অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জিত- compact)। সর্ববিষয়সম্পর্কীয় তত্ত্বের একটি বিশেষত্ব এবং সারল্য থাকা উচিত, অথচ কয়েকটি সমীকরণ কি করে আমরা চারপাশে যে জটিলতা এবং খুঁটিনাটি বিশদ বিস্তার দেখতে পাই তার কারণ দেখাতে পারে? সত্যিই কি বিশ্বাস করা যেতে পারে যে মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব স্থির করে দিয়েছিল এ সপ্তাহের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া গানের রেকর্ডের শিরোনামে থাকবে সিনিয়াত্ ও'কনোর (Sinead O'Connor) কিংবা কসমোপলিটানের (Cosmopolitan) প্রচ্ছদপটে থাকবেন ম্যাডোনা?

মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব সমস্তই স্থির করে এ কল্পনের দ্বিতীয় সমস্যা : আমরা যা বলি সবই নির্ধারিত হয় তত্ত্বটি দিয়ে। কিন্তু বাক্যটি যে সঠিক হবে সেটা কেন নির্ধারিত হবে? ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নয় কি? কারণ একটি সঠিক বক্তব্য থাকলে অঠিক বক্তব্য অনেক থাকে। প্রতিদিন ডাকে আমার কাছে

কয়েকটি তত্ত্ব আসে। লোকে যে তত্ত্বগুলি আমার কাছে পাঠায় তাদের প্রত্যেকটি পৃথক এবং অধিকাংশেরই পারস্পরিক সামঞ্জস্য নেই। তবুও হয়ত মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব স্থির করেছে — লেখকরা মনে করবে তারাই সঠিক। সুতরাং আমি যা বলি তার কেন বৃহত্তর সত্যতা থাকবে? আমি কি মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের দ্বারা সমরূপে নির্ধারিত নই?

সবকিছু পূর্বনির্ধারিত এই কল্পনের আরেকটি সমস্যা : আমরা বোধ করি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। আমরা যদি কিছু করব বলে ঠিক করি তাহলে সেটা করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কিন্তু সবই যদি বিজ্ঞানের বিধি দিয়ে নির্ধারিত হয় তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা নিশ্চয়ই একটা মায়া এবং আমাদের যদি স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে তাহলে আমাদের কৃতকর্মের জন্য আমাদের দায়িত্বের ভিত্তি কি? কোনও উন্মাদ যদি কোনও অপরাধ করে তাহলে আমরা তাকে শাস্তি দিই না। তার কারণ আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, তারা এ কাজ না করে পারে না। কিন্তু মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব যদি আমাদের সকলের নিয়ামক হয় তাহলে আমরা কেউই সে কাজ না করে পারি না। সুতরাং কৃতকর্মের জন্য কোনও লোককে কেন দায়ী করা হবে?

নিয়তিবাদ কিংবা নির্ধারণীয়তাবাদে এ সমস্যাগুলি নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা ছিল কিন্তু খানিকটা পণ্ডিতি ব্যাপার। কারণ তখন আমরা বিজ্ঞানের বিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থেকে অনেক দূরে এবং আমরা জানতাম না মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা কি করে নির্ধারিত হয়েছিল। সমস্যাগুলি এখন অনেক বেশি জরুরী কারণ সম্ভাবনা আছে একটা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আমরা মোটে কুড়ি বছরে আবিষ্কার করতে পারি। আমরা বুঝতে পারছি প্রাথমিক অবস্থা হয়ত বিজ্ঞানের বিধিগুলি দিয়ে নির্ধারিত হয়েছিল। এর পরে আমি আলোচনা করেছি, এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। আমার বিরাট কোনও মৌলিকতা বা গভীরতার দাবী নেই কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এর চাইতে বেশি কিছু করতে পারি না।

প্রথম সমস্যা দিয়ে শুরু করি : তুলনামূলকভাবে একটা সরল এবং সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব কি করে একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে? সেই মহাবিশ্ব—আমরা যাকে পর্যবেক্ষণ করি, সেইরকম জটিল এবং যার রয়েছে নানা তুচ্ছ খুঁটিনাটি। এর চাবিকাঠি রয়েছে কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতিতে। এ নীতির বক্তব্য—একটি কণিকার অবস্থান এবং দ্রুতি দুটোই খুব নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব

নয়। অবস্থান যত নির্ভুলভাবে মাপবেন দ্রুতির মাপন হবে তত কম নির্ভুল এবং এর বিপরীতটাও সত্য (vice versa)। বর্তমানকালে যখন জিনিসগুলি খুব দূরে দূরে অবস্থিত এবং অবস্থানে সামান্য অনিশ্চয়তা খুব বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করে না, তখন এই অনিশ্চয়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু অতি আদিম মহাবিশ্বে সব জিনিসই খুব কাছাকাছি ছিল সুতরাং অনিশ্চয়তা ছিল প্রচুর এবং মহাবিশ্বের বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য অবস্থা ছিল। এই বিভিন্ন সম্ভাব্য আদিম অবস্থাগুলি বিবর্তনের পথে মহাবিশ্বের বিভিন্ন ইতিহাসে একটা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করত। বৃহৎমানের বিচারে এই ইতিহাসগুলির অবয়ব সমরূপ। তারা যে মহাবিশ্বের অনুরূপ হ'ত সে মহাবিশ্ব ছিল সুষম (uniform), মসৃণ এবং প্রসারমান। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের পার্থক্য থাকত। যেমন, তারকাগুলির বণ্টনে এবং আরও পার্থক্য থাকত তাদের পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদপটে কি আছে তাই নিয়ে (অবশ্য ঐ ইতিহাসগুলিতে যদি পত্রিকা থাকত)। সুতরাং আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বের জটিলতা এবং তাদের খুঁটিনাটির উদ্ভব হয়েছিল আদিম যুগের অনিশ্চয়তার নীতি থেকে। এ থেকে মহাবিশ্বের ইতিহাসের একটি পুরো গোষ্ঠী পাওয়া যায়। এমন একটা ইতিহাস থাকবে যেখানে নাৎসীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিতেছিল। যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমরা এমন একটি ইতিহাসে বাস করি, যে ইতিহাসে মিত্রপক্ষ যুদ্ধ জয় করেছিল এবং কসমোপলিটানের প্রচ্ছদপটে ম্যাডোনা ছিলেন।

এখন আমি দ্বিতীয় সমস্যা বিচার করব : যদি আমরা যা করি সেটা কোনও মহান একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে সে তত্ত্ব কেন নির্ধারণ করবে যে আমরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত না নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেব? আমরা যা বলছি তার সত্যতা কেন থাকবে? এ প্রশ্নে আমার উত্তরের ভিত্তি ডারউইনের স্বাভাবিক নির্বাচনের কল্পন থেকে। আমি ধরে নিচ্ছি কতগুলি পরমাণুর আপতনিক (chance) সমন্বয়ের ফলে পৃথিবীতে জীবনের একটি আদিম রূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়েছিল। জীবনের এই আদিম রূপ বোধহয় ছিল একটি বৃহৎ অণু। কিন্তু সম্ভবত সেটি ডি. এন. এ. ছিল না। কারণ, পূর্ণ একটি ডি. এন. এ. অণু অসম্বদ্ধ (random) সমন্বয় দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার আপতনিক (chance) সম্ভাবনা কম।

আদিম জীবন নিজের বংশ রক্ষা করত। কণাবাদী অনিশ্চয়তার নীতি এবং পরমাণুগুলির অসম্বদ্ধ তাপীয় গতির অর্থ হবে বংশ রক্ষার ব্যাপারে কিছুসংখ্যক ভুল হয়েছিল। এই ভুলগুলির অধিকাংশই জীবটির জীবন রক্ষার পক্ষে কিংবা

বংশ রক্ষার পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। এই ভুলগুলি তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বাহিত হ'ত না। তারা লুপ্ত হ'ত। কয়েকটি গুণ উপকারে লাগত, তবে সেগুলিও শুদ্ধ আপতনিক। যে সমস্ত জীবের এই ভুলগুলি ছিল তাঁদের বেঁচে থাকবার এবং বংশ রক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল বেশি। ফলে তাদের প্রবণতা হ'ত মূল অনুন্নত জীবগুলির স্থান অধিকার করা।

আদিম স্তরে ডি. এন. এ.-র জোড়া প্যাঁচানো তারের মতো গঠন (double helix structure) হয়ত ঐ রকমই একটি উন্নতি ছিল। এটি বোধহয় এমন একটি অগ্রগতি ছিল যে জীবের আগেকার রূপ যাই থাক না কেন, এই উন্নীত জীবগুলি সম্পূর্ণভাবে তার স্থান দখল করে নিল। বিবর্তনের অগ্রগতি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকাশের পথও প্রদর্শন করেছে। যে জীবগুলি তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সংগ্রহ করা উপাত্তগুলির নিহিতার্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারত এবং সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করত তাদের বেঁচে থাকার এবং বংশ রক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল বেশি। মানব জাতি এই ক্ষমতাকে অন্য স্তরে নিয়ে এসেছে। উচ্চশ্রেণীর বাঁদরদের সঙ্গে দেহ এবং ডি. এন. এ.-তে আমাদের সাদৃশ্য খুবই বেশি। কিন্তু আমাদের ডি. এন. এ.-তে সামান্য পরিবর্তন আমাদের ভাষা বিকাশের ক্ষমতা দান করেছে। এর অর্থ আমাদের এক প্রজন্মের সমাচার এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অন্য প্রজন্মকে কথ্য ভাষায় এবং পরবর্তীকালে লিখিত ভাষায় হস্তান্তর করতে পারি। পূর্বকালে অভিজ্ঞতার ফল হস্তান্তর করা যেত শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির সময় অসম্বদ্ধ ভ্রমের মাধ্যমে ডি. এন. এ.-র সঙ্কেতলিপিভুক্ত হয়ে। এ পদ্ধতির গতি ছিল ধীর। এর ফল হয়েছে বিবর্তনের নাটকীয় গতিবৃদ্ধি। মানবজাতি (human race) পর্যন্ত বিবর্তন হতে সময় লেগেছে তিনশ' কোটি বছর। কিন্তু গত দশ হাজার বছরে আমাদের লিখিত ভাষা বিকাশলাভ করেছে। এর ফলে আমরা গুহাবাসী অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের পরম তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার সামর্থ্য লাভ করার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছেছি।

গত দশ হাজার বছরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ জীববিজ্ঞানভিত্তিক বিবর্তন হয়নি। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগ্রহ করা সংবাদ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সামর্থ্য সবেরই শুরু আমাদের গুহাবাসী জীবন থেকে কিংবা তারও আগে থেকে। এগুলি নির্বাচন করার ভিত্তি ছিল কতগুলি জন্তুকে খাদ্যের জন্য হত্যা করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে কিংবা তাদের দ্বারা নিহত হওয়া এড়ানোর সামর্থ্যের ভিত্তিতে। এই উদ্দেশ্যে যে মানসিক গুণগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল, বর্তমান যুগের অত্যন্ত পৃথক পরিস্থিতিতে যে সেই গুণগুলি আমাদের

এত বেশি কাজে লাগছে, সেটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটা মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার কিংবা নিয়তিবাদ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর করায় জীবন রক্ষার দিক দিয়ে কোনও বিশেষ সুবিধা হয় না। তবুও অন্য উদ্দেশ্যে আমরা যে বুদ্ধি বিকশিত করেছি, সে বুদ্ধি এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজার সামর্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিতি দান করে।

এখন আমি তৃতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব : স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্ন এবং নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে দায়িত্বের প্রশ্ন। ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে আমরা চিন্তা করি আমরা কে এবং আমরা কি করছি—এগুলি বেছে নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে। কিন্তু এটি একটা বিভ্রান্তিও (illusion) হতে পারে। অনেকে ভাবেন তাঁরা যীশু খ্রীষ্ট কিংবা নেপোলিয়ান। কিন্তু তাঁরা সবাই সঠিক হতে পারেন না। আমাদের প্রয়োজন একটি বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা, যেটা আমরা বাইরে থেকে প্রয়োগ করতে পারি এবং সে পরীক্ষার দ্বারা বুঝতে পারি একটি জীবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নেই। উদাহরণ : ধরে নেওয়া যাক, অন্য একটি তারকা থেকে ছোট সবুজ ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমরা কি করে বুঝব তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে না আমাদের মতো আচরণের কর্মসূচী তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে একটি যন্ত্রমানব আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে?

মনে হয়, স্বাধীন ইচ্ছার চরম বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা হবে : এই জীবটির আচরণ সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব? যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে স্পষ্টতই তার স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তার আচরণ পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে, যদি আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব না হয়, তবে কার্যকর সংজ্ঞা হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে জীবটির স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

স্বাধীন ইচ্ছার এই সংজ্ঞায় একটি আপত্তি হতে পারে : আমরা একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করলে মানুষ কি করবে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। তবে মানুষের মস্তিষ্কও অনিশ্চয়তার অধীন। যেমন, কণাবাদী বলবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অসম্বদ্ধতার উপাদান মানুষের আচরণে রয়েছে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে জড়িত শক্তি অল্প, সেই জন্য কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা একটি ক্ষুদ্র অভিক্রিয়া মাত্র। মানবিক আচরণ সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করার অসামর্থ্যের সত্যিকারের কারণ এ কাজটা খুব শক্ত। আমরা বর্তমানে মস্তিষ্কের ক্রিয়া শাসনকারী মূলগত ভৌতবিধিগুলি জানি। তুলনায় তারা সরল কিন্তু কয়েকটি কণিকা বেশি জড়িত থাকলে সমীকরণ সমাধান খুবই শক্ত। এমনকি সরলতর নিউটনীয় তত্ত্বেও নির্ভুলভাবে সমীকরণ সমাধান

করা যায় শুধুমাত্র দুটি কণিকার ক্ষেত্রে। তিনটি কিংবা ততোধিক কণিকা থাকলে আসন্নতার (approximation) দ্বারস্থ হতে হয়। কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠিন্যও বাড়ে। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় $১০^{১১}$ কিংবা ১০০ মিলিয়ান বিলিয়ান বিলিয়ান কণা আছে। মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা এবং যে স্নায়বিক উপাত্তগুলি (datas) তাতে প্রবেশ করছে সেটা জানা থাকলে বোঝা যাবে এ সংখ্যা এত বেশি যে আমরা কোনওদিনও মস্তিষ্ক কি রকম আচরণ করবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। আসলে আমরা অবশ্য মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা মাপতে পারি না। তার কারণ সেটা করতে গেলে মস্তিষ্কটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে প্রস্তুতও হই, তাহলেও আমাদের এত কণিকার হিসাব রাখতে হবে যা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সম্ভবত প্রাথমিক অবস্থা সাপেক্ষ মস্তিষ্ক খুবই স্পর্শকাতর। প্রাথমিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন পরবর্তী আচরণে বিরাট পার্থক্য নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং যদিও আমরা মস্তিষ্ক শাসনকারী মূলগত সমীকরণগুলি জানি, তবুও আমরা মানবিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে একেবারেই অপারগ।

যখনই আমরা স্থূলসত্বক (macroscopic) তন্ত্রগুলি নিয়ে বিচার করি তখনই বিজ্ঞানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তার কারণ, মূলগত সমীকরণগুলি সমাধান করার মতো কোনওরকম সম্ভাবনা থাকার পক্ষে কণিকাগুলির সংখ্যা সবসময়ই অত্যধিক। তার বদলে আমরা কার্যকর তত্ত্বগুলি ব্যবহার করি। এই তত্ত্বগুলি হল আসন্নতা। এ ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক কণিকাস্থলে কয়েকটি মাত্র রাশি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবাহী বিজ্ঞানে (fluid mechanics) জলের মতো একটি তরলপদার্থে লক্ষ কোটি অণু থাকে — সেগুলি আবার গঠিত হয় ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। তবুও তাকে একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা একটি উত্তম আসন্নতা। তার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র গতিবেগ, ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা। প্রবাহী বিজ্ঞানের কার্যকর তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি একেবারে নির্ভুল নয়। আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি শুনলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু জাহাজ কিংবা তৈলবাহী পাইপ লাইনের পরিকল্পনা করার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট।

আমার অভিভাবন (suggestion) : স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমাদের কৃতকর্মের জন্য নৈতিক দায়িত্বের কল্পন আসলে যে অর্থে প্রবাহী বিজ্ঞানের তত্ত্ব কার্যকর সেই অর্থে কার্যকর। হতে পারে আমরা যা করি তার সবটাই কোনও এক মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত। সেই তত্ত্ব যদি স্থির করে থাকে আমরা ফাঁসিতে

মরব, ডুবে মরব না– তাহলে ঝড়ের ভিতরে একটি ছোট নৌকা নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে হলে ফাঁসিকাঠই যে আপনার নিয়তি সে সম্পর্কে ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চিত হতে হবে। আমি দেখেছি, যাঁরা দাবী করেন—সমস্তই পূর্বপরিকল্পিত এবং এ সম্পর্কে আমরা কিছুই করতে পারি না, তাঁরাও রাস্তা পার হওয়ার আগে ভাল করে দেখে নেন। হতে পারে, যাঁরা দেখে নেন না, তাঁরা কাহিনীটা বলবার জন্য বেঁচে থাকেন না।

সবই পূর্বপরিকল্পিত এই কল্পনের উপর ভিত্তি করে কেউ নিজের আচরণের ভিত গড়তে পারেন না। কারণ, কি নির্ধারিত আছে সেটা তিনি জানেন না। তার বদলে একটি কার্যকর তত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং সে নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী —মানবিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এই তত্ত্ব খুব ভাল নয় কিন্তু তবুও আমরা এ তত্ত্ব গ্রহণ করি। তার কারণ মূলগত বিধি থেকে উদ্ভূত সমীকরণগুলি সমাধান করার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বিশ্বাসের একটি ডারউইনীয় যুক্তিও আছে। যে সমাজে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দায়িত্ব বোধ করে সে সমাজের মানুষের যুক্তভাবে কাজ করার এবং নিজের মূল্যবোধ বিস্তার করার জন্য বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য পিঁপড়েরা একযোগে কাজ করে এবং ভালই কাজ করে। কিন্তু ঐ রকম সমাজ নিশ্চল (static), এ রকম সমাজ পরিবেশের বিরুদ্ধতায় (challenges) সাড়া দিতে পারে না কিংবা নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে না। নিজেদের পারস্পরিক উদ্দেশ্যের অংশীদার স্বাধীন মানুষের সমবায় কিন্তু নিজেদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহযোগিতা করতে পারে আবার নতুন আবিষ্কার করার মতো নমনীয় (flexible) হতে পারে। সেইজন্য ঐ রকম একটি সমাজের সমৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এবং নিজেদের মূল্যবোধ বিস্তার করার সম্ভাবনা বেশি।

স্বাধীন ইচ্ছার কল্পন বিজ্ঞানের মূলগত বিধির চাইতে পৃথক ভুক্তির (arena) অধিকারে। কেউ যদি বিজ্ঞানের বিধির ভিত্তিতে অবরোহী পদ্ধতিতে মানবিক আচরণ স্থির করেন তাহলে তিনি আত্মনির্দেশক তন্ত্রের (self referencing system) একটি যৌক্তিক স্ববিরোধিতায় (paradox) জড়িয়ে পড়বেন। যদি মূলগত বিধি থেকে ব্যক্তি কি করছে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত তাহলে এই ভবিষ্যদ্বাণীই ঘটনার পরিবর্তন করতে পারত। কালে ভ্রমণ সম্ভব হলে যে সমস্যা হ'ত এ সমস্যা অনেকটা সেইরকম। কালে ভ্রমণ কখনও সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। ভবিষ্যতে কি হবে তা যদি আপনি জানতে পারতেন

তাহলে আপনি ভবিষ্যতের ঘটনার পরিবর্তনও করতে পারতেন। আপনি যদি জানতেন গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল রেসে কোন্ ঘোড়াটা জিতবে তাহলে আপনি তার উপরে বাজি রেখে বিরাট লাভ করতে পারতেন। কিন্তু সেই ক্রিয়া বাজির বৈষম্যের পরিবর্তন করবে (change the odds)। 'ব্যাক টু দি ফিউচার' বইটি দেখলে বুঝতে পারা যাবে কি রকম সমস্যা হতে পারে।

নিজের কর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার এই স্ববিরোধিতার সঙ্গে এর আগে আমি যে সমস্যা উল্লেখ করেছি সেটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত : পরম তত্ত্ব কি স্থির করবে আমরা পরম তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসব? আমার যুক্তি ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) সম্পর্কে ডারউইনের কল্পন আমাদের সঠিক সমাধান এনে দেবে। হতে পারে নির্ভুল উত্তরের বিবরণ দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি এটা নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্ততপক্ষে আমাদের এমন পথে নিয়ে যাওয়া উচিত, যে পথে আমরা এমন এক কেতা ভৌত বিধি পাব যে বিধি মোটামুটি ভাল কাজ করবে। তবে ঐ ভৌত বিধিগুলি আমরা অবরোহী পদ্ধতিতে (deduce) মানবিক আচরণ নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করতে পারি না। তার দুটি কারণ। প্রথম : আমরা সমীকরণগুলি সমাধান করতে পারি না। দ্বিতীয়ত : আমরা যদি পারতামও তাহলেও ভবিষ্যদ্বাণী করার পর তন্ত্রটি গোলমাল হয়ে যেত। মনে হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বিষয়ে কার্যকর তত্ত্ব গ্রহণের পথ দেখাবে। কেউ যদি মেনেও নেন যে ব্যক্তির কর্মগুলি স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া, তাহলে তিনি আর যুক্তি দেখাতে পারবেন না যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলি বহিরাগত বল দ্বারা নির্ধারিত। 'প্রায় স্বাধীন ইচ্ছা' কল্পনের কোনও অর্থ হয় না। একজন ব্যক্তির কি নির্বাচন করার সম্ভাবনা সেটা কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন, এই তথ্যের সঙ্গে কারও কারও—এই নির্বাচন স্বাধীন নয়—এই মত গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা আছে। আমার অনুমান 'আপনাদের অনেকে আজ বিকেলে কিছু খাবেন কিন্তু না খেয়ে শুতে যাওয়ার স্বাধীনতা আপনাদের সবারই আছে' এই রকম গোলমালের একটি উদাহরণ দায়িত্বের হ্রাসপ্রাপ্তি মতবাদ : একটি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার কারণ সে পীড়নের (stress) মুখে ছিল। হতে পারে কারও কারও হয়ত পীড়নের মুখে থাকলে সমাজবিরোধী কাজ করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার শাস্তি কমিয়ে দিয়ে তার অপরাধমূলক কর্ম করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞানের মূলগত বিধিগুলি সম্পর্কে গবেষণা এবং মানবিক আচরণ

সম্পর্কে গবেষণা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রেখে দেওয়া উচিত। অবরোহী পদ্ধতিতে মানবিক আচরণ নির্ধারণের জন্য মূলগত বিধিগুলি ব্যবহার করা যায় না। এর কারণগুলি আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তবে আশা করা যেতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের যে বুদ্ধি এবং যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা আমরা বিকশিত করেছি, সেগুলিকে আমরা ব্যবহার করার আশা করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচন আগ্রাসনের মতো অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও বিকশিত করেছে। গুহাবাসের যুগে কিংবা তারও আগে আগ্রাসন জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা দিতে পারত। ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের এ প্রবৃত্তিকে পছন্দ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের হাতে এমন ধ্বংসক্ষমতা দিয়েছে যে, আগ্রাসন এখন একটা বিপজ্জনক গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ গুণ এখন মনুষ্যজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। মুশকিল হল আগ্রাসনী সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) আমাদের ডি.এন.এ-র সঙ্কেতলিপিতে রয়েছে (encoded) মনে হয়। ডি.এন.এ-র পরিবর্তন হয় জীববিদ্যাভিত্তিক বিবর্তনে। সে বিবর্তনকালের মান বহু নিযুত (million–১০,০০,০০০) বৎসর। কিন্তু আমাদের ধ্বংসক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তথ্যের বিবর্তনের (evolution of information) কালের মানে, সে মান এখন মাত্র কুড়ি কি ত্রিশ বৎসর। আমরা যদি আমাদের আগ্রাসন বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেদের বুদ্ধিকে না প্রয়োগ করতে পারি তাহলে মানবজাতির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমরা যদি আরও একশ' বছর কিংবা তার কাছাকাছি বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমরা অন্য গ্রহে কিংবা অন্য তারকাতেও বিস্তারলাভ করব। তার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের মতো চরম বিপদে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস হওয়ার মতো বিপদ অনেকটা হ্রাস পাবে।

পুনর্বৃত্তি : যদি বিশ্বাস করা যায় যে, মহাবিশ্বের সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, তাহলে যে সমস্যাগুলির উদয় হয় তার কিছু কিছু আমি আলোচনা করেছি। এই নিয়তিবাদের কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কিংবা বৈজ্ঞানিক বিধি যাই হোক না কেন, তাতে কিছু পার্থক্য হবে না। সত্যিই সব সময় বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের বিধিগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ।

আমি তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি : প্রথম, মহাবিশ্বের জটিলতা এবং সমস্ত খুঁটিনাটি কি করে সরল এক কেতা সমীকরণ দিয়ে নির্ধারিত হবে? বিকল্পে সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে ঈশ্বরই সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিস পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন, যেমন, কসমোপলিটানের প্রচ্ছদপটে কে থাকবেন? উত্তরটা মনে হয় কশাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি। তার অর্থ মহাবিশ্বের

শুধুমাত্র একটা ইতিহাস নেই, আছে সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির সম্পূর্ণ একটি গোষ্ঠী। খুব বৃহৎ মানে এই ইতিহাসগুলি সদৃশ হতে পারে কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন মানে তারা পৃথক হবে। আমরা বাস করছি একটি বিশেষ ইতিহাসে। সে ইতিহাসের একটি বিশেষ ধর্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। কিন্তু অন্য ইতিহাসেও অত্যন্ত সদৃশ বুদ্ধিমান জীব আছে। যুদ্ধে কে জিতেছিল এবং জনপ্রিয় গায়কদের ভিতর শ্রেষ্ঠ কে সে ইতিহাস নিয়ে তাদের মতভেদ থাকতে পারে। সুতরাং আমাদের খুঁটিনাটিতে পার্থক্যের কারণ কণাবাদী বলবিদ্যার মূলগত বিধিগুলির অন্তর্ভুক্তি। এই বলবিদ্যায় রয়েছে অনিশ্চয়তা কিংবা অসম্বদ্ধতা।

পরের প্রশ্ন ছিল : সমস্তই যদি কোনও মূলগত তত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তত্ত্বটি সম্পর্কে আমরা যা বলি সেটাও ওই তত্ত্ব দ্বারাই নির্ধারিত এবং কেন সেগুলি সোজাসুজি ভুল কিংবা অবান্তর না হয়ে সঠিক হবে — এ প্রশ্নে আমার উত্তর ছিল ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের দ্বারস্থ হওয়া। যাঁরা বিশ্বে তাঁদের সর্বদিক সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন শুধুমাত্র তাঁদেরই বেঁচে থাকা এবং বংশ রক্ষা করার সম্ভাবনা।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল : সমস্তই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা এবং নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে দায়িত্বের কি হবে? একটি জীবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না তার একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা তার আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় কি না। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা মানুষ কি করবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য মূলগত বিধিগুলি ব্যবহার করতে পারি না, তার দুটো কারণ : প্রথম, যে বিরাটসংখ্যক কণিকা জড়িত সেগুলি সম্পর্কে সমীকরণগুলি আমরা সমাধান করতে পারি না। দ্বিতীয়, যদি আমরা সমীকরণগুলি সমাধান করতে পারতাম তাহলেও ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রক্রিয়াই তন্ত্রটিতে গোলযোগ বাধিয়ে দিত এবং পৃথক ফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। সুতরাং, যেহেতু আমরা মানুষের আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না সেইজন্য আমরা এই কার্যকর তত্ত্বটি গ্রহণ করতে পারি : মানুষ স্বাধীন নিযুক্তক (agent) তবে তারা কর্তব্য নির্বাচন করতে পারে। মনে হয় স্বাধীন ইচ্ছার এবং নিজের কৃতকর্মের দায়িত্ববোধে বেঁচে থাকার দিক দিয়ে একটি নির্দিষ্ট নিশ্চিত সুবিধা আছে। এর অর্থ এই বিশ্বাসকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা শক্তিশালী হতে হবে। ভাষা দ্বারা পরিবাহিত দায়িত্ববোধ ডি. এন. এ. পরিবাহিত আগ্রাসনের সহজ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সেটা জানা নেই। যদি না পারে তাহলে মানবজাতি

প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা কানাগলিতে শেষ হয়ে যাবে। দায়িত্ববোধ এবং আগ্রাসনের ভিতর এর চাইতে ভাল একটা ভারসাম্য আনতে পারবে হয়ত নীহারিকার অন্য কোনও বুদ্ধিমান জীবের জাতি। তা যদি হয়, তাহলে আশা করা যায়, তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত কিংবা আমরা তাদের বেতার সঙ্কেত ধরতে পারতাম। হয়ত তারা আমাদের অস্তিত্বের কথা জানে কিন্তু আমাদের কাছে নিজেদের পরিচয় দিতে চায় না। আমাদের যা অতীত ইতিহাস—কাজটা বুদ্ধিমানের মতো বলেই মনে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল একটা প্রশ্ন : সবকিছুই কি পূর্বনির্ধারিত? আমার উত্তর 'হ্যাঁ'। কিন্তু উত্তরটা 'না' হতে পারে কারণ কি পূর্বনির্ধারিত সেটা আমরা কোনওদিনই জানতে পারব না।

তেরো

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ *

এই রচনার বিষয়বস্তু মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কিংবা বৈজ্ঞানিকেরা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কি হবে বলে ভাবেন। ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়া অবশ্যই খুব কঠিন কাজ, একবার ভেবেছিলাম আমার একটি বই লেখা উচিত—তার নাম গতকাল, আগামীকাল ও ভবিষ্যতের ইতিহাস। এই বইটি হওয়া উচিত ছিল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় ইতিহাস। প্রায় সবকটা ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বিফলতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভাবেন যে, তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

আগেকার দিনে ভবিষ্যদ্বাণী করত দৈবজ্ঞ (oracles) কিংবা ডাইনি বুড়িরা। এরা প্রায়ই হ'ত মহিলা। কোনও ওষুধ খাইয়ে কিংবা আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া শুঁকিয়ে এদের দশা ধরিয়ে দেওয়া হ'ত (trance)। তাদের খ্যাপাটে কথার

* ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ডারউইন বক্তৃতা।

ব্যাখ্যা করতেন চারপাশের পুরোহিতরা। আসল কায়দা ছিল ব্যাখ্যায়। প্রাচীন গ্রীসে ডেলফির বিখ্যাত দৈবজ্ঞরা দুর্বোধ্যভাবে ঘুরিয়ে উত্তর দেওয়া কিংবা দ্ব্যর্থবোধক কথা বলার জন্য কুখ্যাত ছিল। স্পার্টানরা (Spartans) যখন জিজ্ঞাসা করল, পারসিকরা গ্রীস আক্রমণ করলে কি হবে? দৈবজ্ঞ উত্তর দিল: হয় স্পার্টা ধ্বংস হয়ে যাবে নয়ত তাদের রাজা নিহত হবে। আমার মনে হয় দৈবজ্ঞরা হিসাব করেছিল যদি এই ঘটনাগুলির কোনওটিই না ঘটে তাহলে স্পার্টানরা অ্যাপোলোর কাছে এতই কৃতজ্ঞ হবে যে, তাদের দৈবজ্ঞ যে ভুল করেছিল সেটি তারা অগ্রাহ্য করবে। আসলে থার্মোপলির গিরিপথ রক্ষা করতে গিয়ে রাজা নিহত হন। এই যুদ্ধে স্পার্টা বেঁচে গেল এবং পারসিকরাও শেষ পর্যন্ত হেরে গেল।

আরেকবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী লিডিয়ার রাজা ক্রিসাস (Croesus) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যদি পারস্য আক্রমণ করেন তাহলে কি হবে? উত্তরটি ছিল : এক বিরাট রাজত্বের পতন হবে। ক্রিসাস ভেবেছিলেন এর অর্থ পারসিক রাজত্ব। কিন্তু পতন হল তার নিজের রাজত্বের, তিনি শেষ হলেন চিতাতে। তাঁকে প্রায় জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছিল।

বর্তমান কালের ভবিষ্যৎবক্তারা কাটবার জন্য নিজেদের গলা বাড়িয়ে দিতে আরও বেশি প্রস্তুত। তাঁরা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত তারিখ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর শেয়ার বাজারের দর কমিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা আছে। আমার কিন্তু মাথায় ঢোকে না পৃথিবী ধ্বংস হলে লোকে শেয়ার বেচতে চাইবে কেন? বোধহয় কোনওটিই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না বলে।

এ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্তিম বলে যে কটি তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে তার প্রতিটি তারিখই ঘটনাবিহীন হয়ে কেটেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎবক্তারা অনেক সময়ই এই আপাতদৃষ্ট বিফলতার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণ: 'সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্টদের' (Seventh Day Advantists — একটি ক্রিশ্চান সম্প্রদায়, অনুবাদক) প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 'দ্বিতীয় আগমন' হবে ২১শে মার্চ ১৮৪৩ থেকে ২১শে মার্চ ১৮৪৪ এর ভিতরে। কিছুই যখন হল না তখন তারিখটি সংশোধন করে বলা হল ঘটনাটি ঘটবে ২২শে অক্টোবর ১৮৪৪। সেই তারিখে যখন কোনও ঘটনা ঘটল না তখন একটি নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ১৮৪৪ ছিল 'দ্বিতীয় আগমনের' শুরু। কিন্তু প্রথমে 'বুক অফ লাইফের' (Book of Life) নামগুলি গোনা প্রয়োজন, তারপরেই যাদের

নাম নেই তাদের বিচারের দিন আসবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুণতে দীর্ঘ সময় লাগছে।

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অবশ্যই দৈবজ্ঞ কিংবা ভবিষ্যৎবক্তার চাইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা চিন্তা করলেই এটি বোঝা যাবে। কিন্তু আমরা ভাবি কতগুলি পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। বৃহৎ মানে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সেগুলির ভিতর একটি।

গত তিনশ' বছরে স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থকে শাসন করার বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি আমরা আবিষ্কার করেছি। অত্যন্ত চরম অবস্থায় পদার্থের নির্ভুল শাসনবিধি আমরা এখনও জানি না। মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল, সেটি বুঝবার জন্য এই বিধিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্ব যদি পুনর্বার চুপসে গিয়ে উচ্চ ঘনত্বের অবস্থায় না পৌঁছায়, তাহলে ঐ বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বিবর্তনকে প্রভাবিত করে না। আসলে এই উচ্চশক্তি বিষয়ক বিধিগুলি মহাবিশ্বকে কত অল্প প্রভাবিত করে, এটি তার একটি মাপন। যেহেতু কণিকাগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য দৈত্যাকার কণিকাযন্ত্র তৈরি করতে আমাদের বিরাট অর্থব্যয় করতে হয়, সেইজন্য এই মাপন প্রয়োজন।

যদি বা আমরা মহাবিশ্ব শাসনকারী প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি জানি তবুও সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো সামর্থ্য আমাদের নাও থাকতে পারে। তার কারণ, পদার্থবিদ্যার সমাধানগুলি একটি ধর্ম প্রদর্শন করতে পারে, তার নাম বিশৃঙ্খলা (chaos)। এর অর্থ, সমীকরণগুলি সুস্থির না হতে পারে : একটি তন্ত্রের কর্মপদ্ধতির প্রতিবারে অল্প পরিমাণ পরিবর্তন করুন। তন্ত্রটির পরবর্তী আচরণ শীঘ্রই হতে পারে সম্পূর্ণ পৃথক। উদাহরণ, আপনি যদি একটি রুলেটের (Roulett) চাকার (একরকম জুয়া খেলার চক্রবিশেষ) চক্রণে (spin) সামান্য পরিবর্তন করেন, তাহলে যে সংখ্যাটি উঠবে আপনি সেটারও পরিবর্তন করবেন। কোন্ সংখ্যাটি উঠবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কার্যক্ষেত্রে অসম্ভব। তাহলে পদার্থবিদরা ক্যাসিনোতে [Casino—জুয়াখেলার আড্ডা বিরাট অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

অস্থির এবং বিশৃঙ্খল তন্ত্রে সাধারণত একটি সময়ের মান থাকে। এই সময়ের ভিতরে প্রাথমিক অবস্থার একটি ক্ষুদ্র পরিবর্তন দ্বিগুণ বৃহৎ পরিবর্তনে পরিণত হয়। পৃথিবীর আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এই সময়ের মান পাঁচ দিনের মতো। অর্থাৎ বায়ু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে যে সময় নেয় সেই সময়। পাঁচ দিন পর্যন্ত আবহাওয়া সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। কিন্তু তার

চাইতে বেশিদিন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান প্রয়োজন এবং প্রয়োজন একটি অসম্ভব জটিল গণনা। শুধুমাত্র ঋতুভিত্তিক গড় প্রকাশ করা ছাড়া ছ'মাস পরের আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার কোনও উপায় নেই।

আমরা রসায়ন এবং জীববিদ্যার শাসনকারী মূলগত বিধিগুলি জানি। সুতরাং নীতিগতভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সেটি নির্ধারণ করার সামর্থ্য আমাদের থাকা উচিত। কিন্তু মস্তিষ্কের শাসনকারী সমীকরণগুলির আচরণ প্রায় নিশ্চিতভাবে বিশৃঙ্খল (chaotic) অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য পরিবর্তন একটি অত্যন্ত পৃথক ফলের পথিকৃৎ হতে পারে। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে আমরা মানবিক আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। অথচ আমরা মস্তিষ্কের শাসনকারী সমীকরণগুলি জানি। বিজ্ঞান মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও পূর্বাভাস দিতে পারে না—যদি এ সমাজের কোনও ভবিষ্যৎ থেকে থাকে। বিপদটি হল আমাদের পরিবেশকে দূষিত করার কিংবা পরস্পরকে ধ্বংস করার ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্পর্কে আমাদের প্রজ্ঞা যত দ্রুত বাড়ছে তার চাইতে অনেক বেশি দ্রুত বাড়ছে আমাদের এই ধ্বংস করার ক্ষমতা।

আমাদের পৃথিবীতে যাই হোক না কেন, মহাবিশ্বের অবশিষ্টাংশ সে সম্পর্কে কোনও গ্রাহ্য না করেই চলতে থাকবে। মনে হয় সূর্যের সর্বপার্শ্বে গ্রহগুলির গতি শেষপর্যন্ত বিশৃঙ্খল (chaotic)। যদিও সে বিশৃঙ্খলার কালিক মাপ দীর্ঘ। এর অর্থ কালের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে যে কোনও ভবিষ্যদ্বাণীর ভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। একটি বিশেষ কালের পর এই গতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারি যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুক্র এবং পৃথিবী ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হবে না কিন্তু অক্ষের সামান্য অস্থিরতার যোগ হতে হতে আজ থেকে একশ' কোটি বছর পর দুটি গ্রহ ঐরকম মুখোমুখি হবে না—এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। সূর্য এবং নীহারিকার অন্যান্য তারকা আর স্থানীয় নীহারিকা গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী নীহারিকার গতিও বিশৃঙ্খল (chaotic)। আমরা পর্যবেক্ষণ করি অন্যান্য নীহারিকাগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসরণ করছে। তারা আমাদের কাছ থেকে যত দূরে যায়, তাদের দুরাপসরণের গতিও তত বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ মহাবিশ্ব আমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে প্রসারমান। কালের অগ্রগতির সঙ্গে বিভিন্ন নীহারিকার মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ প্রসারণ মসৃণ, এ প্রসারণ বিশৃঙ্খলও নয়। এর সাক্ষ্য বাইরের স্থান থেকে আগত আমাদের পর্যবেক্ষণ করা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পশ্চাৎপট। আপনার টেলিভিশন শূন্য চ্যানেল লক্ষ্য করে চালালেই এটি আপনি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। আপনার টেলিভিশনের পর্দায় যে ফুট্‌ফুট্‌ চিহ্ন দেখতে পান তার একটি ক্ষুদ্র অংশের কারণ সৌরতন্ত্রের বাইরে থেকে আগত মাইক্রোওয়েভ। আপনি মাইক্রোওয়েভ আভেনে (oven) যে বিকিরণ পান, এ বিকিরণ সেইরকমই তবে অনেক বেশি দুর্বল। খাদ্যের উত্তাপকে এ বিকিরণ চরম শূন্য থেকে ২.৭ তাপমাত্রায় ওঠাতে পারবে। সুতরাং আপনি যে পিজা (Pizza) সঙ্গে নিয়ে যান, সেটিকে এই বিকিরণ দিয়ে গরম করতে পারবেন। মনে হয়, এই বিকিরণ মহাবিশ্বের উত্তপ্ত আদিম স্তরের বিকিরণের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু এর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সবদিক থেকে আগত বিকিরণই মোটামুটি অভিন্ন। 'কসমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড এক্সপ্লোরার স্যাটেলাইট' (Cosmic Background Explorar Satelite—মহাজাগতিক পশ্চাৎপট অনুসন্ধানের উপগ্রহ) এর এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি একটি মানচিত্রে বিকিরণের বিভিন্ন তাপমাত্রা দেখা যাবে। এই তাপমাত্রাগুলি বিভিন্ন অভিমুখে বিভিন্ন। কিন্তু এই ভেদগুলি খুবই সামান্য। এক লক্ষের শুধুমাত্র এক ভাগ। বিভিন্ন অভিমুখ থেকে আগত মাইক্রোওয়েভে কিছুটা পার্থক্য হওয়া উচিত, কারণ মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ মসৃণ নয়, তারকা, নীহারিকা এবং নীহারিকাপুঞ্জের মতো কিছু কিছু স্থানীয় অনিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই মাইক্রোওয়েভ পশ্চাৎপটের ভেদ (variation) যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র এবং যে স্থানীয় অনিয়ম আমরা পর্যবেক্ষণ করি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক লক্ষের ভিতরে ৯৯,৯৯৯ ভাগে মাইক্রোওয়েভ পশ্চাৎপট সমস্ত অভিমুখেই অভিন্ন।

প্রাচীনকালে লোকের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। সুতরাং পশ্চাৎপট সমস্ত অভিমুখেই অভিন্ন এ সংবাদে তাঁরা আশ্চর্য হতেন না। কিন্তু কোপারনিকাসের সময় থেকে আমাদের পদের অবনতি হয়েছে। আমরা এখন দৃশ্যমান দশ হাজার বিলিয়ান নীহারিকার ভিতরে একটি জাতিরূপ (typical) নীহারিকার বাইরের কিনারায় অবস্থিত অত্যন্ত সাধারণ একটি তারকাকে প্রদক্ষিণ করে ভ্রাম্যমান একটি অপ্রধান গ্রহমাত্র। আমরা এখন এতই সামান্য যে মহাবিশ্বে কোনও বিশেষ স্থান দাবী করতে পারি না। সেইজন্য আমাদের অবশ্যই অনুমান করতে হবে, যে কোনও নীহারিকার দিকে, যে কোনও অভিমুখে পশ্চাৎপট অভিন্ন। এটি সম্ভব হতে পারে যদি শুধুমাত্র মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব এবং সম্প্রসারণের হার সর্বত্র অভিন্ন হয়। একটি বিরাট

অঞ্চলে গড় ঘনত্বের কিংবা সম্প্রসারণের হারে যে কোনও ভেদের ফলে মাইক্রোওয়েভ পশ্চাৎপট বিভিন্ন অভিমুখে বিভিন্ন হবে। এর অর্থ অতি বৃহৎ মানে মহাবিশ্বের আচরণ সরল কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়। সুতরাং সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

যেহেতু মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এত সুষম, সেইজন্য এর বিবরণ একটি সংখ্যার বাগ্বিধিতে দেওয়া সম্ভব, সে সংখ্যাটি দুটি নীহারিকার অন্তর্বর্তী দূরত্ব। বর্তমানে এই দূরত্ব বর্দ্ধমান কিন্তু আশা করা যায় বিভিন্ন নীহারিকার পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এই প্রসারণের হার কমিয়ে দেবে। মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি একটি ক্রান্তিক মূল্যাঙ্কের চাইতে বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পরিণামে সম্প্রসারণকে থামিয়ে দেবে এবং মহাবিশ্ব আবার সঙ্কোচন শুরু করবে। মহাবিশ্ব একটি বৃহৎ সঙ্কোচনে চুপসে যাবে। বৃহৎ বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল, এই সঙ্কোচন হবে অনেকটা সেই রকম। বৃহৎ সঙ্কোচন হবে যাকে অনন্যতা বলে তাই। এটি একটি অসীম ঘনত্বের অবস্থা--এ অবস্থায় পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি ভেঙে পড়ে। এর অর্থ বৃহৎ সঙ্কোচনের পর যদি কোনও ঘটনা ঘটেও থাকত, তাহলেও সে সময়ে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না। কিন্তু ঘটনাগুলির ভিতর কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকলে, একটি ঘটনা আর একটির পর ঘটেছিল এ কথা বলার কোনও অর্থবহ উপায় থাকে না। এ কথাও বলা যেতে পারে, বৃহৎ সঙ্কোচনে আমাদের মহাবিশ্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর যদি কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সে ঘটনা অন্য একটি পৃথক মহাবিশ্বের ঘটনা। এটা অনেকটা পুনর্জন্মের মতো। পূর্বে মৃত একটি শিশু এবং নতুন একটি শিশু অভিন্ন এই দাবীর কি অর্থ হতে পারে, যদি নতুন শিশুটির পূর্বজন্ম থেকে প্রাপ্ত কোনও বৈশিষ্ট্য কিংবা স্মৃতি না থাকে? সহজেই বলা যেতে পারে ও একটি পৃথক ব্যক্তি।

মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের চাইতে অল্প হয় তাহলে মহাবিশ্ব আবার চুপসে যাবে না এবং চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে। একটি বিশেষ কালের পর ঘনত্ব এত কম হবে যে প্রসারণ হ্রাস করার উপর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া থাকবে না। নীহারিকাগুলি একটি স্থির দ্রুতিতে পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ করতে থাকবে।

সুতরাং মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিনিশ্চায়ক প্রশ্ন : গড় ঘনত্ব কত? যদি ক্রান্তিক ঘনত্বের চাইতে এ ঘনত্ব কম হয় তাহলে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে। কিন্তু যদি বেশি হয় তাহলে মহাবিশ্ব আবার চুপসে

যাবে এবং বৃহৎ সঙ্কোচনে কাল নিজেই শেষ হয়ে যাবে। ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করাতে দৈবজ্ঞের তুলনায় আমার একটি সুবিধা আছে। যদি এই হয় যে মহাবিশ্ব চুপসে যেতে চলেছে তাহলেও আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি আরও এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হবে না। আমার ভুল হয়েছে প্রমাণিত হওয়ার জন্য অতদিন আমি বেঁচে থাকব না।

পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব হিসাব করার চেষ্টা করতে পারি। দৃশ্যমান তারকাগুলি যদি আমরা গণনা করি এবং তাদের ভরগুলি যোগ করি তাহলে আমরা ক্রান্তিক ঘনত্বের শতকরা এক ভাগের চাইতেও কম পাই। মহাবিশ্বে আমরা যে বায়বীয় পদার্থের মেঘ দেখতে পাই, সেগুলির ভর যদি আমরা যোগ করি তাহলেও মোট যোগফল হয় প্রান্তিক মূল্যাঙ্কের শতকরা এক ভাগের চাইতেও কম। তবে আমরা জানি যাকে অদীপ্ত (dark) পদার্থ বলা হয় মহাবিশ্বে সে রকম পদার্থও নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমরা সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। এই অদীপ্ত পদার্থগুলি সম্পর্কে একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় সর্পিল নীহারিকাগুলি থেকে। এগুলি বিশাল প্যানকেকের* মতো গঠনের, বায়বীয় পদার্থ এবং তারকার সংগ্রহ। আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেগুলি কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘূর্ণায়মান কিন্তু ঘূর্ণনের হার যথেষ্ট উচ্চ। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি যদি সেই তারকা এবং বায়বীয় পদার্থই থাকত তাহলে সেগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যেত। নিশ্চয়ই এমন কিছু অদৃশ্য ধরনের পদার্থ আছে, যার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ঘূর্ণায়মান নীহারিকাগুলিকে ধরে রাখার মতো যথেষ্ট বেশি।

অদীপ্ত পদার্থ সম্পর্কে আর একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় নীহারিকাপুঞ্জগুলি থেকে। আমরা পর্যবেক্ষণ করি নীহারিকাগুলি সমস্ত স্থানে সমভাবে বণ্টিত নয়। তারা পুঞ্জে পুঞ্জে সংগৃহীত। কোনও পুঞ্জে আছে কয়েকটি মাত্র নীহারিকা, আবার কোনও পুঞ্জে নিযুত নিযুত নীহারিকা, সম্ভবত নীহারিকাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় বলে এই পুঞ্জগুলি গঠিত হয়। তবে এই পুঞ্জগুলির ভিতরে একক নীহারিকাগুলি কি দ্রুতিতে চলমান সেটা মাপা সম্ভব। আমরা দেখতে পাই, দ্রুতি এত বেশি যে কোনও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত না হলে তারা ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে যেত (fly apart)। যে ভর প্রয়োজন, সেটি সমস্ত নীহারিকার সংযুক্ত ভরের চাইতে অনেক বেশি। যদি

* প্যানকেক-ধোসা, পাটিসাপটা, সরুচাকলি ইত্যাদির মতো পিঠে।

আমরা ধরে নিই নীহারিকাগুলিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় একত্র ধরে রাখবার মতো ভর তাদের রয়েছে, তাহলেও এ তথ্য সত্য। এ থেকে মনে হয়—সেই জন্য যে নীহারিকাগুলিকে আমরা দেখতে পাই, তার বাইরে নীহারিকাপুঞ্জের ভিতরে অতিরিক্ত অদীপ্ত (dark) পদার্থ রয়েছে।

যে সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিশ্চিত সাক্ষ্য আমরা পাই, সেই নীহারিকা এবং নীহারিকা পুঞ্জগুলির ভিতরে যে অদীপ্ত পদার্থ বর্তমান, সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য একটি অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু এই হিসাবও মহাবিশ্বের আর একবার চুপসে যাওয়ার জন্য যে ক্রান্তিক ঘনত্বের প্রয়োজন তার শতকরা প্রায় দশভাগ মাত্র। সুতরাং কেউ যদি পর্যবেক্ষিত সাক্ষ্য দিয়ে চালিত হন, তাহলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী হবে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতেই থাকবে। আর কম বেশি পাঁচশ' কোটি বছর পর সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে, তখন সেটি ফুলে, যাকে লোহিত দৈত্য বলা হয়, তাতে পরিণত হবে। যতদিন না এই সূর্যটি পৃথিবী এবং অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রহগুলিকে গ্রাস করে, ততদিন এইভাবেই থাকবে। তারপরে সেটা কয়েক হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের একটি শ্বেত বামন তারকারূপে স্থিতিলাভ করবে। সুতরাং, আমি বিশ্বের অন্ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বলা হয়নি। আমার মনে হয় না, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে শেয়ার বাজারের দাম খুব বেশি কমবে। দিগন্তে আরও দু-একটি তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যাই হোক না কেন, যতদিনে সূর্য বিস্ফোরিত হবে, ততদিনে আমরা আন্তঃতারকা ভ্রমণের প্রযুক্তি রপ্ত করে ফেলব, অবশ্য তার আগে যদি আমরা নিজেদের ধ্বংস না করে ফেলি।

প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের অধিকাংশ তারকাই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সূর্যের মতো ভরের তারকাগুলি হয় শ্বেত বামন নয়ত নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে। নিউট্রন তারকাগুলি শ্বেত বামনের (white dwarf) চাইতে ক্ষুদ্র এবং ঘন। আরও বেশি ভরযুক্ত তারকাগুলি কৃষ্ণগহ্বর হতে পারে। সেগুলি আরও ক্ষুদ্র। সেগুলির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র খুবই শক্তিশালী। কোনও আলোক সেখান থেকে পলায়ন করতে পারে না। তবে, এই অবশিষ্টাংশগুলি তখনও আমাদের নীহারিকার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে, প্রদক্ষিণ করবে প্রায় দশ কোটি বছরে একবার। অবশিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মুখোমুখি হওয়ার দরুন কয়েকটি নীহারিকা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। অবশিষ্ট অংশ কেন্দ্রে সর্বদিকে ঘনিষ্ঠতর কক্ষে সুস্থির হয়ে থাকবে এবং পরিণামে একত্রিত হয়ে নীহারিকার কেন্দ্রে একটি বিশাল কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করবে। নীহারিকা এবং নীহারিকাপুঞ্জের ভিতরকার অদীপ্ত পদার্থ যাই হোক না কেন,

সেগুলিও ঐ অতি বিশাল কৃষ্ণগহ্বরগুলির ভিতর পতিত হবে বলে আশা করা যায়।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, নীহারিকা এবং নীহারিকাপুঞ্জের ভিতরকার পদার্থগুলির অধিকাংশকেই পরিণামে কৃষ্ণগহ্বরে গিয়ে শেষ হতে হবে। তবে কিছুদিন আগে আমি আবিষ্কার করেছি কৃষ্ণগহ্বরগুলিকে যত কৃষ্ণবর্ণ বলে প্রচার করা হয় গহ্বরগুলি তত কৃষ্ণ নয়। কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি বলে, কণিকাগুলির সুসংজ্ঞিত অবস্থান এবং সুসংজ্ঞিত দ্রুতি দুটিই যুগপৎ থাকতে পারে না। কণিকার অবস্থান যত নির্ভুলভাবে সুসংজ্ঞিত হবে তত কণিকার দ্রুতি সুসংজ্ঞিত হবে কম নির্ভুলভাবে। একটি কণিকা যদি কৃষ্ণগহ্বরে থাকে, তাহলে তার অবস্থান কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে সুসংজ্ঞিত। এর অর্থ তার দ্রুতি নির্ভুলভাবে সংজ্ঞিত করা যায় না। সেইজন্য কণিকাটির দ্রুতি আলোকের দ্রুতির চাইতে বেশি হওয়া সম্ভব। এর ফলে কণিকাটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে পলায়ন করতে পারবে। একটি নীহারিকার কেন্দ্রের বিশাল দৈত্যাকার কৃষ্ণগহ্বর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বহু নিযুত মাইল হতে পারে, ফলে এর ভিতরকার কণিকার অবস্থানের একটি বিরাট অনিশ্চয়তা থাকবে। সেইজন্য কণিকাটির দ্রুতির অনিশ্চয়তা হবে সামান্য। এর অর্থ কৃষ্ণগহ্বর থেকে পলায়ন করতে অনেক বেশি সময় লাগবে। কিন্তু পরিণামে কণিকাটি পলায়ন করবে। নীহারিকার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বর উবে গিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে $১০^{৯০}$ বছর লাগতে পারে অর্থাৎ একের পিঠে নব্বইটি শূন্য। এই কাল মহাবিশ্বের আধুনিক বয়সের চাইতে অনেক বেশি। মহাবিশ্বের বয়স $১০^{১০}$ বছর অর্থাৎ একের পিঠে দশটি শূন্য। তবুও মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকলে তার জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে।

যে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে, তার ভবিষ্যৎটি বড় একঘেয়ে। তবে মহাবিশ্ব যে চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। মহাবিশ্বের পুনর্বার চুপসে যাওয়ার জন্য যে ঘনত্ব প্রয়োজন তার প্রায় এক দশমাংশ সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট নিশ্চিত সাক্ষ্য রয়েছে, তবুও আমরা শনাক্ত করতে পারিনি। এরকম অন্য ধরনের অদীপ্ত পদার্থ থাকতে পারে। সেই পদার্থগুলি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বে নিয়ে যেতে পারে। কিংবা তার চাইতে বেশিও করে দিতে পারে। এই অতিরিক্ত অদীপ্ত পদার্থগুলির অবস্থান হতে হবে নীহারিকাগুলি এবং নীহারিকাপুঞ্জগুলির বাইরে। না হলে আমরা নীহারিকাগুলির আবর্তনে কিংবা নীহারিকাপুঞ্জের গতিতে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

করতে পারতাম।

আমরা যেন ভাবব, মহাবিশ্বের পরিণামে আবার চুপসে যাওয়ার মতো যথেষ্ট অদীপ্ত পদার্থ থাকতে পারে? যে পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট নিশ্চিত সাক্ষ্য আছে, কেন আমরা তার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করব না? কারণটি হল, বর্তমানে ক্রান্তিক ঘনত্বের শুধুমাত্র দশভাগ থাকার জন্য প্রাথমিক ঘনত্ব এবং প্রসারণের হারের একটি অবিশ্বাস্য রকম সযত্ন নির্বাচন প্রয়োজন ছিল। যদি বরং বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর মহাবিশ্বের ঘনত্ব দশ কোটি ভাগের একভাগ বেশি হ'ত তাহলে মহাবিশ্ব দশ বছর বাদে আবার চুপসে যেত। আবার ঘনত্ব যদি একই পরিমাণে কম হ'ত, তাহলে দশ বছরের কাছাকাছি বয়স হওয়ার পর থেকে মহাবিশ্ব মূলত শূন্য থাকত।

মহাবিশ্বে প্রাথমিক ঘনত্ব এত সযত্নে নির্বাচন করা হয়েছিল কিভাবে? মহাবিশ্বে নির্ভুল ক্রান্তিক ঘনত্ব থাকার হয়ত কোনও কারণ আছে। দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মনে হয়। একটি হল তথাকথিত নরত্বীয় নীতি (anthropic principle), সেটি এই বাধিধিতে প্রকাশ করা যায় : মহাবিশ্ব যে রকম আছে, সে রকম থাকার কারণ অন্যরকম হলে সেটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত থাকতাম না। কল্পনটি হল—বিভিন্ন ঘনত্বসম্পন্ন বহু বিভিন্ন মহাবিশ্ব থাকতে পারে। শুধুমাত্র যেগুলি ক্রান্তিক ঘনত্বের খুবই কাছাকাছি সেগুলিরই তারকা এবং গ্রহ গঠন করার মতো দীর্ঘায়ু এবং যথেষ্ট পদার্থ সমন্বিত হওয়ার কথা। একমাত্র সেই সমস্ত বিশ্বেই বুদ্ধিমান জীবরা থাকতে পারে যারা এই প্রশ্ন করবে— ঘনত্বটি কেন ক্রান্তিক ঘনত্বের এত কাছাকাছি? মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্বের যদি এই ব্যাখ্যা হয়, তাহলে আমরা যা বুঝতে পেরেছি মহাবিশ্বে তার চাইতে বেশি পদার্থ আছে সেটি বিশ্বাস করার কোনও যুক্তি নেই। ক্রান্তিক ঘনত্বের এক দশমাংশ থাকাই নীহারিকা এবং তারকা গঠিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

নরত্বীয় নীতি (anthropic principle) অনেকেই পছন্দ করেন না। তার কারণ এ নীতি আমাদের অস্তিত্বের উপর বড় বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। সেইজন্য ঘনত্ব কেন ক্রান্তিক ঘনত্বের এত নিকট হবে তার সম্ভাব্য অন্য ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অনুসন্ধান মহাবিশ্বে অতিপ্রসারণ তত্ত্বের পথ দেখিয়েছে। কল্পনটি হল ঠিক যেমন যে সমস্ত দেশে চরম মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, সেই সমস্ত দেশে কয়েক মাস পরপর মূল্যমান দ্বিগুণিত হয়। তবে মহাবিশ্বের অতিস্ফীতি (inflation) অনেক দ্রুত এবং আরও অনেক বেশি চরম হওয়ার কথা : এই

স্ফীতির গুণক (factor) একটি অতি ক্ষুদ্র স্ফীতিতে অন্ততপক্ষে এক বিলিয়ান, বিলিয়ান, বিলিয়ান, এর ফলে মহাবিশ্ব নির্ভুল ক্রান্তিক ঘনত্বের এত নিকট হ'ত যে, সেটি বর্তমান কালেও ক্রান্তিক ঘনত্বের খুব কাছাকাছি থাকত। সুতরাং অতিস্ফীতি তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তাহলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বে নিয়ে আসবার মতো যথেষ্ট অদীপ্ত পদার্থ অবশ্যই থাকবে। এর অর্থ, পরিণামে মহাবিশ্ব হয়ত পুনর্বার সঙ্কুচিত হবে কিন্তু যে দেড় কোটি বছরের কাছাকাছি মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে তার চাইতে বেশি দীর্ঘকাল নয়।

অতিস্ফীতি তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তাহলে ঐ অতিরিক্ত অদীপ্ত (dark) পদার্থগুলি কি? মনে হয়, এগুলি হয়ত বিভিন্ন ধরনের সাধারণ পদার্থ, যে পদার্থ দিয়ে তারকা এবং গ্রহগুলি গঠিত তার চাইতে পৃথক। বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রথম তিন মিনিটের ভিতরে মহাবিশ্বের উত্তপ্ত আদিম স্তরে যে নানারকম হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলির সৃষ্টি হ'ত তার পরিমাণের একটি গণনা আমরা করতে পারি। এই হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলির (light element) পরিমাণ নির্ভর করে মহাবিশ্বের স্বাভাবিক পদার্থের পরিমাণের উপর হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলির পরিমাণ আনুভূমিক অক্ষে রেখে লেখচিত্র (graph) করা যায়। যদি স্বাভাবিক পদার্থের মোট পরিমাণ এখনকার ক্রান্তিক পরিমাণের মাত্র এক দশমাংশ হয়, তাহলে পর্যবেক্ষণ করা প্রাচুর্যের, সঙ্গে একটি উত্তম মতৈক্য পাওয়া যায়। হতে পারে এই গণনাগুলি ভুল। কিন্তু আমরা কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ভিতরে এই পর্যবেক্ষণ করা প্রাচুর্য পাই—এ তথ্য মনকে খুবই প্রভাবিত করে।

যদি আমরা অদীপ্ত পদার্থের ক্রান্তিক ঘনত্ব পাই তাহলে সেগুলি কি হতে পারে সে বিষয়ে প্রথম প্রার্থী (candidate) হবে মহাবিশ্বের আদিম স্তর থেকে পড়ে থাকা অবশিষ্ট একটি সম্ভাবনা— মৌলকণা। অনেকগুলি প্রকল্পিত প্রার্থী (hypothetical candidates) আছে। সেগুলি এমন কণিকা যার অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু আমরা তাদের এখনও সঠিক শনাক্ত করতে পারিনি। তবে যে সম্পর্কে আমাদের সবচাইতে বেশি আশা সে কণিকা সম্পর্কে আমাদের ভাল সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে—সেটার নাম নিউট্রিনো। আগে ভাবা হ'ত এর নিজের কোনও ভর নেই কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণে অনুভাবন (suggestion) পাওয়া যায়—নিউট্রিনোর একটি ক্ষুদ্র ভর থাকতে পারে। এ তথ্য যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় এবং দেখা যায় তার মূল্যাঙ্ক সঠিক, তাহলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তিক ঘনত্বে নিয়ে আসবার মতো পর্যাপ্ত ভর নিউট্রিনো থেকে পাওয়া যাবে।

আর একটি সম্ভাবনা হতে পারে কৃষ্ণগহ্বর। আদিম মহাবিশ্ব, যাকে বলা হয়

দশা রূপান্তর (phase transition), তার ভিতর দিয়ে গিয়েছে। জলের জমে যাওয়া এবং ফোটা (boiling) দশা রূপান্তরের উদাহরণ। দশা রূপান্তরে প্রথমে একটি জলের মতো সমরূপ মাধ্যমে অনিয়ম প্রকাশ পায়। জলের ক্ষেত্রে সেটি হতে পারে বরফের ঢেলা কিংবা বাষ্পের বুদ্বুদ্। এই অসমাঙ্গতা (irregularities) চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর গঠন করতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরগুলি খুবই ক্ষুদ্র হলে এতদিনে তারা উবে যেত। তার কারণ কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির ক্রিয়া। এ সম্পর্কে এর আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি যদি কয়েক বিলিয়ান টনের বেশি হ'ত (একটি পর্বতের ভর) তাহলে সেগুলি আজও পাওয়া যেত এবং সেগুলিকে শনাক্ত করা খুবই কঠিন হ'ত।

মহাবিশ্বে সমরূপে বণ্টিত অদীপ্ত পদার্থ শনাক্ত করার একমাত্র উপায় মহাবিশ্বের প্রসারণের উপরে তার ক্রিয়া নির্ধারণ। দূরস্থিত নীহারিকাগুলি যে দ্রুতিতে আমাদের কাছ থেকে অপসরণ করছে সেই দ্রুতি মেপে আমরা নির্ধারণ করতে পারি প্রসারণ কত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাপারটি হল : এই নীহারিকাগুলিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি সুদূর অতীতের অবস্থায় অর্থাৎ যখন আলো ঐ নীহারিকাগুলি ত্যাগ করে আমাদের দিকে আসতে শুরু করেছে তখনকার দিনের অবস্থা। আমরা নীহারিকাগুলির আপাতদৃষ্ট উজ্জ্বলতা কিংবা পরিমাণগত মাপের (magnitude) পশ্চাৎপটে নীহারিকাগুলির দ্রুতির একটি লেখচিত্র আঁকতে পারি—এটা আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের মাপ। কিন্তু মুশকিল হল একটি নীহারিকার আপাতদৃষ্ট ঔজ্জ্বল্য আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের উত্তম নির্দেশক নয়, তাছাড়া এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে, কালের সঙ্গে তাদের ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন হয়। যেহেতু উজ্জ্বলতার বিবর্তনের জন্য কতটা অনুমোদন করা উচিত সেটা আমরা জানি না সেইজন্য হ্রাসের হার আমরা বলতে পারি না : পরিণামে চুপসে যাওয়ার মতো যথেষ্ট দ্রুত কিনা কিংবা চিরকাল এটি প্রসারিত হতেই থাকবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা নীহারিকাগুলির দূরত্ব মাপার আরও ভাল উপায় বার করতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের এ বিচার স্থগিত রাখতে হবে। তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি গতি শ্লথ হওয়ার হার এত দ্রুত নয় যে আগামী কয়েকশ' কোটি বছরে মহাবিশ্ব চুপসে যাবে।

অনন্তকাল প্রসারণ কিংবা দশ হাজার কোটি বছরের কাছাকাছি পুনর্বার চুপসে যাওয়া খুব একটি উত্তেজিত হওয়ার মতো ভবিষ্যৎ নয়। ভবিষ্যৎকে আকর্ষণীয় করার মতো কোনও উপায় কি আমাদের নেই? ভবিষ্যৎকে

আকর্ষণীয় করার একটি নিশ্চিত উপায় আছে। সে উপায় – একটি কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে পড়া। কৃষ্ণগহ্বরটি বেশ বড় হতে হবে। তার ভর হতে হবে সূর্যের চাইতে দশ লক্ষ গুণেরও বেশি। আমাদের নীহারিকার কেন্দ্রে ঐ রকম বড় একটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে।

কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে কি ঘটে সে সম্পর্কে আমরা খুব নিশ্চিত নই। ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমীকরণগুলির এমন কতগুলি সমাধান আছে যেগুলি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয়ে অন্য কোথাও শ্বেতগহ্বর দিয়ে বেরিয়ে আসা অনুমোদন করে। একটি শ্বেতগহ্বর একটি কৃষ্ণগহ্বরের কালিক বিপরীত। এটি এমন একটি বস্তুপিণ্ড যা থেকে জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু কোনও জিনিস যার ভিতর পড়তে পারে না। শ্বেতগহ্বর মহাবিশ্বের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত হতে পারে। মনে হয়, এর ফলে দ্রুত আন্তঃনীহারিকা ভ্রমণের একটি সম্ভাবনা হতে পারে। মুশকিল হল, ভ্রমণটি অতিরিক্ত দ্রুত হতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ যদি সম্ভব হ'ত তাহলে রওনা হওয়ার আগে ফিরে আসতে দেওয়ার বাধা কিছু থাকত বলে মনে হয় না। আপনি যদি আপনার মা-কে হত্যা করার মতো একটা কিছু করতে পারতেন তাহলে প্রথমত আপনার যাওয়াটা বন্ধ হ'ত।

হয়ত আমাদের জীবন রক্ষার (এবং আমাদের মায়েদের জীবন রক্ষার) জন্য সৌভাগ্যক্রমে পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি এইরকম কালে ভ্রমণ অনুমোদন করে না। মনে হয় একটি কাল-নির্ঘণ্ট রক্ষার নিযুক্তক (Chronology Protection Agency) আছে। তার কাজ অতীতে ভ্রমণ বন্ধ করে পৃথিবীকে ঐতিহাসিকদের জন্য নিরাপদ করা। যা হবে বলে মনে হয় সেটা হল অনিশ্চয়তার নীতির ক্রিয়ায় কেউ অতীতে ভ্রমণ করলে অত্যন্ত বেশি বিকিরণ হবে। এই বিকিরণ স্থান-কালকে এমনভাবে মুচড়ে বিকৃত করবে (warp) যে অতীতে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিংবা স্থান-কালকে বৃহৎ বিস্ফোরণ কিংবা বৃহৎ সঙ্কোচনের মতো একটি অনন্যতায় এনে একেবারে শেষ করে দেবে। যাই হোক না কেন, আমাদের অতীতকে কিছু দুষ্ট লোক বিপদে ফেলতে পারবে না। আমি এবং আর কয়েকজনের গণনা থেকে কাল-নির্ঘণ্ট সুরক্ষা প্রকল্প সমর্থিত হয়। তবে, কালে ভ্রমণ যে সম্ভব নয় এবং কখনও সম্ভব হবে না, তার সবচাইতে ভাল সাক্ষ্য প্রমাণ : ভবিষ্যৎ থেকে দলে দলে ভ্রমণকারী আমাদের দিকে অভিযান করেননি।

সংক্ষিপ্তসার : বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন মহাবিশ্ব সুসংজ্ঞিত (well defince) বিধির দ্বারা শাসিত। এই বিধিগুলি নীতিগতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা

অনুমোদন করে। এই বিধিগুলির প্রদত্ত গতি অনেক সময় বিশৃঙ্খল। এর অর্থ প্রাথমিক অবস্থায় অতিক্ষুদ্র পরিবর্তন পরবর্তী আচরণের পরিবর্তনের দ্রুত বৃদ্ধির পথিকৃৎ হতে পারে—পরিবর্তন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য কার্যক্ষেত্রে ভবিষ্যতে শুধুমাত্র খুব অল্পকাল বিষয়ে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। তবে খুব বৃহৎ মানে মহাবিশ্বের আচরণ সরলই মনে হয়, বিশৃঙ্খল নয়। সেইজন্য মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারমান থাকবে, না পরিণামে আবার চুপসে যাবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। এটা নির্ভর করে মহাবিশ্বের বর্তমান ঘনত্বের উপর। আসলে যে ক্রান্তিক ঘনত্ব মহাবিশ্বের অনন্তকাল প্রসারিত হওয়া কিংবা আবার চুপসে যাওয়া নির্ধারণ করে সেই ঘনত্ব এবং বর্তমান ঘনত্ব খুবই সন্নিকট। যদি অতিস্ফীতি (inflation) তত্ত্ব সঠিক হয়, তাহলে মহাবিশ্বের অবস্থান ক্ষুরের ধারের উপর। সুতরাং দৈবজ্ঞ এবং ভবিষ্যৎবক্তাদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অনুসরণ করে, আমি দু'রকম কথা বলে নিজের ভবিষ্যদ্বাণীকে রক্ষা করি।

চৌদ্দ

মরুদ্বীপের (Desert Island) রেকর্ড : একটি সাক্ষাৎকার

ডিস্কের অর্থ চাকতি। সাধারণ গ্রামোফোন রেকর্ডকে চাকতি বলা হয়। বি বি সি'র (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন) মরুদ্বীপের রেকর্ড 1942 সালে বেতারে প্রচার শুরু হয়। রেডিও-তে সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ডের প্রোগ্রাম এটাই। এতদিনে এ প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা জাতীয় রীতির মতো। এত বছরে অতিথিদের সংখ্যা এবং পাল্লা (range) হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট। এই কার্যক্রমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে লেখক, অভিনেতা, সঙ্গীতবিদ, সিনেমার অভিনেতা এবং পরিচালক, ক্রীড়াজগতের গুরুত্বপূর্ণ লোক, হাস্যকৌতুকে বিখ্যাত, রাঁধুনি, উদ্যানপালক, শিক্ষক, নৃত্যশিল্পী, রাজনৈতিক নেতা, রাজবংশের লোক, ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের একটা বিলাস দ্রব্য (সেটা জীবন্ত কিছু হতে পারবে না) এবং একটা বই সঙ্গে নিতে বলা হয় (ধরে নেওয়া হয় বাইবেল, কোরান কিংবা ঐরকম একখানা বই

সেখানে আগে থেকেই রয়েছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে শেক্সপীয়ারের একটা রচনাবলী)। এছাড়া ধরে নেওয়া হয়, রেকর্ড বাজানোর একটা ব্যবস্থা তাঁদের রয়েছে। প্রথম দিকে এই কর্মসূচী উপস্থিত করার শুরুতে ঘোষণা করা হ'ত 'অনুমান করা হচ্ছে একটা গ্রামোফোন এবং সেটা বাজানোর জন্য অফুরন্ত পিন রয়েছে।' আজকাল একটা সৌরশক্তিচালিত C.D. (কম্প্যাক্ট ডিস্ক) হাতের কাছে রয়েছে এবং চালানো সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়। এই বেতার প্রচার প্রতি সপ্তাহেই হয়। অতিথিদের নির্বাচিত রেকর্ডগুলি এই সাক্ষাৎকারের সময় বাজানো হয়। এই সাক্ষাৎকার সাধারণত ৪০ মিনিট চলে। তবে স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের বড়দিনে। এই সাক্ষাৎকার ছিল একটা ব্যতিক্রম। কারণ এটা চলেছিল ৪০ মিনিটের বেশি। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন স্যু ল্যালি (Sue Lawley)।

স্যু : স্টিফেন, আপনি অবশ্য অনেকরকমভাবেই মরুদ্বীপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার সঙ্গে পরিচিত। ভৌতজীবদের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগসূত্র আপনার ছিন্ন এবং যোগাযোগ রক্ষার স্বাভাবিক ব্যবস্থা থেকে আপনি বঞ্চিত। এই একাকিত্ব আপনার কিরকম মনে হয়?

স্টিফেন : আমি নিজেকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করি না। আমার মনে হয় আমার পারিপার্শ্বিক লোকজনও সে রকম মনে করেন না। আমি নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না। আমি শুধু মনে করি আমার দেহের মোটর নিউরনগুলির কাজকর্মে কিছু গোলমাল হচ্ছে—যাঁরা রঙ বুঝতে পারে না—আমার অবস্থা অনেকটা তাঁদের মতো। মনে হয় আমার জীবনকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। তবে আমি বোধ করি, মনের দিক দিয়ে আমি স্বাভাবিক।

স্যু : আপনি নিজের কাছে এর আগেই প্রমাণ করেছেন, মরুদ্বীপে রেকর্ডের অধিকাংশ দ্বীপান্তরবাসীদের মতো আপনি নন। মানসিক এবং বৌদ্ধিকভাবে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার মতো যথেষ্ট তত্ত্ব এবং প্রেরণা আপনার রয়েছে।

স্টিফেন : আমার মনে হয় স্বভাবত আমি একটু অন্তর্মুখী। যোগাযোগ ক্ষমতার অসুবিধার জন্য আমার নিজের উপর বিশ্বাস করতে হয়েছে। কিন্তু বাল্যকালে আমি প্রচুর কথা বলতাম। নিজেকে উদ্দীপ্ত করার জন্য অন্যের সঙ্গে আলোচনা আমার প্রয়োজন। আমার চিন্তাধারার বিবরণ অন্যকে দিলে আমার খুবই সহায়তা হয় বলে দেখতে পাই। তাঁরা যদি কোনও অনুভাষণ (suggestion) আমাকে নাও দান করেন তাহলেও অন্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য

আমার যে নিজের চিন্তনকে সংগঠিত করতে হচ্ছে, তার ফলে অনেক সময়ই আমি অগ্রগতির নতুন পথ দেখতে পেয়েছি।

স্যু : কিন্তু স্টিফেন, মনের ভাবাবেগের পূর্ণতা আপনি কিভাবে পান? খুব প্রতিভাবান পদার্থবিদেরও এই পূর্ণতার জন্য অন্য মানুষ প্রয়োজন হয়।

স্টিফেন : পদার্থবিদ্যা খুবই ভাল জিনিষ, তবে সম্পূর্ণ ভাবাবেগবর্জিত। শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারতাম না। অন্য সবার মতোই আমার প্রয়োজন উষ্ণতা, প্রেম এবং ভালবাসা। তবে আমার মতো অসামর্থ্য যাদের আছে, তাদের চাইতে আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান। প্রচুর প্রেম এবং ভালবাসা আমি পাই। আমার কাছে সঙ্গীতেরও খুব গুরুত্ব আছে।

স্যু : বলুন তো, কিসে আপনি বেশি আনন্দ পান—পদার্থবিদ্যায় না সঙ্গীতে?

স্টিফেন : আমি বলতে পারি পদার্থবিদ্যায় যখন সবকিছু ঠিক ঠিক হয় তখন আমি যে তীব্র আনন্দ পাই সঙ্গীতে আমি সেরকম আনন্দ কখনও পাইনি। কিন্তু একজনের কর্মজীবনে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা কয়েকবারই ঘটে। কিন্তু রেকর্ড খুশিমতো বাজানো যায়।

স্যু : আপনার মরুদ্বীপে কোন রেকর্ডটা আপনি প্রথম বাজালেন?

স্টিফেন : পুলেঙ্ক-এর (Poulenc) গ্লোরিয়া (Gloria)। আমি এটা প্রথম শুনেছিলাম কলোরাডো (Colorado)-র অ্যাসপেন (Aspen)-এ। অ্যাসপেন মূলত একটি স্কী খেলার জায়গা। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সেখানে পদার্থবিদ্যার সভা হয়। পদার্থবিদ্যা-কেন্দ্রের পাশেই একটা বিরাট তাঁবু রয়েছে। সেখানে হয় তাঁদের সঙ্গীত উৎসব। কৃষ্ণগহ্বরগুলি যখন উবে যায়, তখনকার সমস্যা ভাবতে ভাবতে আপনি সঙ্গীতের মহড়া শুনতে পাবেন। ব্যাপারটা আদর্শ। পদার্থবিদ্যা এবং সঙ্গীত আমার এই দুটি আনন্দ এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়। দুটিই যদি আমি মরুদ্বীপে পাই, তাহলে আমি চাইব না কেউ আমাকে উদ্ধার করুক। অন্তত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যতদিন না আমি এমন আবিষ্কার করছি যে সম্পর্কে আমি সবাইকে বলতে চাই। আমার মনে হয় পদার্থবিদ্যার গবেষণাপত্রগুলি ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়ার জন্য একটা উপগ্রহের ডিশ (Satellite dish) থাকা নিয়মবিরুদ্ধ।

স্যু : বেতার ভৌত দৈহিক খুঁত লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আড়াল করা হবে অন্য কিছু। সাত বছর আগে আপনি নিজের কণ্ঠস্বর হারিয়েছিলেন। বলতে পারেন কি হয়েছিল?

স্টিফেন : ১৯৮৫ সালে গ্রীষ্মকালে আমি জেনেভার সার্ন (Cern)-এ বৃহৎ কণিকা ত্বরণ যন্ত্রের কাছে ছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ওয়াগনার-এর রিং সাইকেল নামে অপেরাগুলি (Wagner's Ring cycle of operas) শুনতে জার্মানীর বেরুথ (Bayreuth) যাওয়া। কিন্তু আমার নিউমোনিয়া হল। ফলে আমাকে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জেনেভার হাসপাতাল আমার স্ত্রীকে বলল—জীবন রক্ষার যন্ত্রটা চালিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজি হলেন না। আমাকে বিমানে করে কেম্‌ব্রিজে এ্যাডেনব্রুকস্ (Addenbrookes) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে রজার গ্রে (Roger Grey) নামে একজন সার্জেন আমার উপর ট্রাকিওস্টমি অপারেশান করেন। এই অপারেশানে আমার জীবন বাঁচল কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর চলে গেল।

স্যু : কিন্তু যাই হোক না কেন, ততদিনে আপনার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল এবং বোঝাও খুব কষ্ট ছিল—তাই না? অনুমান করা যায় আপনার কথা বলার ক্ষমতা শেষপর্যন্ত চলেই যেত--তাই হ'ত না?

স্টিফেন : আমার কণ্ঠস্বর যদিও জড়ানো ছিল এবং বোঝাও ছিল শক্ত, তবুও আমার কাছাকাছি যারা ছিল তারা আমার কথা বুঝতে পারত। ব্যাখ্যা করার একজন লোকের মাধ্যমে আমি সেমিনার (seminer)- এ বক্তৃতাও দিতে পারতাম। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলি লিখে নেওয়ার জন্য আর এক জনকে বলতে পারতাম কিন্তু অপারেশানের কিছুদিন পর পর্যন্ত আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হ'ত, আমি যদি কথা বলার ক্ষমতা ফিরে না পাই তাহলে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ নেই।

স্যু : তারপর ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন কম্প্যুটার বিশারদ আপনার দুরবস্থার কথা পড়ে আপনাকে একটি কণ্ঠস্বর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি কি রকম কাজ করছে?

স্টিফেন : তাঁর নাম ছিল ওয়াল্ট ওলটোজ্ (Walt Woltosz)। তাঁর শাশুড়ির আমার মতো অবস্থা হয়েছিল। শাশুড়ির কথা বলার জন্য তিনি একটি কম্প্যুটার বানিয়েছিলেন। একটি পর্দায় একটি কারসর (cursor)* ঘোরাফেরা করে। আপনি যা চাইছেন এটা যখন তার উপরে আসে তখন আপনি মাথা দিয়ে কিংবা চোখ নেড়ে, কিংবা আমার ক্ষেত্রে হাত দিয়ে একটা সুইচ চালিয়ে

* Cursor (কারসর) একটি গাণিতিক যন্ত্রের অংশ। যন্ত্রটি অন্য একটি যন্ত্রের উপরে সামনে-পিছনে চলাচল করে—অনুবাদক

দেওয়া হয়। এইভাবে পর্দাটির নীচের অর্ধাংশের যে শব্দগুলি ছাপা আছে তার থেকে শব্দ নির্মাণ করতে পারে। যা বলতে চাইছেন সেটা যখন তৈরি হল তখন তিনি সেটাকে বাক্য সংশ্লেষক (speech synthesizer) বা রেকর্ডে ধরে রাখতে পারেন।

স্যু : কিন্তু ব্যাপারটার গতি বড় ধীর।

স্টিফেন : ধীর বটে। স্বাভাবিক কথা বলার যে গতি তার প্রায় এক দশমাংশ। কিন্তু আমি যা আগে ছিলাম তার চাইতে বাক্য সংশ্লেষক অনেক বেশি স্পষ্ট। ইংরেজরা বলে এর টানটা আমেরিকানদের মতো কিন্তু আমেরিকানরা বলে টানটা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান কিংবা আইরিশ। সে যাই হোক, কথাগুলি সবাই বুঝতে পারে। আমার সন্তানদের ভিতর যারা বড় তারা আমার স্বাভাবিক কথা যেমন মন্দ হয়েছে তার সঙ্গে তেমনি মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার ছোট ছেলের বয়স আমার অপারেশানের সময় ছিল ছ'বছর। আগে সে আমার কোনও কথাই বুঝতে পারত না, এখন তার কোনও অসুবিধা নেই—আমার কাছে এটা অনেক।

স্যু : তাছাড়া এর অর্থ যে কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি আগে থেকে জানতে চাইতে পারেন। এবং আপনি যখন ভাল আছেন এবং উত্তর দিতে প্রস্তুত তখনই উত্তর দিতে পারেন।

স্টিফেন : এইরকম দীর্ঘ রেকর্ড করা কর্মসূচীতে প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আগে থেকে খবর পেলে সুবিধা হয়। তাহলে আমি আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেপরেকর্ডার ব্যবহার করি না। এক কথায়—ব্যাপারটা অনেক বেশি আমার হাতে থাকে। কিন্তু আসলে আমি তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পছন্দ করি। সেমিনার কিংবা সাধারণ লোকের কাছে দেওয়া বক্তৃতাতে আমি তাই করি।

স্যু : কিন্তু আপনি বলছেন এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকবে। আমি জানি আপনার কাছে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। আপনার পরিবারের লোকেরা এবং বন্ধুরা অনেক সময় বলেন আপনি একগুঁয়ে আর একটু কর্তাগিরি করতে ভালবাসেন -- আপনি কি এই দোষগুলি স্বীকার করেন?

স্টিফেন : যার কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাকেই লোকে অনেক সময় একগুঁয়ে বলে। আমার পছন্দ নিজেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলা। আমি যদি যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হতাম তাহলে আমি আজকে এখানে থাকতাম না।

স্যু : আপনি কি সবসময় এরকমই ছিলেন?

স্টিফেন : আমি শুধুমাত্র চাই আমার নিজের জীবনের উপরে, অন্য

লোকের যেমন আছে, তেমনি নিয়ন্ত্রণ আমারও থাক। বেশির ভাগ সময়েই প্রতিবন্ধীদের জীবন অন্য লোক নিয়ন্ত্রণ করে। সুস্থদেহী কেউই এটা পছন্দ করবে না।

স্যু আপনার দ্বিতীয় রেকর্ডটা সম্পর্কে আমাদের বলুন।

স্টিফেন : ব্রাম (Brahm)- এর ভায়োলিন (violin-বেহালা) কনসার্টো। এটাই আমার প্রথম কেনা লং প্লেয়িং রেকর্ড। তখন ১৯৫৭ সাল। মিনিটে তেত্রিশ বার ঘোরে (33 rpm) এরকম রেকর্ড তখন সবে ব্রিটেনে এসেছে। আমার বাবা একটি রেকর্ডপ্লেয়ার কেনাকে অসাবধানতা এবং নিজেকে আস্কারা দেওয়া মনে করতেন। আমি তাঁকে বোঝালাম—যন্ত্রাংশগুলি সস্তায় কিনে আমি নিজেই তৈরি করতে পারি। আমার বাবা ইয়র্কশায়ারের লোক—তিনি এতে খুশি হলেন। মিনিটে আটাত্তর বার ঘোরে (78 rpm)—রেকর্ড ঘোরানোর এরকম যন্ত্রের বাক্সে রেকর্ড ঘোরানোর একটি চাকতি আর একটি অ্যামপ্লিফায়ার বানালাম। ওটা যত্ন করে রেখে দিলে এখন তার দাম অনেক হ'ত।

রেকর্ডপ্লেয়ারটা তৈরি হল। কিন্তু তাতে বাজানোর একটা কিছু চাই। স্কুলের একজন বন্ধু দিল ব্রামের ভায়োলিন (বেহালা) কনসার্টো। স্কুলে আমাদের দলের কারও ঐ রেকর্ড ছিল না। আমার মনে আছে তখন ওর দাম ছিল পঁয়ত্রিশ শিলিং। তখনকার দিনে পঁয়ত্রিশ শিলিং অনেক টাকা—বিশেষ করে আমার কাছে। রেকর্ডের দাম এখন অনেক বেড়েছে কিন্তু হিসাব করলে এখন অনেক কম।

দোকানে যখন প্রথম এই রেকর্ডটা শুনেছি তখন আওয়াজটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল এবং আমার ভাল লাগছে কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু মনে হয়েছিল আমার ভাল লেগেছে বলা উচিত। তবে এত বছরে ঐ রেকর্ডের দাম এখন আমার কাছে অনেক। ধীরগতি সুরের শুরুটা বাজাতে আমার ভাল লাগে।

স্যু পুরানো এক পারিবারিক বন্ধু বলেছেন আপনি যখন বালক ছিলেন আপনাদের পরিবার তখন— তাঁর ভাষাতেই বলি—'অত্যন্ত বুদ্ধিমান, খুব চতুর এবং খুই ছিটগ্রস্ত'। আগের কথা ভেবে আপনার কি মনে হয় এ বিবরণ ঠিক?

স্টিফেন : আমাদের পরিবার বুদ্ধিমান ছিল কিনা সে বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারি না, কিন্তু আমি কিছুতেই বলব না আমরা ছিটগ্রস্ত ছিলাম। তবে মনে হয় সেণ্ট অ্যালবান্স-এর মানদণ্ডে আমাদেরই বোধ হয় সেইরকমই মনে হত। আমরা যখন সেখানে ছিলাম জায়গাটি ছিল বেশ সেকেলে (staid)

আর অনগ্রসর।

স্যু : আর আপনার বাবা ছিলেন ট্রপিক্যাল (গ্রীষ্মমণ্ডলের) ব্যাধি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

স্টিফেন : আমার বাবা গ্রীষ্মমণ্ডলের ব্যাধি নিয়ে গবেষণা করতেন। কার্যক্ষেত্রে নতুন নতুন ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি প্রায়ই আফ্রিকায় যেতেন।

স্যু : তাহলে আপনার মায়ের প্রভাবই কি আপনার উপর বেশি ছিল? তাই যদি হয়, তাহলে সে প্রভাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনি বলবেন?

স্টিফেন : না, আমি বলব আমার বাবার প্রভাবই আমার উপর বেশি ছিল। তাঁরই আদর্শে আমি নিজেকে গড়েছি। যেহেতু তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষক সেইজন্য মনে হ'ত বড় হলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করাই স্বাভাবিক। একমাত্র পার্থক্য ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা জীববিজ্ঞানে আমার আকর্ষণের অভাব। তার কারণ আমার মনে হ'ত এগুলি অত্যন্ত অযথাযথ (inexact) এবং বর্ণনামূলক। আমি এমন জিনিস চেয়েছিলাম যা আরও মূলগত। পদার্থবিদ্যায় আমি তাই পেয়েছি।

স্যু : আপনার মা বলেছেন, যাকে বলা হয় আশ্চর্য হওয়ার মতো শক্তিশালী বোধ — আপনার তাই ছিল। 'আমি দেখতাম তারকাগুলি ওকে আকর্ষণ করত'—আপনার মা এই কথা বলেছেন— আপনার কি সেকথা মনে আছে?

স্টিফেন : আমার মনে আছে এক রাত্রিতে আমি লণ্ডন থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। তখনকার দিনে পয়সা বাঁচানোর জন্য রাস্তার আলো মাঝরাত্রিতে নিভিয়ে দেওয়া হ'ত। আমি রাতের আকাশ দেখলাম—যা আমি আগে কখনও দেখিনি—দেখলাম আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি স্বর্গগঙ্গা (milky way)। আমার মরুদ্বীপে কোনও রাস্তার আলো থাকবে না সুতরাং তারাগুলিকে আমি ভাল করে দেখতে পাব।

স্যু : স্পষ্টতই শৈশবে আপনি খুবই মেধাবী আর বুদ্ধিমান ছিলেন। বাড়িতে বোনের সঙ্গে খেলায় আপনার প্রতিযোগী মনোভাবও ছিল খুব বেশি কিন্তু স্কুলে আপনি প্রায় সবার নীচে থাকতেন এবং ব্যাপারটা গ্রাহ্য করতেন না—তাই না?

স্টিফেন : সেটা ছিল সেণ্ট অ্যালবান্স স্কুলের প্রথম বছরে। আমার বলা উচিত সে ক্লাসের ছেলেরা খুবই মেধাবী ছিল। আমি ক্লাসে যা করতাম পরীক্ষায় তার চাইতে অনেক ভাল করতাম। ভাল করতে পারি বলে আমি

নিশ্চিত ছিলাম কিন্তু আমার হাতের লেখা এবং সাধারণ অবিন্যস্ত স্বভাবের জন্য আমার স্থান নীচে নেমে যেত।

স্যু : তৃতীয় রেকর্ড?

স্টিফেন : অক্সফোর্ডে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে আমি আলডুস হাক্সলির উপন্যাস 'পয়েন্ট কাউন্টারপয়েন্ট' (Point Counterpoint by Aldous Huxley) পড়েছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৩০ দশকের চরিত্র চিত্রণ। এ বইয়ে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ছিল বিরাট। অধিকাংশই ছিল কার্ডবোর্ডের মতো। একজনের ছিল অনেক বেশি মানবতাবোধ। স্পষ্টতই ইনি ছিলেন হাক্সলির নিজের প্রতিরূপ। ইনি ব্রিটিশ ফ্যাসিস্টদের নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এই চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছিল স্যাব অসওয়াল্ড মোস্‌লের ঢঙে। হত্যা করে তিনি পার্টিকে জানালেন—কাজটি তিনি করেছেন। তারপর তিনি গ্রামোফোনে বীঠোফেনের স্ট্রিং কোয়ার্টেটের ওপাস–১৩২ (Beethoven's String Quartet, Opus - 132) চালিয়ে দিলেন। থার্ড মুভমেন্টে একজন দরজায় ঘা দিল–তিনি দরজা খুললেন। তখনই ফ্যাসিস্টরা তাকে গুলি করল।

উপন্যাসটা ছিল খুবই খারাপ কিন্তু হাক্সলির সুর নির্বাচনটা ঠিক হয়েছিল। আমি যদি জানতে পারি একটি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আমার মরুদ্বীপকে ডুবিয়ে দিতে আসছে তাহলে আমি এই কোয়ার্টেটের থার্ড মুভমেন্ট বাজাব।

স্যু : আপনি অক্সফোর্ড অবধি গিয়েছেন, ইউনিভার্সিটি কলেজে গিয়েছেন, গণিতশাস্ত্র আর পদার্থবিদ্যা পড়েছেন। আপনার নিজের গণনা অনুসারে আপনি গড়ে দিনে ঘণ্টাখানেক পড়াশোনা করেছেন। যদিও বলা উচিত আপনি নৌকা চালিয়েছেন, বীয়ার খেয়েছেন, অনেকের সঙ্গে আজেবাজে খুনসুটি করে আনন্দ পেয়েছেন। অবশ্য এগুলি আমি পড়ে জেনেছি। সমস্যাটি কি ছিল? কেন আপনার পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করত না?

স্টিফেন : তখন পঞ্চাশের দশকের শেষ। অধিকাংশ তরুণদেরই সমাজের কর্তাদের সম্পর্কে (Establishment) মোহভঙ্গ হয়েছিল। মনে হয়েছিল-- ভবিষ্যৎ কিছু নেই--আছে শুধু সমৃদ্ধি–আরও সমৃদ্ধি। রক্ষণশীল দল তৃতীয়বার ভোটে জিতেছে। তাদের জিগির ছিল 'এত ভাল আপনারা কখনও থাকেননি'। আমি আর আমার সমকালীনদের সবারই জীবনকে ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে মনে হ'ত।

স্যু : কিন্তু তবুও আপনি কয়েক ঘণ্টায় যে সমস্যার সমাধান করেছিলেন আপনার সহপাঠীরা তা কয়েক সপ্তাহেও করতে পারেননি। পরে তাঁরা যা

বলেছেন তা থেকে স্পষ্টই মনে হয় তাঁরা জানতেন আপনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। আপনার কি মনে হয় আপনি সেটা জানতেন?

স্টিফেন : অক্সফোর্ডের পদার্থবিদ্যার পাঠক্রম তখন উপহাস করার মতো সহজ ছিল। কোনও লেকচারে না গিয়ে সপ্তাহে দু'একটা টিউটোরিয়ালে গিয়েই পরীক্ষা পাশ করা যেত। খুব বেশি তথ্য জানবারও প্রয়োজন ছিল না--কয়েকটি সমীকরণ জানলেই চলত।

স্যু : কিন্তু অক্সফোর্ডেই আপনি প্রথম লক্ষ্য করলেন আপনি নিজের হাত-পা-কে যা করাতে চান, আপনার হাত-পা ঠিক তা করছে না—তাই না? নিজের কাছে আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন?

স্টিফেন : আসলে আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম দাঁড় টানা নৌকা আমি ঠিকমতো চালাতে পারছি না। তারপর একদিন জুনিয়র কমনরুমের সিঁড়ি থেকে বিশ্রীভাবে পড়ে যাই। মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে এই ভয়ে আমি পড়ে যাওয়ার পর কলেজের ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ভেবেছিলেন আমার কিছু হয়নি তবে আমাকে বীয়ার খাওয়া কমাতে বললেন। অক্সফোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষার পর গ্রীষ্মে আমি গিয়েছিলাম পারস্যে। ফিরে এসে আমি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমার পেটের গোলমাল হয়েছিল সেইজন্যই শরীর খারাপ।

স্যু : কিন্তু কোন্ সময় আপনি হার স্বীকার করলেন আর মেনে নিলেন সত্যিই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে—ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার?

স্টিফেন : আমি তখন কেম্‌ব্রিজে। বড়দিনে বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন ৬২/৬৩ সাল। সে বছর খুব শীত পড়েছিল। মা আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেণ্ট অ্যালবান্সের লেকে স্কেটিং করতে যেতে রাজি করেছিলেন। আমার তখন সত্যিই অতটা ক্ষমতা ছিল না। আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর উঠতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। মা বুঝতে পারলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে--বাড়ির ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন।

স্যু : তারপর তিন সপ্তাহ হাসপাতালে আর তারপর ওরা সব চাইতে খারাপ খবরটা দিল?

স্টিফেন : আসলে সেটা ছিল লণ্ডনের বার্টস হাসপাতাল (Barts Hospital, London), কারণ আমার বাবা ছিলেন বার্টসের মানুষ। আমি ভর্ত্তি ছিলাম দু'সপ্তাহ। নানারকম পরীক্ষা হল কিন্তু গোলমালটা কি ছিল সেটা তাঁরা কেউই বলেননি। শুধু বলেছিলেন এটা এম. এস নয়। আর বলেছিলেন, রোগটা

জাতিরূপের (typical) নয়। ভবিষ্যৎ কি সেটা তাঁরা বলেননি। তবে সেটা যে খুবই খারাপ আমি সেরকমই অনুমান করেছিলাম। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইনি।

স্যু : আর পরিণামে আপনাকে আসলে বলেই দেওয়া হয়েছিল আপনি আর মোটে বছর দুয়েক বাঁচবেন। স্টিফেন, আপনার গল্পের এখানে একটু থামা যাক। আপনার পরের রেকর্ডটা নিন।

স্টিফেন : ভালকিরি (The Valkyrie), প্রথম অঙ্ক। এটা প্রথম যুগের আর একটা L.P. (লংপ্লেয়িং রেকর্ড)। এতে মেলকিওর (Melchior) এবং লেমান (Lehmann) আছেন। এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রেকর্ড করা হয়েছিল ৭৮-এ (আগেকার রেকর্ড–যেগুলি মিনিটে ৭৮ বার চলত)। ৬০-এর দশকের প্রথম দিকটায় এটা L.P. তে করা হয়। ১৯৬৩ সালে যখন আমার রোগ মোটর নিউরন ডিজিজ বলে নির্ণয় করা হল, তখন আমি ওয়াগনারের (Wagner) দিকে ঝুঁকলাম (আমি যে ঘন কৃষ্ণ ভবিষ্যৎমুখী মেজাজে ছিলাম – ওয়াগনারই ছিলেন তার উপযুক্ত)। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার বাক্য সংশ্লেষক (speech synthesizer) খুব সুশিক্ষিত নয়। সেইজন্য আমি যদি মোটামুটি সঠিক শব্দের কাছাকাছি যেতে চাই তাহলে বানান করতে হয় V-A-R-G-N-E-R ওয়াগনারের নাম উচ্চারণে নরম একটা w ব্যবহার করে যন্ত্রটা।

রিং সাইকেলের (Ring cycle) চারটি অপেরা ওয়াগনারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 1964 সালে বোন ফিলিপ্পা (Philippa)-র সঙ্গে জার্মানীর বেরুথে (Bayreuth) অপেরাগুলি দেখতে গিয়েছিলাম। সে সময় আমি রিং ভাল জানতাম না। সাইকেলের দ্বিতীয় অপেরা ভালকিরি (Valkyrie) আমার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটা ছিল উল্‌ফ্‌গ্যাঙ ওয়াগনারের (Wolfgang Wagner) পরিচালনা। রঙ্গমঞ্চ ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকার। এটা সিগমুণ্ড (Siegmund) এবং সিগলিণ্ডে (Sieglinde) নামে একজোড়া যমজের কাহিনী। শৈশবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদের আবার দেখা হয় যখন সিগমুণ্ড হাণ্ডিঙের (Handing) বাড়িতে আশ্রয় নেন। হাণ্ডিং ছিলেন সিগলিণ্ডের স্বামী এবং সিগমুণ্ডের শত্রু। যে উদ্ধৃতিটি আমি বেছে নিয়েছি, সেটি হাণ্ডিং-এর সঙ্গে সিগলিণ্ডেকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার কাহিনী। উৎসবের মাঝে এক বৃদ্ধ হলে প্রবেশ করলেন। অর্কেস্ট্রাতে ভালহালা (Valhalla) বাজতে লাগল। রিঙের সবচাইতে মহান কাহিনীগুলির মধ্যে এটি একটি। কারণ, যিনি এসেছিলেন, তিনি ছিলেন দেবতাদের নেতা ওটান (Wotan)। তাছাড়া তিনি ছিলেন সিগমুণ্ড এবং সিগলিণ্ডের বাবা। একটি তরোয়াল তিনি গাছের গুঁড়িতে

ঢুকিয়ে দিলেন। তরোয়ালটি ছিল সিগমুণ্ডের জন্য। অঙ্কের শেষে, সিগমুণ্ড তরোয়ালটি বার করে এবং দু'জনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

স্যু : স্টিফেন, আপনার সম্পর্কে পড়ে মনে হয় যেন আপনার বছর দুইয়ের মতো বাঁচার কথা ছিল অর্থাৎ আপনার মৃত্যুদণ্ড আপনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। আপনার পছন্দ হলে বলা যায়, আপনার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে জীবনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

স্টিফেন : এর প্রথম ক্রিয়া ছিল আমাকে বিষাদগ্রস্ত করা। মনে হয়েছিল, আমার অবস্থা বেশ দ্রুত খারাপ হয়ে চলেছে। কিছু করার, কিংবা পি. এইচ. ডি-র জন্য কাজ করার কোনও অর্থ ছিল বলে মনে হয়নি। তার কারণ, এটা শেষ করতে যতদিন লাগবে ততদিন বাঁচব কিনা আমি জানতাম না। তারপর কিন্তু একটু উন্নতি হতে শুরু করল। রোগ আরও ধীরে অগ্রসর হতে লাগল এবং আমার কাজও এগোতে লাগল। বিশেষ করে, মহাবিশ্বে নিশ্চয়ই একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল—এটা প্রমাণের ব্যাপারে।

স্যু : একটি সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন আগে যা ছিলেন এখন আপনি তার চাইতে সুখী।

স্টিফেন : সত্যিই আমি আগের চাইতে সুখী। আমার অসুখ করার আগে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর আশঙ্কার ফলে আমি বুঝতে পারলাম বেঁচে থাকার মূল্য আছে। করার মতো কাজ আছে--যে কোনও লোকই কত কাজ করতে পারে। আমার একটি সত্যিকারের কৃতিত্ববোধ আছে—আমার এইরকম অবস্থা সত্ত্বেও আমি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে সামান্য হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করতে পেরেছি। অবশ্যই আমি ভাগ্যবান তবে কঠোর চেষ্টা করলে সবাই কিছু না কিছু করতে পারে।

স্যু : আপনি কি এরকম বলবেন—মোটর নিউরন ব্যাধি না হলে আপনি যতটা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ততটা কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন না? নাকি এরকম বলা অতিসরলীকরণ?

স্টিফেন : না, মোটর নিউরন ব্যাধি কারও কোনও সুবিধা করতে পারে না। তবে অন্য লোকের যতটা অসুবিধা হয় আমার ততটা অসুবিধা হয়নি। তার কারণ, আমি যা করতে চেয়েছিলাম এ রোগ সেটা বন্ধ করেনি। আমি চেষ্টা করেছিলাম মহাবিশ্বের কর্মপ্রণালী বোঝার।

স্যু : যখন আপনি রোগের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করছিলেন তখন আপনার প্রেরণা ছিল জেন ওয়াইল্ড নামে একজন তরুণী।

তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল একটা পার্টিতে (ভোজসভা)। আপনি তার প্রেমে পড়েন এবং পরে তাকে বিয়ে করেন। আপনার মতে নিজের সাফল্যের জন্য জেনের কাছে কতটা ঋণী?

স্টিফেন : সে না থাকলে এ কাজ আমি নিশ্চয়ই করতে পারতাম না। ওর সঙ্গে বিয়ে স্থির হওয়াতে, আমি যে হতাশার পাঁকে ডুবেছিলাম তা থেকে উঠে আসতে পারলাম। বিয়ে করতে হলে আমার একটা কাজ পাওয়া দরকার ছিল এবং দরকার ছিল পি. এইচ. ডি.-টা শেষ করা। আমি খুব খাটতে শুরু করলাম। তখন দেখলাম কাজ করতে আমার ভালই লাগছে। আমার অবস্থা যখন খারাপ হতে লাগল তখন একা জেন আমার দেখাশোনা করেছে। সেই সময় কেউই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। পয়সা দিয়ে লোক রাখার ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না।

স্যু : আপনারা দু'জনে মিলে ডাক্তারকে অগ্রাহ্য করলেন – শুধুমাত্র আপনারা বেঁচে রইলেন বলেই নয়, আপনাদের সন্তান হল সেইজন্যও। আপনাদের রবার্ট হল ১৯৬৭তে, লুসি ১৯৭০-এ, তারপর টিমথি হল ১৯৭৯ তে। ডাক্তাররা কি রকম ধাক্কা খেয়েছিলেন?

স্টিফেন : আসলে যে ডাক্তার আমার রোগনির্ণয় করেছিলেন তিনি আমার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন করবার মতো আর কিছু নেই। প্রাথমিক রোগনির্ণয়ের পর আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। ফলে বাবা-ই আমার ডাক্তার হলেন, আমি তাঁর কাছ থেকেই উপদেশ নিতাম। তিনি বলেছিলেন, রোগটা যে বংশানুক্রমিক এ রকম কোনও প্রমাণ নেই। জেন আমার আর দুই বাচ্চার দেখাশোনা করত। ১৯৭৪ সালে যখন আমরা ক্যালিফোর্ণিয়া গেলাম তখনই আমাদের বাইরের লোকের সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রথমে একটি ছাত্র আমাদের সঙ্গে থাকত, তারপর থাকত একজন নার্স।

স্যু : কিন্তু এখন আপনি আর জেন একসঙ্গে নেই।

স্টিফেন : আমার ট্রাকিওস্টমি অপারেশানের পর আমার চব্বিশ ঘণ্টা নার্স লাগত। তার ফলে বিয়েট'র উপর ক্রমশ বেশি বেশি চাপ পড়ছিল। শেষে আমি বেরিয়ে এলাম। এখন আমি থাকি কেম্‌ব্রিজে একটি নতুন ফ্ল্যাটে। আমরা এখন আলাদা থাকি।

স্যু : আরও কিছু গান-বাজনা শোনা যাক।

স্টিফেন : বীট্‌লদের প্লিজ প্লিজ মি (Please Please Me)। চার-চারটি

গুরুগম্ভীর রেকর্ড নির্বাচনের পর এখন আমার একটু হাল্কা হওয়া প্রয়োজন। আমার জন্য এবং অন্য অনেকের জন্য অসুস্থ বাসি পপ্-এর জায়গায় বীট্‌লরা স্বাগত বিশুদ্ধ বাতাস নিয়ে এসেছিল। রবিবার সন্ধ্যায় আমি রেডিও লুক্সেমবুর্গে শ্রেষ্ঠ কুড়িজন বীট্‌লের গান শুনতাম।

স্যু : স্টিফেন হকিং, আপনার উপর এত সম্মান বর্ষিত হওয়া সত্ত্বে – আমি বিশেষ করে উল্লেখ করব, আপনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের লুকেসিয়ান অধ্যাপক অর্থাৎ স্যার আইজাক নিউটনের চেয়ারে রয়েছেন – আপনি নিজের গবেষণার বিষয়ে সাধারণ মানুষের জন্য একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত করলেন। আমার মনে হয় তার সহজ কারণ – আপনার অর্থের প্রয়োজন ছিল।

স্টিফেন : আমি ভেবেছিলাম সাধারণ মানুষের জন্য একটি বই লিখলে আমি সামান্য কিছু টাকা পেতে পারি কিন্তু 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' লেখার প্রধান কারণ ছিল লিখতে আমার ভাল লাগত। গত পঁচিশ বছরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে সে সম্পর্কে আমার উত্তেজনা ছিল–আমি চেয়েছিলাম সাধারণ মানুষকে এ কাহিনী জানাতে। বইটা যত ভালভাবে গৃহীত হয়েছে সেরকম হবে বলে আমি কখনও আশা করিনি।

স্যু : সত্যিই বইটা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে। তাছাড়া সবচাইতে বেশি বিক্রীত বইয়ের তালিকায় থাকার জন্য এটা গিনেস বুকে স্থান পেয়েছে এবং এখনও সেই স্থানে রয়েছে। সারা পৃথিবীতে কতগুলি বই বিক্রি হয়েছে সে খবর বোধ হয় কেউই জানে না। তবে এক কোটির বেশি বিক্রি হয়েছে নিশ্চয়ই। স্পষ্টতই বইটা লোকে কিনছে কিন্তু লোকে প্রশ্ন করছে – বইটা কি তারা পড়ছে?

স্টিফেন : আমি জানি বার্ণার্ড লেভিন (Bernard Levin) উনত্রিশ পাতায় এসে আটকে গিয়েছিলেন। তবে আরও অনেকটা এগিয়েছেন এরকম অনেকের কথা জানি। সারা পৃথিবীতেই লোকে আমার কাছে এসে বলে বইটা তাদের কত ভাল লেগেছে। তাঁরা হয়ত বইটা সম্পূর্ণ পড়েননি কিংবা যতটা পড়েছেন তার সবটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা অন্তত এই ধারণা করতে পেরেছেন যে আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি সেটা যৌক্তিক বিধি দ্বারা শাসিত এবং চেষ্টা করলে সে বিধি আবিষ্কার করা যায় এবং বোঝা যায়।

স্যু : কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কীয় কল্পনই প্রথম জনসাধারণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং মহাবিশ্ব তত্ত্ব সম্পর্কে আকর্ষণ পুনরুজ্জীবিত করে। ঐ সমস্ত স্টার ট্রেকস (star treks–তারকার পথ) দেখেছেন, 'যেখানে কোনও মানুষ এর আগে কখনও যায়নি, সেখানে সাহসের সঙ্গে যাওয়া,' এবং ঐ প্রকার। যদি দেখে

থাকেন তাহলে সেগুলি কি আপনার ভাল লেগেছে?

স্টিফেন. ১৩/১৪ বছর বয়স থেকে ১৯/২০ বছর বয়স অবধি আমি অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পড়েছি। কিন্তু এখন আমি নিজেই ঐ ক্ষেত্রে কাজ করছি, সেইজন্য মনে হয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলি একটু সহজ সরল। যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চিত্রণের অংশ না হয় তাহলে মহাস্থান (hyper space) যাওয়া কিংবা লোকের উপর আলোকরশ্মি ফেলা সম্পর্কে লেখা খুবই সহজ। বাস্তব বিজ্ঞান অনেক বেশি উত্তেজক, কারণ, ঘটনাগুলি সত্যিই ঘটছে। পদার্থবিদরা চিন্তা করার আগে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকেরা কখনও কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে অভিভাবন (suggestion) করেননি। কিন্তু এখন আমাদের কাছে কয়েকটি কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে প্রমাণ রয়েছে।

স্যু : কেউ কৃষ্ণগহ্বরে পড়লে কি হবে?

স্টিফেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পড়েন তাঁরা সবাই কৃষ্ণগহ্বরে পড়লে কি হয় সেটা জানেন, আপনি একটা সেমাই (spaghetti) হয়ে যাবেন। কিন্তু আরও বেশি আকর্ষণের ব্যাপারটা হল কৃষ্ণগহ্বরগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়। তারা কণিকা এবং বিকিরণ স্থির হারে বাইরে প্রেরণ করে (send out), এর ফলে কৃষ্ণগহ্বরগুলি ধীরে ধীরে উবে যায় কিন্তু পরিণামে কৃষ্ণগহ্বর এবং তার আধেয়গুলির কি হয় সেটা জানা নেই। এটা গবেষণার একটা উত্তেজক ক্ষেত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা এখনও ঐ অবধি পৌঁছাতে পারেননি।

স্যু : আপনি যে বিকিরণের কথা উল্লেখ করলেন নিশ্চয়ই তার নাম হকিং বিকিরণ। কৃষ্ণগহ্বর আপনি আবিষ্কার করেননি তবে কৃষ্ণগহ্বর যে কৃষ্ণ নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য আপনি গবেষণা করেছেন, কিন্তু তাঁদের (বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা) আবিষ্কারের ফলে আপনি মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, তাই না?

স্টিফেন : একটা তারকার চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হওয়া অনেক দিক থেকে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কালে পশ্চাৎগামী হওয়ার মতো। একটা তারকা যথেষ্ট স্বল্প ঘনত্বের অবস্থা থেকে চুপসে গিয়ে অতি উচ্চ ঘনত্বের অবস্থায় পৌঁছায়। আবার মহাবিশ্ব অতি উচ্চ ঘনত্বের অবস্থা থেকে প্রসারিত হয়ে স্বল্প ঘনত্বের অবস্থায় পৌঁছায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে—আমরা কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে কিন্তু মহাবিশ্বের ভিতরে। দুটিরই বৈশিষ্ট্য তাপীয় বিকিরণ।

স্যু : আপনি বলছেন পরিণামে কৃষ্ণগহ্বর এবং তার আধেয়গুলির কি হয় তা জানা নেই, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তত্ত্বটি হল, যাই ঘটুক না কেন, কৃষ্ণগহ্বরের

ভিতরে যা অদৃশ্য হবে সেটি মহাকাশচারী হলেও পরিণামে হকিং বিকিরণরূপে আবার বেরিয়ে আসবে (recycled)।

স্টিফেন : মহাকাশচারীর ভরশক্তি কৃষ্ণগহ্বর কর্তৃক বাইরে প্রেরিত বিকিরণরূপে পুনরাবর্তিত হবে। কিন্তু মহাকাশচারী নিজে কিংবা যে কণিকাগুলি দিয়ে তারা গঠিত সেগুলি কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবে না। সুতরাং প্রশ্ন হল–সেগুলির কি হয়? তারা কি ধ্বংস হয়ে যায়? না কি তারা অন্য একটি মহাবিশ্বে চলে যায়? আমি যদিও কৃষ্ণগহ্বরে লাফ দিয়ে পড়ার কথা ভাবছি না তবুও কি হয় সেটি জানতে আমি খুবই ইচ্ছুক।

স্যু : স্টিফেন, আপনি কি স্বজ্ঞার (intuition) ভিত্তিতে কাজ করেন? অর্থাৎ আপনি কি পছন্দসই একটা তত্ত্বে উপনীত হন? সে তত্ত্ব আপনাকে উদ্দীপিত করে এবং আপনি সেটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, নাকি বৈজ্ঞানিক হিসাবে একটা সিদ্ধান্তের দিকে যৌক্তিকভাবে অগ্রসর হন, এবং আগে থাকতে অনুমান করতে সাহস করেন না?

স্টিফেন : আমি স্বজ্ঞার উপরে খুবই নির্ভর করি। একটা ফল আমি অনুমান করতে চেষ্টা করি তবে সে ফলটা আমায় প্রমাণ করতে হবে। তবে এই অবস্থায় আমি অনেক সময়ই দেখি যা আমি ভেবেছিলাম সেটা সত্যি নয়। কিংবা ব্যাপারটা হল এমন একটি কিছু যার কথা আমি চিন্তাও করি না। সেইভাবেই আমি আবিষ্কার করেছিলাম কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়। আমি চেষ্টা করছিলাম অন্য কিছু প্রমাণ করতে।

স্যু : আরও গান-বাজনা।

স্টিফেন : মোজার্ট আমি চিরকাল পছন্দ করি। তিনি অবিশ্বাস্য পরিমাণ সুর রচনা করে গিয়েছেন। এই বছরে কিছুদিন আগে, আমার ৫০ বছরের জন্মদিনে আমাকে CD-তে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী উপহার দেওয়া হয়েছিল। ওগুলি বাজাতে প্রায় ২০০ ঘণ্টা লাগে। আমি এখনও সেগুলি শুনছি আর এগিয়ে যাচ্ছি। সবচাইতে ভালগুলির মধ্যে রেকুইম (Requiem) একটি। রেকুইম শেষ করার আগেই মোজার্টের মৃত্যু হয়। মোজার্টের একজন ছাত্র, তিনি যে টুকরোগুলি রেখে গিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে ওটা শেষ করেন। যে ইন্ট্রয়েট (introit– সঙ্গীতের প্রথম অংশ) আমরা শুনতে যাচ্ছি সেটাই একমাত্র অংশ যা মোজার্ট কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে লিখিত এবং ঐকতান নির্দেশিত।

স্যু : আপনি আমাকে মাফ করবেন স্টিফেন, আপনার তত্ত্বগুলির আমি অতিসরলীকরণ করছি। আমি বুঝতে পারছি এক সময় আপনি বিশ্বাস করতেন

সৃষ্টির একটা বিশেষ মুহূর্ত ছিল অর্থাৎ একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ, কিন্তু এখন আর আপনি সেটা বিশ্বাস করেন না। এখন আপনার বিশ্বাস কোনও আরম্ভও নেই, কোনও অন্তও নেই। তার অর্থ কি কোনও সৃষ্টিকর্ম হয়নি? সুতরাং ঈশ্বরের কোনও স্থান নেই?

স্টিফেন : হ্যাঁ, আপনি একটু অতিসরলীকরণ করেছেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি বাস্তব কালে মহাবিশ্বের একটা আরম্ভ আছে। সেটা বৃহৎ বিস্ফোরণ। কিন্তু আর একরকম কাল আছে, সেটা বাস্তব কালের সমকোণে (right angle), এ কালে মহাবিশ্বের কোনও আরম্ভও নেই, অন্তও নেই। এর অর্থ হবে মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটা নির্ধারিত হবে পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি দিয়ে। একথা বলা যাবে না যে, ঈশ্বর একটি যাদৃচ্ছিক পদ্ধতিতে মহাবিশ্বকে চালু করেছিলেন। সেই যাদৃচ্ছিক পদ্ধতি আমাদের বোঝা সম্ভব নয়। ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে এ তথ্য কিছু বলে না। শুধু বলে তিনি যাদৃচ্ছিক নন।

স্যু : কিন্তু ঈশ্বরের অনস্তিত্বের যদি কোনও সম্ভাবনা থাকে তাহলে যে সমস্ত ঘটনা বিজ্ঞানের অতীত সেগুলি আপনি কি করে ব্যাখ্যা করবেন? যেমন প্রেম এবং আপনার সম্পর্কে লোকের যে বিশ্বাস ছিল এবং আছে কিংবা উদ্দীপনায়?

স্টিফেন : প্রেম, বিশ্বাস এবং নীতিবোধ পদার্থবিদ্যার বাইরে অন্য শ্রেণীতে পড়ে। পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে (deduce) মানুষের আচরণ কি হবে নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু আশা করা যায় পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে যে যৌক্তিক চিন্তা জড়িত সেটা ব্যক্তির নৈতিক আচরণের নির্দেশ দেবে।

স্যু : কিন্তু অনেকেই মনে করেন আপনি কার্যকরভাবে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছেন, তাহলে কি আপনি সেটা অস্বীকার করছেন?

স্টিফেন : আমার গবেষণা যা দেখিয়েছে সেটা হল মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত খেয়াল—এ কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবুও আপনার একটা প্রশ্ন থেকে যায়—মহাবিশ্ব অস্তিত্বের ঝামেলা কেন নিল? আপনার পছন্দ হলে আপনি বলতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরই ঈশ্বরের সংজ্ঞা।

স্যু : এবার সাত নম্বর রেকর্ডটা নেওয়া যাক।

স্টিফেন : আমার অপেরা খুব পছন্দ। আমি ভেবেছিলাম গ্লুক (Gluck) এবং

মোজার্ট থেকে ওয়াগনার, তার থেকে ভারডি (Verdi) এবং পুচ্চিনি (Puccini)। কিন্তু শেষে আমি কেটে-ছেঁটে দুইয়েতে নামিয়েছিলাম। একটা হতে পারে ওয়াগনার এবং আমি ঠিক করেছিলাম শেষে পুচ্চিনি। টুরাণ্ডট (Turandot) তাঁর সবচাইতে ভাল অপেরা। কিন্তু তিনিও এটা শেষ করার আগে মারা যান। যে উদ্ধৃতি আমি বেছে নিয়েছি সেটা একজন প্রাচীন চীনা রাজকুমারীকে কী করে মোঙ্গলরা বলাৎকার করে অপহরণ করে নিয়ে যায়– টুরাণ্ডটের লেখা সেই কাহিনী। প্রতিশোধ হিসাবে টুরাণ্ডট রাজকুমারী বিবাহ প্রার্থীদের তিনটি প্রশ্ন করবেন। তারা উত্তর করতে না পারলে তাদের প্রাণদণ্ড হবে।

স্যু : আপনার কাছে বড়দিনের অর্থ কি?

স্টিফেন : এটা অনেকটা আমেরিকানদের ধন্যবাদজ্ঞাপন উৎসবের মতো। বড়দিন একটা সময় যখন পরিবারের সবাই মিলিত হয় এবং অতীত বৎসরের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন. আস্তাবলে শিশুর জন্মটা আগামী বৎসরের দিকে আশার সঙ্গে দৃষ্টিপাত করার প্রতীক।

স্যু : এবার বস্তুবাদী প্রশ্ন। আপনি কি উপহার চেয়েছেন? নাকি আপনি এখন এত অবস্থাপন্ন যে আপনার সবকিছুই আছে?

স্টিফেন : আমি সহসাপ্রাপ্তি পছন্দ করি। কেউ যদি বিশেষ একটা কিছু প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি দাতাকে কোনও স্বাধীনতা দিচ্ছেন না। কিংবা তার কল্পনাকেও কোনও স্বাধীনতা দিচ্ছেন না। কিন্তু আমি চকোলেট ছত্রাক (চকোলেট ছত্রাক–chocolate truffles) পছন্দ করি। এটা লোককে জানাতে আমার খারাপ লাগে না।

স্যু : স্টিফেন, যা ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল আপনি তার চাইতে ত্রিশ বছর বেশি বেঁচেছেন। আপনি তিন সন্তানের জনক হয়েছেন। আপনাকে বলা হয়েছিল কখনওই জনক হতে পারবেন না। আপনি সর্বাধিক বিক্রীত একটি বই লিখেছেন, স্থান-কাল সম্পর্কে বহু যুগের বিশ্বাসকে আপনি উল্টে দিয়েছেন। এ গ্রহ পরিত্যাগ করার আগে আপনার আর কি করার পরিকল্পনা আছে?

স্টিফেন : এসবই সম্ভব হওয়ার কারণ অনেক সাহায্য পাওয়ার মতো সৌভাগ্য আমার ছিল। আমার কৃতিত্বের জন্য আমি সুখী কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি আরও অনেক কিছু করতে চাই। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে বলব, আমি জানতে চাই মহাকর্ষের সঙ্গে কশাবাদী বলবিদ্যার এবং প্রকৃতির অন্যান্য বলের ঐক্য কিভাবে করা

যাবে? বিশেষ করে আমি জানতে চাই কৃষ্ণগহ্বর উবে গেলে কি ঘটে?

স্যু : এইবার শেষ রেকর্ডটা।

স্টিফেন : এবার উচ্চারণটা আপনাকে করতে হবে। আমার বাক্য সংশ্লেষকটা আমেরিকান এবং ফরাসী ভাষা উচ্চারণে একেবারে যাচ্ছেতাই। এটা হল আডিথ্ পিয়েফের (Edith Piaf) গান। 'Je me regrette riem'* —এই গানটাই আমার জীবনের সংক্ষিপ্তসার।

স্যু : এইবার স্টিফেন, ঐ আটখানা রেকর্ডের একটিমাত্র যদি আপনাকে নিতে দেওয়া হয় তাহলে আপনি কোন্‌টা নেবেন?

স্টিফেন : সেটা হবে মোজার্টের রেকুইম (Requiem)। আমার রেকর্ড বাজানোর ওয়াকম্যানের ব্যাটারি যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ আমি এটা শুনতে পারি।

স্যু : আর আপনার বই? অবশ্য শেক্সপীয়ারের সম্পূর্ণ রচনাবলী এবং বাইবেল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

স্টিফেন : আমার মনে হয় আমি জর্জ ইলিয়টের Middlemarch নেব। আরও মনে হয়, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কিংবা ঐরকম কেউ বলেছিলেন বইটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। আমি বড় হয়েছি বিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত নই, তবে বইটা পড়তে চেষ্টা করব।

স্যু : এবং আপনার বিলাস?

স্টিফেন : আমি চাইব অনেকটা ক্রেম ব্রুলে (créme brulée)।

স্যু : তাহলে চকোলেট ছত্রাক (chocolate truffles) নয়? অনেকটা ক্রেম ব্রুলে? ডঃ স্টিফেন হকিং, আপনার মরুদ্বীপের রেকর্ড আমাদের শুনতে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বড়দিন আপনার আনন্দের হোক।

স্টিফেন : আমাকে নির্বাচন করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমার মরুদ্বীপ থেকে আপনাদের সবার জন্য আনন্দময় বড়দিন প্রার্থনা করি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আপনাদের চাইতে আমার আবহাওয়া ভাল।

---

* জীবন সম্পর্কে আমার কোনও অনুতাপ নেই – অনুবাদক

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অক্সফোর্ড ১,২,১৩,১৪,১৫,১৮,২০,২১,১৫০,১৫১
অণু ৫২,১২০
অতিতন্তু তত্ত্ব ৬৩,৮৬
অতিস্ফীতি সম্প্রসারণ ৯১,৯২,১৩৮,১৩৯,১৪২
অতি মহাকর্ষ ৫৮,৫৯,৬১
অদীপ্ত পদার্থ ১৩৫,১৩৬,১৩৭,১৩৯,১৪০
অধিবিদ্যা ৪৮,৮০
অনন্তস্পর্শী স্বাধীনতা ৫৫
অনন্যতা ১৭,৪৪,৭১,৮৫
  অসীম ঘনত্ব ১৮
  এবং ব্যাপকতত্ত্ব ৭১
  এবং স্থান-কাল ৭,৬৮,৬৯,৭০,৭৩,৮৬
  মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ১৮
অনিশ্চয়তার নীতি ৯৯
  এবং অসম্বদ্ধতা বা নিয়মহীনতা ৫৯,৭৩,৯৯, ১২২, ১২৭
  এবং কৃষ্ণগহ্বর ৭৬,১০৫,১১১,১৩৯
  এবং নিয়তিবাদ ১২৬,১২৭
অপেক্ষবাদ
  এবং অনন্যতা ৭১
  এবং কণাবাদী বলবিদ্যা ১৯,৬৫,৭২,৭৬
  বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ ৪১,৪২,৬৮,৬৯,৭২,৯৪
  ব্যাপকতত্ত্ব (১৯১৫) ১৫,৪৪,৬৫,৯৪,১০৯
  এবং স্থান-কাল ৪১,৪৪,৬৫
অবকল সমীকরণ ৪৮
অবলোহিত দাসত্ব ৫৫
অ-শূন্যাঙ্ক শক্তি ৫২
অস্ওয়াল্ড মোস্লে ১৫০
অসম্বদ্ধতা ৫৯,৭৩,১২২,১২৭
অসীম তন্ত্র ৮২
অ্যান্টনি হিউয়িশ ১১০
অ্যারিস্টটল ৮১
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ২৯,৪০,৮৩,৯৪
অ্যালবার্ট মিচেলসন ৬৭
অ্যাসেন্ট অফ্ ম্যান ৩৪
আইজাক খালাতনিকভ্ ৮৫
আইজাক নিউটন ৮২,১৫৫
আগ্রাসন ১২৬
আচরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ১২২
আর্নো পেঞ্জিয়াস ৮৫
আন্তঃতারকা ভ্রমণ ১০৭,১১১,১৪১
আবদুস সালাম ৫৩
আর হ্যাগেডর্ন ১০২
আল জুকাবম্যান ৩৩
আলডুস হাক্সলি ১৫০
আলোক
  কণাবাদী তত্ত্ব ৭৪
  গতি ৫১,৭১
আলোকের কণাবাদী তত্ত্ব ৭৪
আলোকবিদ্যুৎ অভিক্রিয়া ৭২
ইকোয়ালাইজার ২৫
ইভজেনী লিফশিজ ৮৫
ইম্যানুয়েল কাণ্ট ৮২
ইলেকট্রন ৫১,৬০
ঈশ্বর
  এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টি ১১,১৫৮
  এবং নিয়তিবাদ ১১৭
  সীমানাহীনতার প্রস্তাব ৯১,৯২
  জুয়া খেলেন ৬৬,১৩৫
উইলিয়াম গ্রেভ্স ৮
উইলিয়াম শেক্সপীয়ার ৩৭,১৪৪,১৬০
উপগ্রহ ৭০,১৩৩
উল্ফগ্যাঙ ওয়াগনার ১৫২
এ এল.এস (amyotrophic lateral sclerosis) ১৫,২০,৫৩
এডুইন হাবল্ ৭০,৮৩
এডোয়ার্ড মর্লি ৬৭
এনট্রপি ৮২,৯৭
ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ ৭১,৭৩
ওয়াল্ট ওল্টোজ ২৫,১৪৬
কণাবাদী তত্ত্ব ১৮,৭৪,৯৫
কণিকা ৫৭
  এবং বিপরীত কণিকা ৫৭,৯১,১০০
  এবং কৃষ্ণগহ্বর ১৯,৫৯,১০০,১১৩
  এবং কার্ক ৫০,৫৪
  বর্ণালী ১০১
কার্ল পপার ৮৯
কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ১৭

কম্প্যুটার ২৯,৩০
কার্ক ৫০,৫৪,১০২
কাল ৩৫
এবং অপেক্ষবাদ ৬৯
মহাজাগতিক ৬৭
কালে ভ্রমণ ১৪১
কল্পকাহিনী ১০৬,১৫৬
কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩২,১৫৫
কার্লো রুবিয়া ৫৪
কাল্পনিক কাল ৩৬,৮৭,১১২,১১৩
কীজ কলেজ ১৬,২২
কুটাভাস ৭৪,৯৯,১২৪,১২৫
কৃষ্ণগহ্বর
এবং অনিশ্চয়তার নীতি ৭৬,৯৯,১১১,১৪০
এবং আকর্ষণকারী ভবিষ্যৎসমূহ ১৪০,১৪১
আদিম ৯৭,১০১
এনট্রপি ৯৭,১০০
এবং কণাবাদী বলবিদ্যা ৯৪,৯৫
এবং কল্পকাহিনী ১০৬,১৫৬
গড় ঘনত্ব ১৩২,১৩৪
গবেষণা ১৯,১০৭
এবং তাপগতিবিদ্যা ৯৭
তাপের সুস্থিতি ৯৮
থেকে উৎসর্জিত মৌলকণা ১৯,১০০,১১৩,
থেকে বিকিরণ ১৯,৯৭,৯৯,১২২,১৫৬
ধর্ম ৯৭
পৃষ্ঠ মহাকর্ষ ৯৬,৯৮
বাষ্পিত হওয়া ১৪০
বিস্ফোরণ ৯৫
এবং রঞ্জনরশ্মির উৎস ৯৫,৯৭
লোমহীনতার উপপাদ্য ৯৮
হকিং বিকিরণ ১৫৬
এবং শিশু মহাবিশ্ব ১১৩,১১৪
এবং শ্বেতগহ্বর ১১১
সৃষ্টি ৯৯,১১৩,১৫৬
সবই কৃষ্ণ নয় ১৯,১৫৬
সংঘর্ষ (একাধিক) ১৮,৯৭
কেন্দ্রক ৪৭,৫১,৬২
কেন্দ্রকীয় সংশ্লেষণ ৪৯
কেমব্রিজ প্রেস ৩৩
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৫,২১,১৫৫
কোয়াসার ৯৫
কোয়ান্টা ৭২
কণাবাদী মহাকর্ষ ৫৭,৮৬,৮৭,৯৫
এবং কৃষ্ণগহ্বর ৯৫,৯৬
আইনস্টাইন ৯৪
কৌণিক ভরবেগ ৯৮,৯৯,১০৪
ক্রান্তিক ঘনত্ব ১৩৪
গণিত ১৩
গণিতের লুকেসিয়ান অধ্যাপক (কেমব্রিজ) ৪৬, ১৫৫
গতির বিধি ৬৭
গাণিতিক প্রতিরূপ ৪২
গামা রশ্মি অভিজ্ঞাপক ১০২,১০৩
গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৬৭
গ্রহণ ৬৯
গ্র্যাভিটন ৫৮,৬১,১০১
গ্র্যাভিটোনোস ৬১
গ্রুয়ন ৫৪,৬১
গ্ল্যাশো শেলডন ৫৩
গেরার্ড টি. হুফ্‌ট ৫৩,৫৪
ঘনত্ব
গড় ১০২,১৩৭
ক্রান্তিক ১৩৭,১৩৮
অসীম ১৭,৮৫,১৩৪
ঘটনা দিগন্ত ১৭,৯৭,১০৯
চক্রণ-১ কণিকা ৫৩,৫৪,৬১
চক্রণ-২ কণিকা ৫৮
চার্লস ডারউইন ১২০
চেরেনকভ বিকিরণ ১০৩
জর্জ ফিটজারাল্ড ৪১
জন মিচেল ১০৮
জন ম্যাক্লেনাহান ৫
জন হুইলার ১০৭
জিম হার্টল ১৯,৪৪,৭৮,৮৮
জীবন রক্ষা ১২০
জীবনের আদিরূপ ১২০
জুলিয়ান সুইংগার ৭৪
জেকব ডি. বেকেনস্টাইন ৯৮
জেকব ব্রোনোওয়াস্কি ৩৪
জেন ওয়াইল্ড হকিং ১৬,২২,১৫৩,১৫৪
জেমস উসার ৮১

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ৫১
জেমস বার্দিন ৯৭
জোনাথন হ্যালিওয়েল ৯০
জোসেলিন বেল ১১০
ট্রাকিওস্টমি অপারেশান ২৪,৩৪
ট্রেভর সি. উইক্স্ ১০৩
ডন পেজ ১০২
ডি.এন এ ১২১
ডিরাক সমীকরণ ৪৭
ডেনিস স্কিয়ামা ১৫
ডেভিড মেসন ২৫
তৃণযন্ত্র ৫৩
তারকা ৪৯
নিউট্রন ৯৫
লোহিত দৈত্য ১৩৬
শ্বেত বামন ১০৯,১১০,১৩৬
তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ১৪,২২,৩৯,৪৬,৪৮,৬০,৬৪
তাপীয় গতিবিদ্যা
এবং কৃষ্ণগহ্বর ৯৬,৯৭
তাপীয় সাম্য ৬০
দশা রূপান্তর ১৪০
দার্শনিকগণ ৩৯
দ্বিতীয় আগমন ১৩০
দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল ৫০,৫৩
দৈবজ্ঞ ১২৯
ধর্ম ৪৪,৪৮,৮১
নরত্বীয় নীতি ৪৯,৫০,৫৭,৬২,১৩৮
ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স ৭৪
নিউক্লিয়াইড ৪৯
নিউক্লীয় বন্ধন ৬০
নিকোলাস কোপারনিকাস ৭৭,১৩৩
নিউট্রন ৪৭,৪৮,৬০
নিউট্রন তারকা ৯৫,৯৭,১১০,১৩৬
নিউট্রিনো ১০১,১৩৯
নিয়তিবাদ ১১৮,১১৯
নীল এ. পোর্টার ১০৩
নীহারিকাপুঞ্জ ১৭,৪৯,১৩৫
অসীম ঘনত্ব ৮৫
এবং মৌলকণা ৫৭
গুচ্ছ ১৩৫
বেগ ১৪০
সর্পিল ৫০,১৩৫
নীহারিকার উজ্জ্বলতা ১৪০
নেচার পত্রিকা ৩৫
নোবেল পুরস্কার ৫৩,৫৪
পদার্থ ৫০,৭১
পদার্থবিদ্যা ১৪,৭৮,১৪৫
গাণিতিক প্রতিরূপ ৪২
পর্যবেক্ষণ
কারণ ৮২
তত্ত্ব ৫৫
ভবিষ্যদ্বাণী ৮৯
পরমাণু ৫৫
পল ডিরাক ৪০,৪৭
পাউলির অপবর্জন তত্ত্ব ৫০
পারমাণবিক অস্ত্র ২৮
পারমাণবিক যুদ্ধ ১২৬
পালসার ৯৫,১১০
পি. মেসন ,৫৪
পিট্যার গুডার্ডি ৩৩
পুনঃমিতিকরণ ৫২,৫৩
পূর্ণসংখ্যা চক্রণ ক্ষেত্র ৫০
পূর্বাভাস
পর্যবেক্ষণ ৮৯
পৃথিবী ৬৯,৮৮
পৃষ্ঠতল মাহাকর্ষ ৯৮
প্রোটন ৪৭,৪৮,৬০
ফ্রান্সিস পুলেঙ্ক ১৪৫
ফ্রেড হয়েল ১৫
ফোটন ৫৩,৫৬,১০১
বলবিদ্যা সাংতত্যক ৪৬
বাইবেল ৯৪৩,১৬০
বাক্য সংশ্লেষক ২৫,১৪৭,১৫২
বার্ণার্ড লেভিন ১৫৫
বাস্তবতা
এবং কণাবাদী বলবিদ্যা ৪৩,৬৩
বাস্তব কাল ৩৫,৭৮,৮৭,১১২,১১৩
ব্যক্তিগত কাল ৬৭
ব্যাণ্টাম ব্লাক্স্ ৩৩
ব্যাপক আপেক্ষবাদ ১৬,৫১,৭১,৭২,১০৮
এবং অনন্যতা ৮৫
এবং কণাবাদী বলবিদ্যা ১৯,৬৫,৮৬,৯৫

এবং স্থান-কাল ৪১,৪২,৬৮
তত্ত্ব (১৯১৫) ১০৮
ব্যারিয়ন সংরক্ষণ বিধি
সংজ্ঞিত ১০৪
বিকিরণ ৫৭
কৃষ্ণগহ্বর থেকে ১৯,৭৬
বিকর্ষণকারী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া ৭০
বিক্ষোভ তত্ত্ব ৫৫
বিজ্ঞান
এবং ঈশ্বর ১২৬
এবং শিক্ষা ২৯
বিজ্ঞান ও গণিতের পশ্চাৎপট ১২
বিদ্যুৎচুম্বকীয় ৫১,১০৩
বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ৫১,৫২
বিপরীত কণিকা ৫৭,১০০,১০১
বিবর্তন
ঔজ্জ্বল্যের ১৪০
বি.বি.সি. ১৪৩
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
আচরণ সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী ৮৯
এবং ঈশ্বর ১১
এবং এনট্রপি ৮২
ক্রান্তিক ঘনত্ব ১৩৪
গড় ঘনত্ব ১৩৪
চুপসে যাওয়া ৫৭
সঙ্কোচন ১৭,১৩৪
সীমানাহীনতার প্রস্তাব ৮৯,৯১,৯২
বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ (১৯০৫) ৪১,৪২,৬৮,৬৯,৭২,৯৪
বিশৃঙ্খল ১৩১
বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা ৫৮,৮৫,১৪১
বৃহৎ সঙ্কোচনের অনন্যতা ৫৮,১৪১
বেগ
মহাকর্ষ ৮৩,১০৮
বেতার তরঙ্গ ৮৪
বৈদ্যুৎ আধান ১১৪
ব্রাউনীয় গতি ৬০
ব্র্যাণ্ডন কার্টার ৯৭
ব্রাম-এর ভায়োলিন কনসার্টো ১৪৮
ব্রায়ান হুইট ৩৪
ভর ৪৮,৭০,১৩৯
কৃষ্ণগহ্বর ৯৭
নিউট্রিনো ১৩৯
ভ্লাদিমির ব্র্যাগিনস্কি ১০৪
মকদ্বীপের চাকতি ১৪৩
মহাকর্ষ ৫০,৫২,৯৮
এবং অতি মহাকর্ষ ৬১,৬২,৬৩
স্থান-কাল ৬৯,৭০
মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ১৮,৫৮,৬১,৮৭,১০৪,১০৮,১১২
মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়া ৪৯,৭১,৯৬,৯৮
মহাকর্ষীয় শক্তি ৮৬
মহাকাশ ভ্রমণ ১০৭
মহাজাগতিক কাল ৬৭
মহাজাগতিক ধ্রুবক ১১৫,১১৬
মহাজাগতিক পশ্চাৎপট
অনুসন্ধানের উপগ্রহ ১৩৩
মহাবিশ্বতত্ত্ব ১৫,৪৮
মহাবিশ্বতাত্ত্বিক পদ ৭০
মহাবিশ্বের উৎপত্তি ১১,১৭,১৯,৪১,৭২,১৫৬
বিতর্ক ৮১
মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ ৮৫,১৩৩
মার্টিন রাইল ৮৪
ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব ৫১
ম্যাক্স প্লাঙ্ক ৭২
ম্যাক্স বর্ণ ৪৭
মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষা ৪১,৬৭
মুক্তির বেগ ১০৮
মুয়ন ৫০
মোজার্ট ১৫৭
মৌলকণা ১৫,৪৭,৬০,১০৩,১৪৯
মৌলিক পদার্থ ১৩৯
যুগ্মন ধ্রুবক ৫৪,৫৫
রজার গ্রে ১৪৬
রবার্ট গ্রেভস্ ৮,৯
রজার পেনরোজ ১৮,৭১,৮৫
রবার্ট উইলসন ৮৫
রবার্ট এইচ. ডিক ১০৪
রবার্ট ওপেনহাইমার ৭১
রিচার্ড ওয়াগনার ১৫২
রিচার্ড ফাইনম্যান ৭৪
রিচার্ড বেন্টলি ৮২
রিং সাইকেল অপেরা (ওয়াগনার) ১৪৬
রেকুইম (মোজার্ট) ১৫৭

ল্যাম্ব শিফ্‌ট্‌ ৫২
লুকেসিয়ান অধ্যাপক ৪৬,১৫৫
লুডভিক বোল্‌জম্যান ৮২
লেপটন ৫০
লোমহীনতার উপপাদ্য ৯৮
লোহিত দৈত্য ১৩৬
শক্তি ৫৫,৫৬,৫৭
অ-শূন্যাঙ্ক ৫২
মহাকর্ষীয় ৮৬
শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বল ৫৩
শ্রয়েডিংগারের বেড়াল ৪৩
শিক্ষা ৯,১৫০
শিনিচিরো টোমোনাগা ৭৪
শিশু মহাবিশ্ব ১১৪,১১৫
শূন্যাঙ্কীয় হ্রাসবৃদ্ধি ৫২
শ্বেতগহ্বর ১১১,১৪১
শ্বেত বামন ১০৯,১১০,১৩৬
শৈশব ১,১৪৯
সচিত্র চিন্তন ৩৫
সন্তুন ১৮,২৪,১৫৪
সর্পিল নীহারিকাপুঞ্জ ৫০,১৩৫
সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব (মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব) ৫,৩৯, ৪৬,৪৭,৫৫,৬০,৬৫,১১৪
সরু সুড়ঙ্গপথ ১১১
স্বতঃবৃত্ত প্রতিসমত্ব ভঙ্গ হওয়া ৫৩
সাইমন ভ্যান ডার মীর ৫৪
সার্ন (CERN) ১০২,১৪৬
সালাম-উইনবার্গ তত্ত্ব ৫৩,৫৫,৫৬,৬২
স্থান
এবং অপেক্ষবাদ ৬৫,৬৮
স্থান-কাল
চারমাত্রিক ৪১,৬২,১০৯
বক্রতা ৮৬,১০৯
স্থায়ী অবস্থা তত্ত্ব ৮৪
স্বাধীন ইচ্ছা ১২২,১২৪
সিগ্‌নাস এক্স - ১ ৯৭,১০১
সি.পি.টি উপপাদ্য ৫৬,৫৭
স্টিভেন উইনবার্গ ৫৩
সীমানাহীনতার প্রস্তাব ৮৯,৯১,৯২
স্পীচ প্লাস ২৫
সৃষ্টিকর্তা ৮১
স্যু ল্যালি ১৪৪
সূর্য ৬৬
সূত্রসন্ধক তত্ত্ব ৪৭,৫১,৯৫,১২৩
সেণ্ট অ্যালবান্স ৬,৭,৯,১৪৯
সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ ৯৬
হারম্যান বণ্ডি ১৬
হ্যাড্রন ৫০,৫৪
হেনরিক লোরেঞ্জ ৪১